# বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি

গৌরমোহন রায়

প্রাপ্তিস্থান :

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
১৫।৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

উষা পাব্‌লিশিং হাউস
১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

## উৎসর্গ

পরোলোকগত পিতৃদেবের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—

# ভূমিকা

পাণ্ডিত্যের ঘরে শূন্য; অতএব, সঙ্গতকারণেই পাণ্ডিত্যাভিমানের কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আমার স্বাভাবিক অবলম্বন হয়েছে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্বার্থ-চিন্তা, ভালকথায়, কল্যাণ-চিন্তা। এটি বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতির কোন প্রতিযোগী গ্রন্থ নয়—বরং একটি পরিপূরক পুস্তক হিসাবে গৃহীত হলে, এর প্রতি যথার্থই সুবিচার করা হয়েছ বলে মনে করব।

প্রণয়ন-রীতি প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলা ভাল। রচনাভঙ্গী সম্ভবতঃ জটিলতা বর্জিত—অনায়াস প্রস্তুতি ও আয়ত্তীকরণ এবং আত্মীয়করণের কথা মনে রাখার ফলেই। পদ্ধতির আলোচনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের ধারাবাহিক ও কালানুক্রমিক পর্যালোচনা এবং বাংলা ব্যাকরণের বিষয় সমূহের সন্নিবেশ এ গ্রন্থের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। পদ্ধতি ও পাঠটীকার তাত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের অনুশীলনে আধুনিক মতবাদ ও মনোভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি—যদিও প্রাচীনতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়। রচনার আয়তনে মধ্যপন্থা অবলম্বিত-বিপুলায়তন গ্রন্থের অতি বিস্তার এবং পল্লবগ্রাহিতা ও সংক্ষিপ্ত পুস্তকের আলোচনা হ্রস্বতা দুটিই আমার কাছে বর্জনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। পুস্তকটির প্রনয়নকাল খুবই সীমিত ও অপ্রচুর হওয়ায় ভ্রান্তির ও ত্রুটির অনুপ্রবেশ অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা লাভ করলে যথার্থই উপকৃত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সেগুলিকে বিষয়ীভূত করার চেষ্টা করব।

পরিশেষে, ঋণ স্বীকার। উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস যাঁরা, তাঁরা আমার এতই অন্তরঙ্গ যে, পৃথকভাবে তাঁদের নাম উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি না। শুধু, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রক ভিলা ॥ দার্জিলিং
১৫ই আগষ্ট, ১৯৭১

গৌরমোহন রায়

# ॥ সূচীপত্র ॥

## প্রথম অংশ পদ্ধতি ( Method )

## দ্বিতীয় খণ্ড

## [ বিষয় (Contents) অংশ ]

### বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস



### উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ

১

# শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব ঃ উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর আলোচনা

শিক্ষাকে জীবনভিত্তিক এবং জীবনের উপযোগী প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করলে পাঠ্যসূচীকে জীবন সম্পৃক্ত হতেই হবে। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রস্তুতিকরণের সেটাই হবে প্রধান নিয়ামক নীতি। মানুষের জীবনের দু'টো দিক আমাদের চোখে পড়ে—একটি তার দৈহিক অস্তিত্বের প্রশ্ন এবং আর একটি উন্নত মানের সার্থকতা-চিহ্নিত জীবন-যাপনের সমস্যা। বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা তাই এই দুটি উদ্দেশ্যই সাধন করতে চাই, একদিকে যেমন ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের সাহায্যে আমাদের বেঁচে থাকার মৌল প্রশ্নটির সমাধানের জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলি—অপরদিকে তেমনিই একটি পরিপূর্ণ সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য আমাদের মনো-জীবনকেও প্রস্তুত করে তুলি। উভয়ের সুষম সমন্বয়ের মধ্যেই আমরা জীবনের আনন্দ-পূর্ণতার সন্ধান পেতে পারি।

সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উপাদান। সে কারণেই একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচী পেতে হলে সাহিত্যকে তার অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। আর ভাষা সাহিত্যের মৌল উপাদান বলেই ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও একান্ত অপরিহার্য। আমাদের বিদ্যালয়গুলির উচ্চতর শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যসূচীতে তাই ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয় চর্চায় সুযোগ রাখা হয়েছে।

একটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সে দেশের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই বর্তমান থাকে। তাই কোন শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতালাভ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার শিক্ষাধারার মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সুদীর্ঘকাল ধরে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির একাগ্র প্রচেষ্টায় ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করে। তাই এক অর্থে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলতে জাতীয় জীবন ও তার চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকেই বোঝায়।

অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীতে সাধারণতঃ বাংলা পাঠ্যসূচীতে দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে—(১) গদ্য ও কবিতার একটি সম্পাদিত সংকলন এবং (২) ব্যাকরণ ও রচনা। পরে অবশ্য এর সঙ্গে যোগ করা হয় দ্রুতপঠনের কোন বই। ভাষা বা সাহিত্যের ইতিহাস পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা এই স্তরে থাকে না। ব্যাকরণের আলোচনাও অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে করার চেষ্টা করা হয়। শিশুদের অপরিণত বুদ্ধি ও বিচারবোধের অভাবের কথা মনে রেখে এই স্তরে সাহিত্যের ইতিহাসের অনুপস্থিতিকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করতে হয়। তবে এই বিষয়ে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহজতা ও নীতিপ্রাধান্য ব্যতীত নির্দিষ্ট অংশটির অপর কোন বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয় না। জটিলতা পরিহারের যুক্তিতে সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তিকরণ বর্জন করলেও পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে সামান্য ভিত্তিস্থানীয় ধারণা দেওয়া কঠিন নয়। আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌছাতে

গেলে সাহিত্য সংকলনের জন্য নির্বাচিত রচনাগুলিকে কালের ক্রম অনুসারে সজ্জিত করা প্রয়োজন। এর দ্বারা দু'টো উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে—(১) সযত্ন অধ্যাপনার ফলশ্রুতি স্বরূপ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিশেষ কালের বিশেষ সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় সাধন এবং (২) বিশেষ কালের ভাষাভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। অবশ্য একথা সত্য যে, এ দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে পাঠন রীতিকে সম্পূর্ণরূপে উদার এবং আধুনিক করে তুলতে হবে। আমরা স্মরণ করতে পারি আমাদের কৈশোরে রচনাকার এবং রচনার বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গী ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের কখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত না—পাঠনপদ্ধতি ছিল গতানুগতিক ও যান্ত্রিক। বর্তমান কালে অনুরূপ পদ্ধতি বর্জন করে আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে স্বল্পায়তন পাঠ্যসূচীর প্রবর্তনায় ভিতর দিয়ে আমরা ইপ্সিত ফললাভে সক্ষম হব।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উচ্চতর শ্রেণীর উপযোগী বাংলা সাহিত্য সংকলন গ্রন্থের সংস্থাপন রীতি বিচার করলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে যথার্থই মনোবিজ্ঞানসম্মত রীতি অনুসৃত হয়েছে। রচনাগুলির সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে কালগত ধারাবাহিকতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপনার প্রয়াসকে তাই আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি। সেই সঙ্গে এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থের আর দুটি বৈশিষ্ট্যকে আমরা লক্ষ্যণীয় এবং আদর্শ স্থানীয় বলে গ্রহণ করতে পারি। প্রথমতঃ সেই জাতীয় সংকলনই শ্রেষ্ঠস্থানীয়—যার নির্দিষ্ট অংশে কবি বা লেখকের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি মুদ্রিত থাকে—যার ফলে সীমায়িত গণ্ডীর ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং তাদের কৌতূহলও চরিতার্থ হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি রচনার উৎস এবং কবি বা লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সৃষ্টি-পরিচিতি অবশ্যই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ, সাহিত্য পাঠের শেষ লক্ষ্য যদি সাহিত্যের রসাস্বাদ গ্রহণ এবং সাহিত্যপাঠ-তৃষ্ণার সৃষ্টি হয়, তবে অনুরূপ উপাদান সমৃদ্ধ সংকলন গ্রন্থ যথার্থই উপযোগী হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে অনুরূপ উদ্দেশ্যসাধনে শিক্ষকেরও উন্নতমানের ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্য শিক্ষককে আনুষঙ্গিক সাহিত্য-তথ্য এবং ভাষা-জ্ঞান অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত থাকতে হবে। তাই ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠনা বর্তমান বিস্তৃত জীবনের পটভূমিতে খুবই উপযোগী।

বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য সংকলনে সাধারণতঃ প্রধানস্থানীয় সাহিত্যিকের সুপরিচিত প্রথম শ্রেণীর রচনার অংশবিশেষই নির্বাচিত হয়। কিন্তু, এই রীতিরও মাঝে মাঝে পরিবর্তন প্রয়োজন। কখনও কখনও দেখা যায়, কোন বিখ্যাত লেখকের কিছু যথার্থ সাহিত্যগুণান্বিত উন্নত শ্রেণীর রচনা স্বল্প পরিচিতি লাভ করেছে। সেটাই হয়ত স্বাভাবিক। কারণ, অতি লোকপ্রিয় রচনাই সর্বদা প্রথম শ্রেণীর নয়—সাহিত্য সমালোচনার জগতে এটি একটি সাধারণ সত্য। তাই রচনা সংকলনকারকে বা সম্পাদককে কখনও বা শিল্পগুণ সমৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত রচনার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে হবে। তাছাড়া পরিবেশনার বিশেষ রীতির জন্য কোন

সাহিত্যিক সম্পর্কে আমাদের মনে ভুল ধারণাও জন্ম নেয়। যেমন, নজরুলকে আমরা প্রধানতঃ 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবে জানি। কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। রোমান্টিক এবং মানবতাবাদী কবি হিসাবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভবতঃ এখনও সম্যকরূপে হয়নি। 'কবি অরবিন্দ' বা 'কবি বিবেকানন্দে'র খবরই বা কজন রাখেন, অথবা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি হিসাবে এবং জীবনানন্দকে গল্পকার হিসাবেই বা আমরা কজন জানতে চেষ্টা করি? 'নারীর মূল্যের' মত অসাধারণ গ্রন্থের লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রের একটা বিশিষ্ট ভাবমূর্ত্তি স্থাপনের প্রয়াস কোথাও কখনও হয়েছে বলে আমরা জানি না। এসব ত্রুটি সংশোধনের সময় এসেছে। বাংলা পাঠ্যসূচীর বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে। অধিকাংশ সম্পাদনাই সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়টিকে একেবারেই আমল দিতে চান না। কিন্তু সেটাই বা হবে কেন? আমরা কি উন্নাসিকতা বর্জন কবে কিছুটা উদার হতে পারি না? ভারতচন্দ্র, রামরাম বসু, প্রমথ চৌধুরী এবং নজরুলের ভাষা রীতির সঙ্গে এ-যুগের বিশিষ্ট গদ্য রচনাকার সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাকে সাঙ্গীকৃত না করায় যৌক্তিকতা কোথায়?

এবার ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে যে সব ব্যাকরণ পুস্তক অনুসৃত হয়ে থাকে সেগুলি আংশিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে সব উদাহরণ আলোচিত হয়—সেখানে সযত্নে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় এবং অতি আধুনিক ভাষারীতিকে পরিহার করা হয়। এই ত্রুটি শিক্ষকের দ্বারা দু'ভাবে সংশোধিত হতে পারে—(১) শিক্ষককে নিজের চেষ্টায় ব্যাকরণের সূত্র আলোচনার সময় ভাষার কালগত বৈশিষ্ট্যের রূপটিকে তুলে ধরতে হবে। এবং (২) যথাসম্ভব পাঠ্যপুস্তকের বিষয় ও ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের আলোচনার যোগসাধন করতে হবে।

ব্যাকরণে খুব খুঁটিনাটি এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বর্জন করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক উপযুক্ততা আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আশা করি না। একই যুক্তি অনুসারে বলা যায় যে, বাংলা ছন্দ ও অলংকারের আলোচনাও বিদ্যালয়ের দশম মানের অপরিণত ছাত্রছাত্রীর উপযোগী নয়। অলংকাবের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারিগরী থাকে তা ধরার ও বোঝার ক্ষমতা আমরা সাধাবণভাবে তাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি না। তাই এ'দুটি বিষয় ব্যাকবণের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে ছন্দের জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্যই করা যেতে পারে এবং রীতি হিসাবে এটি কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রচলিতও আছে। বাংলা ছন্দের ব্যাকরণগত আলোচনা না করেও আমরা কবিতাব ছন্দোসম্মত পঠনের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় ও সৌন্দর্যদৃষ্টিকে ছন্দের মাধুর্যের উপযোগী করে তুলতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাধীনভাবে ছন্দ সচেতন করে কবিতা পাঠে নিপুণতা অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

অতঃপর দ্রুতপঠন ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, দ্রুতপঠনের উপযোগী পুস্তকের অন্তর্ভুক্তির রীতি আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায়

অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে। পাঠ্যসূচীর এই দিকটিকে বিশেষত উচ্চ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের পঠন পাঠনে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ-সীমাকে আরও বেশী প্রসারিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়া তুচ্ছ বিষয়সমূহ দ্রুত পঠনে উপেক্ষিত হওয়ায় রসগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। রচয়িতার নানা বৈচিত্র্যময় রসসৃষ্টির সঙ্গে পাঠকের সহজেই যোগসাধন হয়। সাহিত্য-পাঠের আনন্দই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন জ্ঞানলাভ হয়ে থাকলে তাকে অবশ্য বাড়তি লাভ বলে ধরতে হবে। সবদিক বিবেচনা করলে দ্রুতপঠনের ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেই হয়।

আজকের দিনে পাঠ্যসূচীর ক্রমবর্ধমান আয়তনের জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্তি করণের প্রসঙ্গে এ কথাটা আর একবার মনে হবে। তবুও এটিকে বর্জন করার সপক্ষে মত প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু সংশোধনী হিসাবে এটুকু বলা যায় যে, দশম শ্রেণীর জন্য যে সাহিত্যের ইতিহাস পঠিত হবে তার ব্যাপ্তি কোনক্রমেই ১২৫ পৃষ্ঠার সীমারেখা অতিক্রম করা সঙ্গত নয় এবং কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ধারা-বাহিক, বিজ্ঞানসম্মত অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে—সাহিত্যের ইতিহাস—প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনের ইতিহাস। তাই সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে আত্মানুসন্ধানের মহৎ ফললাভ হয় বলেই তা সাদরে গ্রহণযোগ্য।

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ - বলেছেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্মোত্তর পুষ্টি এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, শিশুর মানসিক বিকাশ এবং সাবলীল আত্মপ্রকাশে মাতৃভাষারও অনুরূপ ভূমিকা। জন্মপরবর্তীক্ষণ থেকে যে ভাষার সঙ্গে শিশুর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার অপরিণত বোধকে ক্রমশ পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দেয়—তাই হ'ল মাতৃভাষা। মাতৃ-সান্নিধ্য এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক পঠভূমির প্রয়োজন শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যই এবং সমাজ-বাতাবরণ থেকে প্রাপ্য ভাষার আনুকূল্যও পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত। মুক্ত বাতাস, নির্মল সূর্যালোক, অপার মাতৃস্নেহ শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের পক্ষে যেমন অপরিহার্য, সম্যক আত্মবিকাশ ও অন্তর্জীবন গঠনের প্রশ্নে মাতৃভাষারও সেই একই ভূমিকা।

ক্রমসঞ্চয়মান অভিজ্ঞতাকে এবং অন্য বহুবিধ জৈবিক প্রয়োজনকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিশু প্রথমতঃ সাহায্য গ্রহণ করে কিছুসংখ্যক পরিচিত ধ্বনির এবং শীঘ্রই এইসব ধ্বনি মাতৃভাষার খণ্ডিত শব্দে রূপান্তরিত হয় - যা শেষ পর্যন্ত একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রকাশমাধ্যমের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক এবং অনায়াসসাধ্য আজন্ম পরিচয়—তাই-ই আমাদের মাতৃভাষা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় জীবনগঠন ও আত্মবিকাশ, তবে সেই বহু সময়ব্যাপী, আয়াস-সাধ্য ও জটিল প্রক্রিয়াটি সর্বাধিক সার্থকতার সঙ্গে সাধিত হতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যেই। মাতৃভাষা মানুষের কাছে শ্বাস বায়ুর মত স্বাভাবিক বলেই তা যথার্থ-রূপেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও মানব-জীবন-সাধনলব্ধ সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশমাধ্যম ও বাহক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের মত এই যে, ভাষা যদি ভাবের বাহন না হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তবে তা বিড়ম্বনারই কারণ ঘটায়। আমাদের দেশের দীর্ঘকালীন শিক্ষাব্যবস্থাতে ইংরেজী যে ভাবে স্থান গ্রহণ করেছিল তাতে সমগ্র শিক্ষাধারায় স্বাভাবিকতা যে অতিমাত্রায় ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তার ফল হয়েছিল এই যে, শিক্ষাধারা তার সমগ্রতায় সর্বসাধারণের মানসপুষ্টির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে নি এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠীকে তথাকথিত শিক্ষিত করে তুলে শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক সত্যকেও স্বীকৃতি দিতে হবে যে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই উনবিংশ শতকের মনীষী-সমাজ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির স্বর্গে উপনীত হতে পেরেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত জাতিগঠন ও স্বাধীনতার প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু, সাধারণ মানুষ ও সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার চরিত্রটি কেমন ছিল? একদিকে সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনের গুরুত্ব অস্বীকৃত ও অবহেলিত, অপর দিকে উৎকর্ষ-চিহ্নিত শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক এবং বিদ্যায়তনের একান্ত অভাব। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিজাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষয়টি প্রধান হয়ে দেখা দিলেও উত্তরকালে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাভাষার কিঞ্চিৎ জড়ত্বমুক্তি হওয়ায় আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। উইলিয়ম কেরী কর্তৃক বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং একই কার্যে উৎসাহদান শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রেরণায় কারণ স্বরূপ হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় রচিত পাঠ্য পুস্তকের অপ্রাচুর্য হেতু, ইংরেজী ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের প্রচলন আমাদের দেশে এই সেদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তার ফলে সাধারণ মানুষের শিক্ষার ধারাটি যে পুষ্টিলাভ করতে পারে নি—সে সত্য রবীন্দ্রনাথ এবং অপর দেশভক্ত মনীষীগণ উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই পদ্ধতির অবসানকল্পে নিজেরাই লেখনী ধারণ করেছিলেন। প্রধানত, তাঁদেরই প্রেরণায় আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ণ সম্ভব হয়েছে এবং বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পর্যায়ের মধ্যেও মাতৃভাষায় সগৌরব অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে। তার ফলে শিক্ষার প্রক্রিয়াগত জটিলতার যে অনেক পরিমাণেই নিরসন হয়েছে সে-কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

বিদেশী ভাষা কিভাবে ভাবগ্রহণে এবং জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক পথের বাধাস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়—সে-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মত হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়। পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালীর পক্ষে ইংরাজি শিক্ষায় এটি হইবার যো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুই পাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে। মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটখাট ভূমিকম্পের অবতারণা হয়।"

আর তারই ফলে, শিক্ষার ধারাটি স্বাভাবিক পথে চলতে না পারায় মুখস্থ করার বিকৃত এবং অস্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয় এবং সহজেই জ্ঞান ও সাহিত্যানন্দ খাদ্যের সঙ্গে হৃদয় ও মনোমধ্যস্থ বুভুক্ষার একটা অনতিক্রম্য ব্যবধানের সূচনা হয়। সমগ্র শিক্ষাজগতই নিরানন্দের এক অন্ধকারময় কারাগার হয়ে ওঠে। শিক্ষার জগতে মাতৃভাষার প্রখর ও পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ায় আজ সেই অভিশপ্ত অন্ধকার যে দূরীভূত —তা আমরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আজ আমাদের মনের খাদ্য ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।'

পাঠ্যপুস্তকে মাতৃভাষায় প্রবর্তন যে শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকে জটিলতামুক্ত করে তাই নয়। এই ব্যবস্থা জাতীয় সংস্কৃতির উদ্বোধক ও পরিপোষক। পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন দেশের মাতৃভাষা ও সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বহন করে। যে দেশের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি নেই—গর্ব করার মত তার কিই বা থাকে? ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মানুষের সর্বাঙ্গীন ও শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ। আর এই

আত্মপ্রকাশকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে মাতৃভাষাকে আন্তরিক ও সর্বাঙ্গীন জাতীয় প্রচেষ্টার দ্বারা পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে। জীবনে ব্যবহারের ব্যাপকতার মধ্য দিয়েই কাজটি উত্তমরূপে সম্পন্ন হতে পারে। সমগ্র শিক্ষাধারার মধ্যে মাতৃভাষার স্থানটি যদি হয় যথার্থ গৌরবের তবেই তা জাতির মর্মমূলকে আশ্রয় করে এক কালাতীত ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে। বাংলাভাষা বর্তমান বাংলায় সেই পথেই দ্রুতপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া আর একটি সত্য আমাদের উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য একটি জাতির জীবন-মুকুর—যেখানে একটি জাতির সমগ্র জীবন-ভাবনা ও জীবন-চারণার যাবতীয় বিশিষ্টতা প্রতিফলিত হয়। জীবনের সর্ব অঙ্গে মাতৃভাষার পূর্ণ ব্যবহার যতক্ষণ না সম্ভব হয়—ততক্ষণ ভাষার আকাঙ্খিত উন্নতির স্তরটিকে আমরা স্পর্শ করতে পারি না এবং সেই অপরিণত ভাষাও উন্নতমানের সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না। ব্যবহারের পূর্ণতা ও ব্যাপকতাই ভাষাকে উপযুক্ত সমৃদ্ধি দিতে পারে।

অবশ্য একথা খুবই সঙ্গত যে, দেশের শক্তিশালী সাহিত্যিকরা তাঁদের সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষাকে নিজেরাই গঠন করে নিতে পারেন এবং অনেক সময় ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তা করতেও হয়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহিত্যের ভাষাকে নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছিলেন। এটি ঐতিহাসিক সত্য হলেও বাঞ্ছিত সত্য নয়। কারণ তাঁদের মত প্রতিভার আবির্ভাব সাধারণ ঘটনা নয়। দ্বিতীয়ত, সমৃদ্ধ ভাষা উন্নত মানের সাহিত্যিকের কাজটিকে অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য করে তোলে।

সুদীর্ঘকালের সাধনা ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে আজ আমাদের দেশে সব বিষয় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণীত ও পঠিত হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি এবং অনুভব করছি—আজকের বাংলা ভাষা এক অবিশ্বাস্য পুষ্টিলাভ করেছে এবং সর্বশ্রেণীর ভার বহনে আজ তা সক্ষম। এর থেকে আকাঙ্খিত বিষয় আর কি হতে পারে? দুশো বছর আগে যার সূচনা হয়েছিল আজ তা প্রায় পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে আজ সবশ্রেণীর পঠনীয় বিষয়ে বিশেষতঃ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়গুলির পারিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা গঠিত হয়ে ভাষাচচার এক নতুন বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছে। মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের প্রাচুর্য তাই আজ আর আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তথাপি বাংলা ভাষা যে জাতির জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে—সেকথা জোর দিয়ে বলতে গিয়ে একটুখানি সংশয়ের সম্মুখীন হতেই হয়। এখনও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অথবা অনুরূপ সংস্কৃতি প্রভাবিত মনোভাবাপন্ন মানুষের অপ্রতুলতা নেই এবং তাদের উন্নাসিকতা সম্পর্কে সতর্ক হবার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায় নি।

উপরোক্ত কারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষককে একটি প্রগাঢ় ও সংশয়হীন আন্তরিকতা নিয়ে মাতৃভাষার প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য বাংলার

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, তিনি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই দিচ্ছেন না—পরন্তু, তিনি একটি গুরুতর জাতীয় কর্তব্য সাধনে ব্রতী রয়েছেন। পরিবর্তিত মধুসূদন অথবা অপরিবর্তিত অক্ষয় দত্তীয় মনোভাবের অধিকারী হতে হবে তাঁকে। শ্রদ্ধাবান শিক্ষকের পক্ষেই মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ সম্ভব এবং এই সহৃদয়তাই তাঁকে অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণার উপযোগী করে তুলবে। ভাষাপ্রেম থেকে সাহিত্যনিষ্ঠা অথবা বিপরীত সত্যও বাংলা-শিক্ষকের জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমরা ভাষাতত্ত্ব-গুরু আচার্য শহীদুল্লাহ্ এর দুর্লভ উপদেশবাণীকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করব।

সাহিত্য-প্রেমার্ত হৃদয়ই এই শিক্ষককে শেষ পর্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন করে তুলবে এবং তিনি নিজে জাতীয় ভাবনার প্রেরণা-স্রোতে অবগাহন করবেন এবং বৃহত্তর ছাত্রসমাজের চিত্তকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করবেন। এমনি করেই হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের জাগরণ হবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করে তোলার ফলস্বরূপ সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই যে এক বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা হয়—সে সম্পর্কেও তাঁকে সচেতন হতে হবে। মাতৃভাষার ব্যবহার যে বিষয়ের পঠন-পাঠন এবং চর্চা ও উপলব্ধিকেই সহজ করে তোলে এবং সেই সহজতা অপর বিষয় শিক্ষার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-বিষয়ক বিরূপতাকে দূর করে—সে সত্যকে উজ্জ্বলরূপে হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে—তারই আলোকে শিক্ষার পথে চলতে হবে।

যে কোন শিক্ষাবিদই শিক্ষাকে একটি সামগ্রীক সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে অবশ্যই গণ্য করবেন। শিক্ষার একটি লক্ষ্য ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ সুপ্ত ও অর্ধব্যক্ত শক্তিরাজির উন্মেষ ও পূর্ণবিকাশের সাহায্যে পূর্ণ ব্যক্তিত্বে কোন মানুষকে স্থাপন করা। কিন্তু এই বিকশিত পূর্ণায়ত ব্যক্তিত্বের সার্থকতায় পৃষ্ঠপট কোনটি? অবশ্যই তার সমাজ-যে সমাজে তাকে সকলের সঙ্গে সমন্বিত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের মনুষ্যোচিত সার্থকতার আস্বাদন লাভ করতে হবে। এই সূত্রেই আমাদের ইংরেজীপ্রধান শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করতে হবে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীগণ ইংরেজীতে দিকপাল পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল বিশুদ্ধ সমাজচেতনা সমৃদ্ধ জাতীয়ভাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পাদমূলে অর্পণ করেছিলেন। এইসব ঐতিহাসিক চরিত্র মানবিক ও সামাজিক সাযুজ্যবোধের চরম নিদর্শন। অপরপক্ষে, সেইসব ভারতীয় পাবলিক স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত তথাকথিত বুর্জোয়া সমাজের সন্তানেরা—যারা জন্মাবধি সমগ্র ভারতীয় সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হন, এবং যার ফলে তাঁরা বৃহত্তর সমাজজীবন সম্বন্ধে অচেতন থাকেন। এছাড়া মাতৃভাষা বা ভারতীয় ভাষায় রচিত বিপুলায়তন সাহিত্যের সঙ্গেও যাদের কিছুমাত্র যোগ গড়ে ওঠে না। এবং এর সবকিছুই সম্ভব হয় একমাত্র এই বিচিত্রধর্মী শিক্ষাধারার অনুসরণের ফলে।

মানুষের স্বদেশী সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় গড়ে ওঠে মাতৃভাষার মাধ্যমে, কারণ, মাতৃভাষা যেমন আত্মপ্রকাশের সহায়ক তেমনি আত্মোপলব্ধিরও শ্রেষ্ঠ

মাধ্যম। আমাদের এই সুবিশাল বৈচিত্র্যধর্মী প্রাচীন সভ্যতার দেশের জনজীবনের সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যেই সংস্কৃতির হাজারো উপাদান ছড়িয়ে আছে। বিদেশে রচিত ও মুদ্রিত এবং বিদেশী ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ দিয়েই যাদের জীবন সুরু হয—তাদের জীবন এবং সমগ্র দেশের চলমান জীবন—এই দুই-এর মধ্যে তাই প্রথম থেকেই এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের প্রাচীর রচিত হয়—যা উত্তরোত্তর আরও দৃঢ় ও অনতিক্রম্য হয়ে এক চিরকালীন বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কি দেশ, কি বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী কারও পক্ষে হিতকারী নয় এবং সেজন্যই এ অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা ও অবস্থা ক্রমশঃ আরও ব্যাপ্ত হচ্ছে এবং সবশেষে দেশের পরিচালনার দায়িত্ব এমন একটি শ্রেণীর হাতে চলে যাচ্ছে যাদের জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি কোন কিছুরই সঙ্গে দেশের কোটি কোটি মানুষের মাটিমাখা জীবনের কোন প্রকারের যোগই নেই। এই অবস্থার অবসান অবিলম্বেই দরকার—দেশের কল্যাণেই। তাই রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আচার্য সত্যেন্দ্র বসু প্রদর্শিত মাতৃভাষা-মাধ্যম শিক্ষাই একমাত্র পথ।

মানুষের মননশীলতা গড়ে ওঠে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই। কারণ, বিদেশী ভাষা একটি অস্বাভাবিক মাধ্যম বলেই চিন্তার প্রধান মাধ্যম মাতৃভাষা—তাছাড়া ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমও মাতৃভাষা। এই জীবনকেন্দ্রিক সত্যটি বহু মনীষীর জীবনে প্রমাণিত। চিন্তা ও ভাব প্রকাশকে যদি একই কাজের দুটো দিক বলে বিবেচিত হয় তবে সেই কাজটি সার্থকতম উপায়ে সার্থক হতে পারে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই। মাতৃভাষা-অবলম্বী শিক্ষাধারায় এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। এই সঙ্গে শিল্প-সম্মত আত্মপ্রকাশের কথাটাও ভাবতে হবে। সাহিত্যের মধ্যে মানব-মনের যে বহিঃপ্রকাশ-তার বাস্তব উপকরণ হল বিশেষ কোন দেশ ও কালের মানুষ ও তার জীবন, এবং সেই চিত্রকে উন্নতমানের সঙ্গে প্রকাশ করা যায় সেই দেশেরই নিজস্ব ভাষাভঙ্গীর মাধ্যমে। মানুষের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব অন্ততঃ একজায়গায় বিশিষ্ট বলে ভিন্নধর্মী ভাষায় তার আন্তরিক রূপটির উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। তারাশঙ্করের 'কবি' কোন বিদেশী সাহিত্যিকের দ্বারা বিদেশী ভাষায় রূপায়িত করা আদৌ সম্ভব নয়। একই কারণে বাংলায় রচিত এই মহৎ গ্রন্থটির অন্য কোন ভাষায় সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়। তার কারণ হল এই যে, উপন্যাসটির প্রাণধর্ম রূপলাভ করেছে একটি বিশেষ ভৌগোলিক পটভূমির বিশিষ্ট জীবনধারার সত্তাকে অবলম্বন করে। পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠস্থানীয় কবিতার তাই কোন সফল অনুবাদ হতে পারে না—কেননা কবি হৃদয়ের প্রকাশ হয়েছে এক বিশেষ ভাষায় আধারেই। বাঙালী হিসাবে সাহিত্য পাঠের চরম আনন্দ লাভ করতে হলে তাই বাংলাকেই অবলম্বন করতে হবে।

মানুষের পক্ষে, শিক্ষার ধারাটির মধ্যে যে সমগ্রতা আছে তা অবশ্যই একটা উপলব্ধির পূর্ণতায় দিকে তাকে এগিয়ে দেয়। আর সেটি সম্ভব হতে পারে যদি মাতৃভাষা শিক্ষণীয় বিষয় সূচিকে একটি মাত্র প্রকাশ-সূত্রে গ্রথিত করতে পারে।

# ৩ মাতৃভাষা শিক্ষণের নীতি ও পদ্ধতিঃ স্তরবিভাগ ও পদ্ধতির বিভিন্নতা

মাতৃভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণে কোন্ বিশেষ নীতি বা পদ্ধতি অনুসৃত হবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে, প্রথমেই আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? আমরা বাঙ্গালী বলে বাংলাই আমাদের মাতৃভাষা, এই ভাষার সঙ্গে আমাদের আবাল্য যোগ—তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ভাষাই আমাদের অনুভূতি প্রকাশ ও কর্মতৎপরতার প্রক্রিয়াকে সচল রাখার প্রধানতম মাধ্যম। সব ভাষায় মত বাংলাভাষারও দুটো দিকের সঙ্গে আমাদের জীবন জড়িত। একটি হচ্ছে এর ব্যবহারিক উদ্দেশ্যসাধকতা এবং অপরটি হচ্ছে সাহিত্য সৌন্দর্য সৃষ্টি ও উপলব্ধির মাধ্যম। আমাদের জীবনে কাজের ভাষা হিসাবে বাংলার প্রয়োগ অপরিহার্য বলেই অপ্রতিহত সত্য, যদিও অপর ভারতীয় ও বিদেশী ভাষার সাহায্য গ্রহণ ক্ষেত্রবিশেষে নিন্দনীয় এবং অপাংক্তেয় নয়। অতএব, সেদিক থেকে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে চায়। কিন্তু, সেখানেই আমরা থেমে যাব না। বাংলাকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে তার সৌন্দর্যের বিমল আলোকেও আমরা উদ্ভাসিত হতে চাই। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল ভাষায় একটা নির্দিষ্ট সৌন্দর্য গুণান্বিত মানের পরিচয়লাভের যোগ্যতা অর্জন। অর্থাৎ সহজ কথায় একটি ভাষাভিত্তিক রসদৃষ্টি লাভ করা। এর সঙ্গে আর একটি কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। অপরের সৃষ্টি যেমন উপভোগ্য, আপন সৃষ্টিক্ষমতার বহিঃপ্রকাশও ততখানিই কাম্য। অতএব, নিসংশয়ে বলা যায় যে, ভাষা শিক্ষার আর একটি বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে, সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের যোগ্যতা অর্জন যদিও সেটি প্রধানতঃ প্রতিভা নির্ভর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—ভাষার একদিকে রয়েছে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব এবং অপরদিকে রয়েছে তার সৃজনধর্মিতা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি। ভাষার যেখানে বিজ্ঞানসম্মত রূপ, সেখানে তার বিশ্লেষণে চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ প্রবণতা। চিন্তার ক্রমও অনেকটা সমধর্মী বিষয়। কারণ, শব্দকে আমরা যেমন চিন্তার উপাদান মনে করি, তেমনি চিন্তাকেও শব্দ সমন্বয়ের মধ্যে রূপদান করতে হয়। এ সবের সূত্রেই চলে আসে ভাষার ইতিহাস, শব্দতত্ত্ব, ব্যাকরণের নানা দিক, ভাষার সামাজিক দিক এবং ভাষার স্বভাবধর্মের আলোচনা। এছাড়া আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমরা একে অবলম্বন করে কিভাবে চিন্তায়, কথায়, লিখনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশে এবং অপরের প্রকাশ সৌন্দর্য্য মূল্যায়নে সক্ষম।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় এই দিকগুলো মনে রাখলে আমাদের নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণে কোন অসুবিধা বা সংশয় দেখা দেওয়ার কথা নয়। প্রথমে ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব কিভাবে প্রায় হাজার বছর ধরে ইতিহাসের গতিপথ ধরে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভাষার

গঠন বৈশিষ্ট্যের এই ইতিহাস বেশ জটিল হলেও কয়েকটি সাধারণ ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভাষা গঠনে মানুষের ব্যবহারিক জীবন খুবই সক্রিয় উপাদান, সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার থেকেও অধিকতর শক্তিশালী উপাদান হল তার সাংস্কৃতিক জীবন। বাংলা ভাষার আদি ও মধ্যযুগীয় উপাদান এবং সেগুলিকে অবলম্বন করে বহুমুখী সাহিত্যের প্রকাশ—সবই সম্ভব হয়েছে বাঙ্গালীর ধর্মীয় জীবন-চারণের বিশিষ্ট রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই। বাংলা ভাষার শব্দসম্পদও গড়ে উঠেছে এই বিচিত্র জীবনচারিতা থেকে। পরে যুগ যত এগিয়েছে ভাষা ততই সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষাচর্চায় তাই একদিকে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অপরদিকে চাই ঐতিহ্য চেতনা অর্থাৎ ইতিহাস—দৃষ্টি। এবং নীতি হিসাবে এ দু'টিকেই অবলম্বনযোগ্য বলে মনে করতে হবে।

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যাদের বিবর্তন ও নবরূপায়ন সম্ভব হয়েছে ঐতিহাসিক প্রভাবের ফলেই। সেই সব শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে জাতীয় জীবনের নানা অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত অধ্যায়। বাংলা ভাষা চর্চায় তাই দরকার সংস্কৃতি-সচেতনতা। ভাষা এক দিনের ফসল নয় বলেই তার উপযোগিতার ধর্মটির মূল সত্যকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জ্ঞান, মনন, ও বোধের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এইভাবে বাংলা ভাষাচর্চাকে জীবনরসে জারিত করে জ্ঞানের বস্তুতে পরিণত করার পরিবর্তে হৃদয়ের খাদ্য করে তুলতে হবে। শিক্ষককে তাই অতীত অধ্যাপনার নীরস ও হৃদয়হীন পদ্ধতির কথা বিস্মৃত হয়ে সহৃদয় সরসতার দ্বারা নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। এবং তা করতে হলে স্বদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি নিজেকে করে তুলতে হবে শ্রদ্ধাশীল—নিজেকে হতে হবে জীবননিষ্ঠ ও অন্বেষা-তৎপর। ভাষাকে চলমান জীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকরণ ও সাহিত্যিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করা যেমন অবশ্য প্রয়োজন, তেমনি ভাবে তাকে অতীত জীবনাশ্রয়ী সত্য বলেও গণ্য করতে হবে এবং এই সবের মধ্যেই একটা অখণ্ড প্রাণধারার বর্তমানতার আবিষ্কার করে শেষ পর্যন্ত তাকে জীবনের গতিশীলতা ও পরিবর্তন ধর্মের আধারে স্থাপন করতে হবে।

শব্দের অর্থ লুকিয়ে থাকে তার গঠনের মধ্যে এবং অর্থের তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন থাকে জাতীয় জীবনধারার ইতিহাসের মধ্যে। আর জীবনের মধ্যে থাকে ব্যবহারিক তাৎপর্য এবং ভাবের ঐশ্বর্য। ভাষার মধ্য থেকে এই দ্বিবিধ সত্যের রূপোদ্ঘাটন তাই কাম্য। বাগ্‌ধারাকে ভাষার ভাবগত মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে। এই সব বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যেই মানুষের সামাজিক মনের ছবিটি ঠিকমত ধরা পড়ে। এর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের সত্য থাকে, আবার জাতীয় জীবনের সাধারণ সত্যও এসবের মধ্যে পরিস্ফুট। জাতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক সত্যের উপাদান কখনও বা একটিমাত্র শব্দে পাথরে খোদিত অক্ষরের মত বর্তমান থাকে। 'গোত্র' শব্দটি সেরূপ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার একটি বিশিষ্ট সত্যের উপর তীব্র আলোকপাত করছে। আমাদের বর্তমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যটি যতই অনভিপ্রেত হ'ক না কেন, সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে কোন যুক্তিতে ?

ভাষা শিক্ষায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির অনুসরণ অপরিহার্য। বাংলা ভাষার পর বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভাব সুপ্রচুর। তাছাড়া বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্পদ অনেক সময় নির্দ্বিধায় আমরা আমাদের শব্দের মধ্যে গ্রহণ করেছি। অভিধান সমৃদ্ধ হয়েছে—তারই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে ব্যাকরণের নতুন সূত্র—পারস্পরিক প্রভাবে সম্পূর্ণ নতুন শব্দও গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পূর্বভারতের ভাষাগুলোর উৎস একটি হওয়ায় পারস্পরিক শব্দসাদৃশ্য বিস্ময়কর। ভাষার আলোচনায় তাই একটি উদার তুলনামূলক পদ্ধতি চাই।

সুযোগ পেলেই যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক কুসংস্কারকে বর্জন করে সন্নিহিত ভাষাবৈশিষ্ট্য ও তাদের ভাষাতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধানের নীতি অবলম্বন করবেন—সাহিত্যের আলোচনাকেও তেমনি বহুমুখী করে তুলবেন। সত্যদর্শনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, সেই সঙ্গে তার স্বীকৃতির জন্য দরকার উপযুক্ত ঔদার্যের। সর্বদা উন্নত ভাষার প্রভাব যে অনুন্নত বা স্বল্প উন্নত ভাষার উপর পড়বে তেমন কোন কথা নেই; বস্তুত বিপরীত সত্যটিও কম দেখা যায় না। ভাষায় পারস্পরিক প্রভাবকে একটি স্বাভাবিক সত্য বলে বিবেচনা করে তাকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি জানাতে হবে।

একই কারণে সাহিত্যের প্রেরণা ও ভঙ্গীগত প্রভাবও একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। উনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পিছনে যে বিদেশী প্রভাব সুপ্রচুর মাত্রায় সক্রিয় ছিল তা একটি স্বীকার্য্য সত্য। মধুসূদনের উপর বিদেশী প্রভাবও সর্বজন পরিজ্ঞাত সত্য। অনুরূপভাবে আধুনিক হিন্দী কথাসাহিত্য ও কবিতা যে বাংলা সাহিত্যের উক্ত দুটি বিভাগের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত—সেটিও একটি বাস্তব সত্য। বাংলা সাহিত্যের পরিধি আজ সুবিস্তৃত এবং পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠস্থানীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার তুলনা সর্বদাই হতে পারে—এমন ধারণা পোষণ ও প্রচার কোন ভাষান্ধতা সম্ভূত নয়। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তাই বিশ্বসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক অবতারণা একটি গ্রহণযোগ্য নীতি ও পদ্ধতি। অবশ্য একথা সত্য যে, জাতীয় জীবনই জাতীয় সাহিত্যের মর্মমূল ব'লে—আমাদের বাস্তব ও ভাবজীবনের প্রতিফলন কতখানি বাংলা সাহিত্যের মধ্যে হয়েছে—তার বিচার অবশ্যই করণীয়।

### স্তরবিভাগ ও পদ্ধতির বিভিন্নতা

বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা হলেও শিক্ষার সর্বস্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ক্রম এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত পদ্ধতি অনুসারী হওয়া সমীচীন। বয়সের বিভিন্নতা অনুসারে গ্রহণযোগ্যতা ও শিক্ষার ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। শিশুর প্রকৃত বয়স অর্থাৎ কালানুক্রমিক বয়স ( Chronological Age ) যাই হোক না কেন, শিক্ষার ব্যাপারে তার মানসিক বয়সই ( Mental Age ) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষায় স্থিতি ও ফলপ্রসূতা ( Retention & Effectiveness ) মানসিক যোগ্যতা তথা বৌদ্ধিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল। অনুকূল বা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও শিক্ষার্থীর উপর খুব বেশী।

ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যিক অনুশীলন যেহেতু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সহৃদয় আনুকূল্যের পথ ধরে চলে, সেজন্য এসবের শিক্ষার ব্যাপারে শিশুর বয়সগত যোগ্যতা, শিক্ষার প্রবণতা, পটভূমিকা, প্রভাব প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের কথা মনে রাখতেই হবে। শিক্ষার্থীর বয়স, রুচি ও সামর্থের কথা স্মরণ রেখে ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার বিষয়কে আমরা মোট চারটি স্তরে ভাগ করতে পারি।

(১) প্রাক্ প্রাথমিক স্তর—( ২—৫ বৎসর )
(২) প্রাথমিক স্তর —( ৫—৮/৯ বৎসর )
(৩) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর —( ১০—১১ বৎসর )
(৪) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর—(১২-১৫ বৎসর )

প্রত্যেকটি বিভাগের বিভিন্নতা অনুসারে মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে অবলম্বন করে বিভিন্ন স্তরের জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে এবং শিক্ষাপদ্ধতির পার্থক্যের কথাও বিবেচনা করতে হবে। পাঠ্যসূচী ও পদ্ধতির পৃথকীকরণ সত্ত্বেও সব স্তরের মধ্যে যে একটা ক্রম ও ভাবগত পরম্পরা বা যোগসূত্র থাকে—তাও ভুললে চলবে না।

## (১) প্রাক্ প্রাথমিক স্তর—

শিশুর শৈশব গৃহজীবন পিতামাতা এবং আত্মীয় পরিজনের সস্নেহ সাহচর্যে অতিবাহিত হয়। গৃহপরিবেশ কেমন হবে তারই উপর নির্ভর করে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও অন্তর্জীবনের বিকাশ-ধারা। শিশুর জীবনের প্রথম পর্যায়ে একটা দিকে থাকে স্বতঃশিক্ষা ( Auto Education ), অপরটিতে থাকে নির্দেশিত ( Guided ) শিক্ষা। ভাষা শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ভাব গ্রহণ ও ভাব গঠনে এই নির্দেশিত শিক্ষার মূল্য খুবই বেশী। কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হলেও শিশুর প্রথম কথা শেখার কালকে ১ বৎসর ধরা যেতে পারে। স্বরধ্বনির উচ্চারণের সূত্রেই তার মনোভাব প্রকাশের প্রচেষ্টার সূচনা। আর মায়ের সাহচর্যেই তার প্রথম ভাব প্রকাশ—মায়ের আনুকূল্যেই তার পুষ্টি। বর্ণ থেকে শব্দ—অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন উভয়ের সাহায্যেই তার আত্মপ্রকাশ। পরের স্তরে ভগ্ন বাক্যের ব্যবহার—হয়ত পূর্ণ বাক্য উচ্চারণে অক্ষমতার জন্যই, এবং সবশেষে আসে পরিপূর্ণ অর্থ সমন্বিত পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার।

শিশুর জীবনে এই স্তরটি বিদ্যালয়ের আওতায় থাকে না বলে—তার শিক্ষার দায়িত্বটি গ্রহণ করতে হয় মা ও বাবাকেই এবং প্রধানতঃ মাকে। তাঁর বিবেচনা ও যোগ্যতার উপরেই শিশুর আত্মপ্রকাশের পথটি সুগম হয়। এই স্তরে যে মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করতে হবে তা'হল শিশুর ক্রমবর্ধমান আত্মনির্ভরতা। শিশু যদি মানসিক প্রত্যয়কে অর্জন করতে না পারে—তবে সব প্রচেষ্টাই বিফল হতে বাধ্য। তাই মায়ের দিক থেকে কোন প্রকারের অসহিষ্ণুতা, নিষ্ঠুরতা শিশুর মানসিক গঠনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানা যায় মায়ের সহৃদয় উষ্ণ সমর্থন ও সুবিবেচনা শিশুকে ক্রমাগত আত্মপ্রকাশে তৎপর করে তোলে।

দিন যত এগিয়ে যায়—শিশুর অভিজ্ঞতা ততই বিচিত্রমুখী হয় এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশের অবলম্বন হয় নতুন নতুন শব্দ। অতএব শিশু যাতে উত্তরোত্তর নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারে—তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে পিতামাতাকেই। শিশু যে নতুন জিনিসের মনোহারী রূপেই আকৃষ্ট হয় তাই নয়—তার বিচিত্র নামের ধ্বনি বৈচিত্র্যও তার কাছে পরম বিস্ময় ও আকর্ষণের সামগ্রী। মোটকথা শিশু মনের স্বাভাবিক কৌতূহলকে ভিত্তি করে ভাষা শিক্ষায় বীজটি বপন করতে হবে এই স্তরেই, আর মাকেই নিতে হবে প্রধান ভূমিকা।

কৌতূহল যেমন শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা, আত্মপ্রকাশের কামনাও তেমনি। শিশু একটু বেশী কথা বলতে শিখলে ছড়া বলতে খুবই ভালবাসে। এখানেও তার অবলম্বন আত্মনিষ্ঠা বা স্ব-প্রত্যয়। মা যেমন তাকে শব্দ থেকে নতুন শব্দে এবং পদ থেকে ছোট বাক্যে পৌঁছে দেবেন, তেমনি তাকে কাল-সচেতন করে ( Time-Conscious ) বাংলা ক্রিয়াপদের বিচিত্র রূপের সঙ্গে তাকে ধীরে ধীরে পরিচিত করে তুলতে হবে। এইভাবে ভাষা শিক্ষার অপরিহার্য সত্য—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের সূচনা হবে। শিশু তিন বৎসর বয়স থেকেই এটি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলে এবং পরে বেশী অসুবিধার সম্মুখীন না হয়েই কাল-পার্থক্য সূচয় বাক্যের ব্যবহারে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি হল—শিশুর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা। এই জাতীয় ভাষাশিক্ষার মধ্যে যতই স্বাভাবিকতাই থাক না কেন—কিছু পরিমাণে যান্ত্রিকতা থাকবেই। আর তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয়কে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হলে সাহায্য নিতে হবে ছবি, ছড়া ও গানের এবং এতেই তার কাছে উন্মোচিত হবে সৌন্দর্যের নব দিগন্ত।

স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে শিশু তার প্রকাশভঙ্গীকে উত্তরোত্তর বৈচিত্র্যময় এবং সাহিত্য গুণান্বিত করে তোলে। কথা বলার এক জাতীয় ধ্বনি মাধুর্য্যের ব্যবহারেও সে সক্ষম হয়—'তোমাকে দিলাম'—'আমি তোমাকে দিলাম'—'আমি ত তোমাকে দিলাম'—'দিলাম ত আমি তোমাকে, এই ত দিলাম'—ইত্যাদি বাচনভঙ্গী শিশুর কাছে সুদুর্লভ ব্যাপার নয়। ছড়া, ছোট্ট কবিতা ও গানের মধ্যে অর্থময়তা, ধ্বনি সৌন্দর্য্য ও শব্দের অর্থ-বিরহিত ধ্বনিময় বিন্যাসও শিশুর কাছে অসীম তাৎপর্য বহন করে। পূর্ব স্তরেই বস্তু ও ভাব নাম-বাচক শব্দের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচিত হয়েছে। এখন তাদের ক্রিয়াশীলতা ও ভাব সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনা শিশুর চিত্তকে এক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ দেয়। একই সঙ্গে তার আত্মপ্রকাশের বাসনাকে ( Self-assertion ) অবলম্বন করে তাকে শেখাতে হবে ছোট আকারের ছড়ার আবৃত্তি। গানের ছত্রকটি থেকে সহজ হালকা পংক্তি গাইতে শেখানই বা কি দোষের? 'আমার কথাটি ফুরাল/নটে গাছটি মুড়াল'—এই জাতীয় ক্রিয়া পরম্পরা—সমন্বিত ছড়াটিকে অঙ্গভঙ্গী সহকারে শেখানও যথেষ্ট ফলদায়ী বলেই মনে হয়। ছবির বই এর নীচে বড় বড় হরফে ছবির পরিচয় জ্ঞাপক শব্দটি থাকলে সেটি চিনতে শেখান যেতে পারে। এটি শব্দক্রমিক পদ্ধতির অনুসরণ। এর মধ্যে যান্ত্রিকতা নেই বললেই হয়। কাছাকাছি

জায়গায় ভ্রমণের মধ্যে শিশু যেমন দর্শন জনিত আনন্দ পায় তেমনি সেই আনন্দজনক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের আগ্রহও তার কম নয়। বেড়ানর গল্প বলতে বলে আমরা তাকে পুনঃ প্রকাশের ( Reproduction ) ক্ষমতা অর্জন ও ভাব বৃদ্ধিকে সাহায্য করতে পারি। গল্প শেখান এবং পরে সেই গল্পটি বলতে বলা অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া।

## (২) প্রাথমিক স্তর—

এতক্ষণ শব্দ শেখা, বস্তু ও শব্দের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার, উচ্চারণ-যোগ্যতা, শব্দ ও চিন্তার মধ্যে অনুষঙ্গের সৃষ্টি ও ভাবাত্মক আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়ে একটা সাহিত্যকেন্দ্রিক সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল। এসবের সঙ্গে ভাষা শিক্ষায় প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে প্রাথমিক স্তরে পড়া ও বলার সঙ্গে লেখার কাজটির ও সংযোগ সাধন করতে হবে। শব্দ যদি অর্থময় চিন্তার চিত্ররূপ হয় তবে তার একটি বিশিষ্ট প্রকাশময় তাৎপর্য রয়েছে। তাছাড়া, নতুন শিক্ষার্থীর কাছে পঠন ও লিখন একটি সমান্বিত অর্থাৎ যৌথ প্রক্রিয়া। মনস্তাত্ত্বিকগণের মতে দু'টি ক্ষেত্রেই সমকালীন নিপুণতা অর্জন করতে হবে। লিখন শিক্ষায় প্রথম স্তরে শিশুকে ইচ্ছামত আঁচড় কাটতে দিতে হবে। তার ফলে মাংসপেশীর উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় উন্মেষ ও বৃদ্ধিসাধন হবে। লিখন প্রক্রিয়াটি আসলে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, চিন্তা ও দৈহিক কার্যকারিতা এসবের মধ্যে একটি এককালীন সমন্বয় সাধন। শিশুকে একটু দীর্ঘসময় ধরে তার সুযোগ দিতে হবে। ছোটখাট ছবি আঁকতে দেওয়াও এ ব্যাপারে একটি প্রবর্তিত পদ্ধতি। শিশু পেন্সিল হাতে নিলেই যে ছবি আঁকা শিখে ফেলবে এবং লিখতেও শিখবে তা নয়। তবে, এর সাহায্যে সে আরও বেশী নিপুণতা অর্জন করবে।

প্রাথমিক স্তরে আবার স্পষ্ট দু'টি স্তর রয়েছে—একটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী নিয়ে এবং অপরটি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কাল। বলা বাহুল্য, এই দুই উপবিভাগে শিক্ষার ধারা এবং শিক্ষণীয় বিষয়—দুই ক্ষেত্রেই একটা পার্থক্য থাকা সমীচীন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে ভাষাশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হবে তার কথাগুলিতে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ অন্য দিক থেকে উন্নত মানের হলেও শিশুশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এগুলির কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি আছে। আগেকার শিক্ষার ধারা ছিল শিশুমনস্তত্ত্বের জ্ঞান বর্জিত। অপরপক্ষে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষতঃ শিশুশিক্ষার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে ভিত্তি করে রচিত। শিশু কোনটি পছন্দ করে এবং ভালবাসে, তার যোগ্যতাই বা কতখানি এবং অর্জিত বিষয় তার মন কতখানি ধরে রাখতে পারে—এ সবই শিশু শিক্ষার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এসব কথা মনে রেখেই শিশুপাঠ্য মাতৃভাষা ও সাহিত্য-পুস্তক প্রণীত ও পরিকল্পিত হয়। আধুনিক রীতির এইসব পাঠ্যপুস্তকে বর্ণাঢ্য ছবির যে শোভাযাত্রা, শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের বৈজ্ঞানিক কৌশল এবং মুদ্রন পারিপাট্য আছে তা শিশুর প্রয়োজন ও রুচির উপযোগী। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তক শিশুকে

পড়াশোনায় উৎসাহিত করে। প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে তাই উক্ত বিশেষত্বগুলি থাকতেই হবে।

বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বিষয় সন্নিবেশে বিশেষ কৌশল ও রীতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশে একটা ক্রম অনুসরণ করতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার অনভিপ্রেত। মৌলিক ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি সহযোগে গঠিত শব্দ একটা ক্রম অনুসারে সাজিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শব্দ ও সরল ছোট বাক্যের ব্যবহারে তাকে সম্পূর্ণতা দিতে হবে। বাক্যের ব্যবহার পুস্তকের শেষে থাকলেই ভাল হয়। অবশ্য কোন রীতি গ্রহণ করা হচ্ছে—শব্দক্রমিক, বর্ণানুক্রমিক অথবা বাক্যক্রমিক —তার উপরেই সাজানর ধরণটি নির্ভর করছে। আর এইসব পদ্ধতির প্রত্যেকটির নিজস্ব কিছু দোষগুণ রয়েছে। যাই হোক, সহজ থেকে কঠিনে এবং পরিচিত থেকে অপরিচিতের দিকে যাওয়াই সাধারণ রীতি।

প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য সরকার প্রকাশিত নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 'কিশলয়' রয়েছে। এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশনার পশ্চাতে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি এগুলি যে সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত—ত' বলা যায় না। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমাজ—যাঁদের উপর এই বই পড়ানর দায়িত্ব রয়েছে—তাঁদের এই বইএর দোষগুণ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের পঠন-পাঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 'কিশলয়' এ খ্যাতনামা সাহিত্যিকের রচনার পাশাপাশি অনেক স্বল্প পরিচিত বা বিস্মৃত পরিচয়-লেখকের রচনা সান্নবিষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে যাঁরা স্বল্প পরিচিত তাঁদের সম্যক পরিচয় যথাযোগ্য উৎস থেকে ( 'নূতন বাংলা অভিধান' বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' জাতীয় কোষগ্রন্থ ) সংগ্রহ করে পরিবেশন করতে হবে। পুস্তকে মুদ্রিত ছবি ছাড়াও আনুষাঙ্গিক কিছু ছবি বড় আকারে এঁকে পাঠদানের সময় ব্যবহার করলে ভাল হয়। সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হবে শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জনের দিকে। সুচারুরূপে পড়া, কিছু বলা, আবৃত্তি এবং লিখন ইত্যাদির ভাষাগত বিশুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্য ও সৌকর্যের দিকেও সমান দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে ভাষার বিশিষ্টতা যেমন তার ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি ও সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, তেমনি তার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যসাধন এবং গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশের উপযোগিতাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিক স্তরকে তার সূচনা কাল বলে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীর মনে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার শেষ লক্ষ্যের প্রাথমিক উন্মেষ হ'ল কিনা। প্রকৃতপক্ষে মানসিক আনুকূল্য থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ণ প্রকাশময়তার স্তরে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। বস্তুময় অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাই ভাবময় প্রকাশের তাৎপর্য যাতে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করে তার ব্যবস্থাও করা একান্ত প্রয়োজন।

**(৩) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর—**

এই স্তর হচ্ছে শিশুর কৈশোর জীবনের উন্মেষ পর্ব এবং সেজন্যই দেহ ও মনের দ্রুত বিকাশের কাল। এই বয়সের বালক বালিকারা ক্রমে অধিকমাত্রায় শারীরিক তৎপরতা,

মানসিক উজ্জীবন এবং উৎসাহ মুখরতার অধিকারী হয়ে ওঠে। বিশাল অনন্ত বৈচিত্রের বিস্ময় ও অনুদ্ঘাটিত রহস্যের আহ্বান তাদের আরও বেশী মাত্রায় বহির্মুখী করে তোলে। কৌতূহল চরিতার্থ করার সজাগ প্রয়াস তাদের মধ্যে সদাই লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বীরত্ব, ও মহত্ত্বের নানা রূপ তাদের কাছে আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা তাকে আত্মপ্রকাশে অনুপ্রেরিত করে এবং আত্মপ্রকাশের একটা ব্যাকুলতাও সে অনুভব করে। এই পর্যায় তার বিশিষ্ট রূপলাভের পক্ষে খুবই উপযোগী। এটি তার সৌন্দর্যবোধ ও জাগরণের কালও বটে।

(শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকে ভাষা শিক্ষার রহস্যময় কার্যকারণসূত্রে আবিষ্কারে প্রয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষককে দেখতে হবে—সে কতখানি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে একটা সাধারণ সূত্রে উপনীত হতে পারে এবং ব্যাকরণের আলোচনায় সে তার জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জিত শব্দাবলী ও ভাষাভঙ্গীকে কিরূপ সফলতার সঙ্গে ব্যবহারে সক্ষম হয়।) ব্যাকরণের জটিল আলোচনার অবতারণা না করে তাকে সহজ বিশ্লেষণ ও ভাষা বিশুদ্ধির জ্ঞানের দিকে এগিয়ে দিতে হবে। ব্যাকরণের সূত্র আয়ত্ত অপেক্ষা ভাষার ব্যবহারিক বিশুদ্ধতা অর্জন অধিকতর কাম্য। শিক্ষার্থীর মানস-বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করে তাকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত, আবিষ্কার কাহিনী, স্বাদেশিকতা ও বীরত্বের কাহিনী, মনীষীদের জীবনী, বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত, সহজবোধ্য কাহিনীমূলক কবিতা, মানুষের শাশ্বত জীবন-বোধ সমন্বিত রচনা প্রভৃতি পাঠের সুযোগ করে দিতে হবে। এভাবেই তার মানস-বিকাশের কাজ এগিয়ে চলবে।

### (৪) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর—

সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকালকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলে গণ্য করতে পারি। অবশ্য অনেকের বিবেচনায় সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক এবং নবম ও দশম শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণী। নামকরণের দিক থেকে আমরা যাই বলিনা কেন, শিক্ষার্থীর বয়সই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কারণ, তার এই বয়সের মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাপদ্ধতি নির্ণীত হবে। এই সব শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা বয়সের দিক থেকে কিশোর ও কিশোরী। মনস্তাত্ত্বিকদের মতানুসারে, এই বয়সটাই মানুষের জীবনে প্রধান সঙ্কট কাল। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন এই সময়েই সর্বাধিক পরিমাণে ঘটতে থাকে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যায়কে আমরা যৌবনের সূচনাকাল বলতে পারি। জীবন রহস্যের প্রতি নতুন কৌতূহল এবং আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা এই সময়কার প্রধান স্বভাবধর্ম। দেহের লক্ষণীয় পরিবর্তন তার মধ্যে মানস-পরিবর্তনের সূচনা করে। স্বাভাবিক আবেগ প্রবণতার সঙ্গে কখনও বা মিশে যায় জীবন স্বপ্নে বিভোর হওয়ার এক বিশুদ্ধ প্রেরণা। অপর দিকে এই সব কিশোর কিশোরী একটা সমাজ সমস্যারও সম্মুখীন হয়—এরা ঠিক ছোটও নয়, আবার বড়র দলের প্রবেশের অনুমতিও লাভ করে না। আপন জনের কাছে সস্নেহ ব্যবহার পেলেও সমাজের অপর সকলের কাছে লাভ

করে এক নীরব উপেক্ষা। এইভাবে উপেক্ষিত হওয়ার বেদনা সহ্য করা তাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে ওঠে।

এদের জন্য তাই শিক্ষকের তরফ থেকে চাই সস্নেহ, প্রীতিপূর্ণ, উৎসাহজনক সহৃদয় ব্যবহার। আবেগপ্রবণতা কিশোর জীবনের প্রধান ধর্ম বলে যে কোন প্রকারের মানসিক আঘাত ও সংক্ষোভ থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। শিক্ষার ভাবজীবনের পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের সুকুমার দিক অর্থাৎ কবিতা এবং রচনায় মত সৃজনশীল বিষয়ের প্রতি অধিক মাত্রায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সাহিত্যের যে সব অংশে মানুষেব স্বার্থত্যাগ, মহত্ত্ব ও ঔদার্যের প্রকাশ হয়েছে তার ঔজ্জ্বল্যও তাদের যথেষ্ট আকর্ষণের সৃষ্টি করবে। কিশোর মনের বিভিন্নমুখী বিকাশের সম্ভাবনার কথা মনে রেখে তাকে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কীর্ণ সীমায় মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। বৃহত্তর পৃথিবীর কাছ থেকে যে আহ্বান নিয়তই আসছে তাতে সাড়া না দিয়ে তার উপায় নেই। নানারকম সৃজনশীল কাজে তাকে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দিতে হবে এবং সাহিত্য-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে অথবা অন্যবিধ উপায়ে অর্থাৎ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তর্কসভার অনুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির সাহায্যে তার অহংবোধকে চরিতার্থ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পাঠাগারের বৃহত্তর সঞ্চয় তার মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। এই সময় ভ্রমণ কাহিনী, দেশ আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বৃত্তান্ত, খেলাধুলার ইতিহাস ও বিশ্ববিখ্যাত ক্রীড়াবিদগণের জীবনকাহিনী বিষয়ক গ্রন্থ তার জানবার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করবে। যৌবন-মানসের উন্মেষের কথা মনে রেখে বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যের সংক্ষেপিত সংস্করণগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। উত্তর জীবনে এদের মধ্যে অনেকেই যাতে সাহিত্যপ্রেমিক হয়ে উঠতে পারে তার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সাহচর্য ও উৎসাহ এবং নির্দেশদান একান্ত অপরিহার্য। কিশোরদের ভাবজীবনের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচারবোধের সম্যক বিকাশের জন্যও আমাদের তৎপর হতে হবে। ভাষার আলোচনা কেবলমাত্র পাঠ্য ব্যাকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলা ভাষার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে এবং সামঞ্জস্য বিধায়ক অপর ভাষা-বৈশিষ্ট্যের প্রতিও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কিশোরদের মনের দিক থেকে উদার এবং চিন্তার দিক থেকে যুক্তিশীল করে তুলতে হবে।

বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তারও আগে যে বাংলা গদ্য ছিল তা সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ছিল না। চিঠিপত্রে, দলিলে এবং জীবনের ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে গদ্যের প্রচলন ছিল। এদিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী বাংলা গদ্যের বয়স দেড়শ বছরের কিছু বেশী।

পৃথিবীর প্রায় সকল জীবন্ত ভাষারই দু'টি রূপ থাকে—একটি **লিখিত বা সাহিত্যিক** রূপ, অপরটি **মৌখিক বা কথ্য রূপ।** ভাষার যে রূপটি সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় তা হ'ল তার লিখিত বা সাহিত্যিক রূপ। আর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জন্য, কথোপকথনের জন্য ভাষার যে রূপটির ব্যবহার হয় তাকে বলে মৌখিক বা কথ্য রূপ। অঞ্চল ভেদে মৌখিক বা কথ্যভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত বৈষম্য প্রবল আকারে দেখা যায়। বাঁকুড়া-বীরভূমের কথাভাষা নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষার অনুরূপ নয়। কিন্তু সাহিত্যের ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বাংলায় একটা সংস্কৃতানুগ ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল এবং শতবৎসরের সাধনায় তার একটি সুন্দর রূপ গড়ে উঠেছে। প্রথম অবস্থায় এই সাহিত্যিক ভাষা বাংলা গদ্য সাহিত্যে এবং চিঠি পত্রাদিতে ব্যবহৃত হতে থাকে। অভিধানগত ও সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দের প্রতি সাধুভাষার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় এবং সাধুভাষায় ইডিয়মের অপেক্ষা আভিধানিক শব্দের গৌরব বেশী থাকায় এতে রচনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। বাংলাভাষার মৌলিক সর্বজনীন রূপটিই হচ্ছে সাধুভাষার ভিত্তি। এরপর বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের প্রতিভার যাদুদণ্ডে বাংলা ভাষা এক সুষমামণ্ডিত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এরই পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌখিক ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিক্ষিত লোকেদের কথ্যভাষাকে আশ্রয় করে চলিতভাষার উদ্ভব। সাধু এবং চলিত ভাষার পার্থক্য মৌলিক নয়। একই শব্দ সাধু ও চলিত ভাষায় সমভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধুভাষায় অবশ্য শব্দটির প্রাচীনতর গম্ভীর রূপটিই গৃহীত হয়, আর চলিত ভাষায় আধুনিক কথ্যরীতির রূপটিই অবলম্বিত হয়ে থাকে।

সাধুভাষা ও চলিতভাষা উৎপত্তির ইতিহাস অতি বিচিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই নানাকারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। এর একদিকে ইউরোপীয় মিশনারীগণ, রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়দের চেষ্টায় গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব ও অন্যদিকে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাভাষার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা হল। এরপর গদ্য-প্রস্তুতির প্রাথমিক স্তর অতিক্রান্ত হলে বাংলাগদ্যের অন্যতম রূপকার বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার একটা সুস্থির

এবং সর্বজনমান্য রূপ দিলেন। গদ্য সাহিত্য হল সরস ও শিল্পগুণসম্পন্ন। তিনি নিজে একে **সাধুভাষা** বলে অভিহিত করলেন।

ভাষা চিরপ্রবহমানা, কোন একটি বিশেষ রূপের শৃঙ্খলে একে আবদ্ধ করা যায় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের চলাচল ব্যবস্থার ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল, কলকাতার সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হল। ফলে সমাজজীবনে কলকাতার গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। অতএব যখন কোন কুশলী শিল্পী কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের কথ্যভাষাকেই সাহিত্য-রচনার বাহনরূপে গ্রহণ করলেন, তখন নীতিগত কারণে কেউ কেউ আপত্তি করলেও বাস্তবে বেশী বাধার সম্মুখীন হতে হল না। ফলে সৃষ্ট হল প্যারীচাদ মিত্র রচিত আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত হুতোম প্যাচার নকসা (১৮৬২)। বর্তমানে বাংলা গদ্য সাহিত্যে চলিত ভাষ সাধুভাষার পাশাপাশি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে এখানকার নাম করা লেখকরা চলিতভাষায় সাহিত্য রচনা করে চলেছেন এবং এখনও করছেন। চলিত ভাষা সাধুভাষার রাজসিংহাসনে ভাগীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সাহিত্য রচনায় চলিত ভাষারই একাধিপত্য চলেছে। এছাড়া বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকে চলিতভাষার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

## সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার পার্থক্য

(ক) সাধুভাষা ও চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য 'সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের' রূপে, ঘটমান অতীত, ঘটমান বর্তমান কালের রূপ থেকে 'ইতে' লোপ এবং পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমান কালের রূপ 'ইয়া' স্থলে 'এ'র ব্যবহার চলিতভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে 'করিতেছিলাম' স্থলে 'করছিলাম' এবং করিয়াছিলাম স্থলে 'করেছিলাম' ব্যবহৃত হয়।

সর্বনামে 'তাহারা,' 'তাহাকে', 'তাহার', 'তাহাদের', 'ইহার', 'ইহাকে', 'ইহাতে', 'তাহা', 'উহা', 'উহাকে', 'উহার' চলিত ভাষায় 'তারা', 'তাকে', 'তার', 'তাদের', 'এর', 'একে', 'এতে', 'তা', 'ও', 'ওকে', 'ওর' এইসব শব্দে রূপান্তর ঘটে থাকে।

(খ) সাধুভাষার বহুশব্দ অপনিহিতির স্তর পার হয়ে চলিত ভাষায় অভিশ্রুতির স্তরে পরিবর্তিত হয়েছে—দেখিয়া> দেইখ্যা> দেখে ; আজি> আইজ> আজ

(গ) সমীকরণ চলিত ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য—করছি> কচ্ছি, চারিটি>চাট্টি, চাহিয়া>চেয়ে, মাইয়া>মেয়ে

(ঘ) সাধুভাষায় যেরূপ তৎসম শব্দের আধিক্য চলিত ভাষায় সেরূপ নেই, তদ্ভব, অর্ধতৎসম এবং দেশী শব্দ পাওয়া গেলে তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য অতি আধুনিক গদ্য সাহিত্যে কোন কোন লেখকের বাগ্‌ভঙ্গী চলিত ভাষার রীতি অনুযায়ী হলেও তৎসম শব্দবহুল।

(ঙ) উচ্চারণ অনুযায়ী চলিতভাষা লিখবার প্রচেষ্টা প্রায়ই দেখা যায়—করছি<করচি, গেছে<গ্যাচে

(চ) বিশিষ্টার্থক 'পদগুচ্ছ' বা 'বুলি' যে কোন ভাষার মতোই বাংলাভাষার অন্যতম সম্পদ। এই পদগুচ্ছগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলিত ভাষার আকারে গঠিত হয় বলে সাধুভাষার এদের ব্যবহার খুবই কম। যথাযোগ্যভাবে এই বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছকে সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাষা যথার্থ অর্থে 'চলিত ভাষা' নামে আখ্যায়িত হতে পারে।

(ছ) চলিতরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বরসঙ্গতির জন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন। এর ফলে স্বরধ্বনিগুলি একটা সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের সূত্রে গাঁথা হয়ে যায় যেমন—বিলাতী>বিলেতি ; দিয়া>দিয়ে ; পূজা>পূজো ; না>নে ; শুনা>শোনা প্রভৃতি

প্রায়ই দেখা যায় দুই ভাষার মিশ্রণের ফলে এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি হয়। এই মিশ্রণ অত্যন্ত দোষের এবং বাংলাভাষার রীতিবিরুদ্ধ। এই মিশ্রণ হলে তা না হবে সাধুরীতি, না হবে চলিতরীতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাত্রছাত্রীদের রচনায় এমন কি অনেক বয়স্ক ব্যক্তির লেখায় এই দুই রীতির সংমিশ্রণ প্রায়ই দেখা যায়। অনেক শিক্ষার্থী সহজ ও সরস হবে ভেবে চলিত ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দান করে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন চলিত ভাষায় অধিকারলাভ অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাংলা বাগ্‌ভঙ্গী এবং বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে না পারলে চলিত ভাষায় লেখার চেষ্টা না করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ অধিকাংশ দেখা যায় এরূপ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সাধু ও চলিতভাষার হাস্যকর মিশ্রণে পর্যবসিত হয়। সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার এই দূষণীয় মিশ্রণকে আমরা **গুরুচণ্ডালী দোষ** বলে অভিহিত করে থাকি। এই মিশ্রণ সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে হয়ে থাকে—

১। শিশু প্রথম কথা বলতে শেখে। আর এই কথা বলে থাকে চলিত রীতিতেই। এর অনেক পরে তারা পড়তে বা লিখতে শেখে। প্রাথমিক স্তরে পড়ার বই সাধারণতঃ সাধুরীতিতে লেখা। যখন তারা পড়া-লেখার সাহায্যে সাধুরীতি আয়ত্ত করে তখন বিদ্যালয়ের বাইরে তারা চলিতরীতিতে কথা বলে। ফলে কোন কিছু লেখার সময় চলিতরীতির বাংলা অজ্ঞাতসারেই তার লেখায় অনুপ্রবেশ করে।

২। ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সাধুরীতি ও চলিতরীতির মধ্যে রূপগত ও প্রয়োগগত পার্থক্য ছাত্রদের শেখান হয় না। এই দুই রীতির পার্থক্য সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন ক'রে তুলতে পারলে অশুদ্ধি অনেকাংশে নিবারণ করা যায়, নিবারণ যে সংশোধনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান একে মনে রেখে পূর্ব থেকেই অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদের শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করান যায়।

৩। বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে ও শুদ্ধ রীতিতে লিখতে হলে ব্যাপক পাঠের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে। দুঃখের বিষয় ছাত্ররা ব্যাপক পাঠে আগ্রহী নয় এবং ভাষা-প্রয়োগরীতি

আয়ত্ত করতে তাদের যত্ন ও চেষ্টা নেই। এই ঔদাসীন্য ও অসতর্কতার জন্য সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটেছে।

৪। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন। এদের এই অঞ্চলের চলিতভাষার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ না থাকায় তাঁরা সাধু রীতিতেই লিখতে অভ্যস্ত। কিন্তু যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে চলিত রীতিতে লিখতে গিয়ে প্রায়ই তাঁরা এই দুই রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকেন।

প্রতিকার সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ভাষার অনুশীলনে এবং বিশুদ্ধি-রক্ষায় ও উৎকর্ষসাধনে ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব ও আন্তরিকতাই প্রধান। ব্যাকরণে যে সকল নিয়ম ও দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এগুলি সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের বেলায়ই প্রযোজ্য। অতএব সাধুভাষায় ব্যবহার্য। চলিত ভাষায় তদ্ভব শব্দই অধিকতর সংখ্যায় প্রয়োগ করা হয় বলে সন্ধি সমাস সম্বন্ধে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

নানা রকমের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন গদ্যাংশ থেকে সাধুভাষা ও চলিতভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ছাত্রদের উপলব্ধি করতে শিক্ষককে সাহায্য করতে হবে। স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতি আলোচনাকালে এদের প্রয়োগপদ্ধতি এবং চলিত রীতিতে যে এদের ব্যবহার অনেক বেশী তা শিখিয়ে দিতে হবে। পরিশেষে বলা যেতে পারে ব্যাপক অনুশীলন এবং পাঠের মধ্য দিয়ে উভয় রীতি সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন এবং তাদের জ্ঞানকে দৃঢ়বদ্ধ করা সম্ভব। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাধুভাষা ও চলিত ভাষায় কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

## সাধুভাষা—

(১) কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন। তিনি অযাচিত-প্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদিতে যথাকথঞ্চিদ্রূপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিজন-প্রতিপালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ এই কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষীতে এবং শস্য নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল, তৎপ্রযুক্ত ঐ অযাচক ব্রাহ্মণের বড় অপ্রতুল হইল এবং পরিবার প্রতিপোষণে অনির্বাহ হইল। প্রবোধচন্দ্রিকা : —মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

(২) পঞ্চাশ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষ আচরণ করেন না ও আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ কামনা।

—রামমোহন।

(৩) এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখর-দেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বনপাদপসমূহে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

সীতার বনবাস : —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৪) জলের ধারে তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ বা ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছে। —বঙ্কিমচন্দ্র

**চলিত ভাষা—**

(১) আপনি না শুনিলে কহে কে। আমিই যেন মিথ্যা কহিলাম। গ্রামে আর লোক আছে জিজ্ঞাসা করুন গা দিকি তাহাদিগকে তাহারা কি বলেন। কথোপকথন: —উইলিয়ম কেরী।

(২) মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো। রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপিলেগুলি পুষিব। [illegible] শাক ভাত পেট ভরা যেদিন খাই সেদিন তো [illegible]

—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

(৩) বাবুরাম বাবু চোগা চাপকান—মাথায় ঝিলকির বস্তু-পাগড়ি বুটিদার-নলপুরুষে জুতা পায় [illegible] গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে একটু দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেড়াইয়া চাকরকে বলিতেছেন ওরে-ওরে শীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুই চার পয়সায় একখানা চল্তি পানসি ভাড়া কর তো। —প্যারীচাঁদ মিত্র

(৪) ছুটির দরবার। আগেকার কালে বেলায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল বাহিরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে গল্পটা ছিল বড় ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক করত দুরু দুরু। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসতুম। সেটা চলতে শুরু করত বিনা চলায়, চড়ে ঠিকানায়, গল্পের তালে তালে মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। —রবীন্দ্রনাথ

(৫) সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টাপ-টোপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? [illegible] দোষ চিহ্ন ঘাড়ে ফেলে সাহেবের পা চেটে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চোটটা বেশি বই কম পড়বে না। —স্বামী বিবেকানন্দ।

## বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান ও বাংলার শিক্ষক

বাংলাকে যখন আমরা মাতৃভাষা বলে গণ্য করতে চাই, তখন তার সঙ্গে সম্ভবতঃ ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা ও সহজ আয়ত্তীকরণের কথাটা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া আমাদের ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু, বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যকে স্মরণ করলে পূর্বোক্ত বিষয়ের উপর আর ততখানি জোর দেওয়ায় ভরসা পাইনা। বাইরের সাধারণ সমাজজীবনের বাংলা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বাংলার মধ্যে পার্থক্য সুপ্রচুর। প্রত্যেক উন্নত ভাষার মত বাংলারও একটা আদর্শ রূপ আছে এবং একই সঙ্গে কথ্য বাংলার অসীম গুরুত্বের কথা অবশ্যই বিবেচ্য। শিক্ষকের সমস্যা হল এই দুটির মধ্যে কেমন করে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভাষায় সদাচলমানতার সমস্যা—কাল যত এগিয়ে চলে ভাষায় ততই নানাবিধ পরিবর্তন এবং সুরটি ধ্বনিত হয়। ভাষার বহিরঙ্গ ও তার ব্যবহার অর্থাৎ উচ্চারণের সমস্যা যদি এখানেই থেমে যেত তবে এত জটিলতার উদ্ভব হ'ত না। বরং যেটি আমাদের সর্বাধিক ভাবিয়ে তোলে, তা হ'ল বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক রূপের (Dialect) ব্যবহারিক পার্থক্যের সমস্যা। বলা বাহুল্য, বাংলার মত অপর উন্নত বা অনুন্নত ভাষাতেও একই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই, ভাষাবিদগণ ব্যাকরণের অর্থতত্ত্ব (Semantics), পদবিন্যাস প্রকরণ (Syntax) প্রভৃতির মত আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখার অবতারণা করে এই সমস্যার বিষয়টি আলোচনা করেছেন—একেই বলা হয়েছে **ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics)**।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক যে অঞ্চলের অধিবাসী হ'ন না কেন এবং তাকে দেশের যে কোন অঞ্চলের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করতে হ'ক না কেন, তাঁকে

বাংলা ভাষার ব্যাকরণের এই শাখাটির সম্যক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতেই হবে এবং নিজের উচ্চারণকেও আঞ্চলিক প্রভাবের ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে। এটা হবে তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠি। বিদ্যালয়ে যে শুধু আঞ্চলিক শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে তাই নয়—বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে নানা শ্রেণীর শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে আসতে পারে। আঞ্চলিক প্রভাব তাদের কথ্য ভাষায় থাকা খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষক যদি নিজেকে উচ্চারণ-আদর্শের প্রতিনিধি করে না তুলতে পারেন তবে আন্তরিক ও কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পাঠনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাহলে যোগ্যতার প্রশ্নটি এইভাবে বিবেচনা করতে হবে যে বাংলার শিক্ষক ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বের উত্তম জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং সর্বোপরি তাঁকে উচ্চারণের অভ্যাসভিত্তিক প্রস্তুতির সাহায্যে একটি আদর্শ মানে উন্নীত হতে হবে।

প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব উচ্চারণ রীতি আছে। অপর বৈশিষ্ট্যের মত এটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চারণের বিশিষ্টতার মাঝেই ভাষার নিজস্ব মাধুর্যের রূপটি পরিস্ফুট হয়, আর যা'র প্রতি আমাদের মমত্ববোধ অসাধারণ। প্রসঙ্গক্রমে সৈয়দ মুজতবা আলির রচনা থেকে একটু খানি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

"এক বাঙাল এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানিকে বললে—'দাও ত একসের বাইগণ। দোকানি পশ্চিম বাঙলার লোক। বেগুনের উচ্চারণ বাইগণ শুনে একটু খানি গর্বের ঈষৎ মৌরী হাসি হেসে শুধালো—'কি বললে হে জিনিসটার নাম?' বাঙাল গেছে চটে। উচ্চারণ নিয়ে যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা মস্করা করার মানে?—চতুর্দিকে আবার বিস্তর ঘটি দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল—'বাইগণ কইছি ত বেশ কইছি, হইছে কি?"

দোকানি আর একদফা হাম্বাড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, 'ছ্যাঃ বাইগণ, বাইগণ। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।'

বাঙাল বলল—'মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে 'প্রাণনাথ' ডাকলেই পারো। দাও তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ পয়সা, না সাত পয়সা?'

বোঝাই যাচ্ছে, ভাষা ব্যবহারে উচ্চারণ বিকৃতি মানুষের যে শুধু স্বভাবসিদ্ধ, তাই নয়—তার প্রতি একটা গভীর মমত্ববোধও তার আছে এবং কোন কারণে সেটি ক্ষুণ্ণ হলে ক্ষুব্ধ হতেও তার বেশী সময় লাগে না। সীমিত গণ্ডীতে শিক্ষকের ভূমিকা অনেকখানি ভাষা সংস্কারকের বলে সতর্কতার সঙ্গে যাতে ছাত্রের মনে আঘাত সৃষ্টি না হয় সেইভাবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যটি পালন করতে হবে।

ভাষায় বিকৃতি সাধারণ ঘটনা হলেও তার কারণগুলো বাংলা ভাষার শিক্ষককে ভালভাবে জানতে হবে এবং তার দ্বারাই এই সব ত্রুটির দূরীকরণ সম্ভব। দেশের যারা সাধারণ মানুষ, তারা বিনা আয়াসে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেই মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করে। বলা বাহুল্য, তাদের ভাষাশিক্ষার কাজটি স্বতঃসিদ্ধ বলে কোন বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রত্যাশা এ ব্যাপারে করা যায় না। তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্য বজায় রাখার একটা প্রবণতাও সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। অপরপক্ষে

শিক্ষিত-সমাজ সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলেই ভাষার আদর্শমানটি লেখা, পড়া ও বলার মধ্যে বজায় রাখতে সদাই সচেষ্ট। এই প্রচেষ্টার মূলে থাকে সভ্যসমাজের প্রভাবগত প্রতিক্রিয়া এবং ভাষা-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বস্তুতঃ ভাষার উচ্চারণের মূল বৈশিষ্ট্য কি? **কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতির সাহচর্যে ও সহায়তায় যখন মনোমধ্যস্থ উদ্গত ভাবটি মুখগহ্বর থেকে বায়ু অবলম্বনে ধ্বনির আকারে প্রকাশিত হয় এবং সেটিকে অর্থপূর্ণ বলে আমরা বুঝতে পারি তখনই সেটি শব্দ ( word ) হয়ে ওঠে।** শব্দের থেকে সৃষ্ট হয় যে বর্ণ তার নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান আছে এবং তদনুযায়ী তার শ্রেণীবিভাগও রয়েছে। ছাত্রসমাজকে প্রকৃত উচ্চারণরীতি শিক্ষা দেওয়াই হবে ভাষা শিক্ষকের কাজ।

বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের সূত্রগুলিকে যেমন আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা দরকার, তেমনি এই জ্ঞানের অভাবহেতু এবং অপর যে সব কারণে ধ্বনিবিকৃতি ঘটে সেই সব বাস্তব কারণগুলি সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে এবং ভাষার যথার্থ উচ্চারণের জন্য অনুকূল ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীকেও গড়ে তুলতে হবে। ধ্বনিবিকৃতির সম্ভাব্য কারণগুলি সংক্ষেপে সূত্রাকারে উপস্থাপিত হ'ল।

(১) সাধারণ মানুষের ভাষাগত আত্মপ্রকাশ এক অনায়াস-অর্জিত নৈপুণ্য। অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রও অমার্জিত হওয়ার ত্রুটিপূর্ণ বিশেষত্বই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমা হয়।

(২) জনসাধারণের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবহেতু কোন বৈজ্ঞানিক চেতনার উদ্ভব হয় না এবং যে কোন শ্রেণীর উচ্চারণই অসমালোচিত থেকে যায়—কখনও বা সেটি অবাঞ্ছিত আনুকূল্য লাভ করে। তার ফলে ত্রুটি নিরসনের কোন মনোভাব দেখা দেয় না।

(৩) বাংলা ভাষা মাতৃভাষা—অতএব তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যের সঙ্গেই তা শিখলে চলবে—এমন একটা মনোভাব সর্বসাধারণের মধ্যে সক্রিয়। অথচ, উপযুক্ত শ্রদ্ধা ব্যতীত ভাষায় আদর্শ রূপ অধিগত করা কঠিন। সব সময় মনে রাখতে হবে ধ্বনিই ভাষার প্রাণস্বরূপ।

(৪) কোন বিশেষ স্থানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য মানুষের উচ্চারণ যোগ্যতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটিকে একটি বড় কারণ হিসেবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সব ভাষার উচ্চারণ আয়ত্তযোগ্য নয়। ইউরোপের মানুষেরা শুদ্ধরূপে সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী উচ্চারণে অক্ষম। বিশেষ অভ্যাসের অভাবে আরবী ভাষায় উচ্চারণও সুকঠিন।

(৫) স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবেও ভাষায় উচ্চারণের মধ্যে বিকৃতি ঘটে। এটিও সমালোচনার অতীত নয়। কলকাতা অঞ্চলের সৃষ্ট 'স' উচ্চারণ ভাষা শিক্ষকের কাছে সুবিদিত। আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈচিত্র্যের অনুধাবন ও তার চর্চা বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন। 'উচ্চারণ বিপর্যয়' অনেকটা আঞ্চলিক প্রভাবের ফল।

(৬) সব ভাষার মধ্যেই নিজস্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেটি রীতি হিসাবে অনুসৃত হয়। আবার দীর্ঘকাল অবলম্বিত বৈশিষ্ট্যের উপর যুগপ্রভাব এবং অপর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে পারে এবং পরিবর্তনের সূচনাও দেখা যায়। এইসব প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পড়লে এবং স্বীকৃতির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তার নতুন ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন হওয়া সমীচীন। অপর ভাষার মত বাংলা ভাষার শব্দের মধ্যেও বানানের ও উচ্চারণের সমতা সবসময় বজায় থাকে না। 'অ' এবং 'এ' ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ রীতির বিষয়টি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এখানে ট্রাডিশান বা ঐতিহ্যকেই বেশী মূল্য দিতে হবে। বানান ও উচ্চারণে সমতা বিধানের প্রবণতা যখন খুব বেশী উগ্র হয়ে ওঠে, তখনই বর্তমান যুগের আমেরিকান ইংরেজীর মত ভাষার মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। বলা বাহুল্য, আলোচ্য সূত্রকে অবলম্বন করেই উক্ত ইংরেজীর ব্যাকরণ ও অভিধানের ধারা ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

(৭) ভাষার অন্তর্গত বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণে অধিকাংশ সময়েই ভিন্ন রীতি পালিত হয়। এই পার্থক্যের কথাটাও মনে রাখতে হবে। ভাষার উচ্চারণে বাক্য মধ্যস্থ অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন কোন শব্দের বিশেষভাবে উচ্চারিত হবার প্রবণতা অনেক ভাষায় মধ্যেই লক্ষ্যণীয় ধর্ম। ভাষা যেখানে আবেগের বাহক, সেখানে এটি আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে চলা হয়। গদ্য ও কবিতার ভাষা ও উচ্চারণ যে পৃথক—সেটিও অনেকে মনে না রাখার ফলে অযথার্থ উচ্চারণ ঘটে।

(৮) ভাষা অনেকের কাছেই একটা ভাবাবেগপ্রধান হৃদয়গত সত্যের বিষয়। এরকম অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের ফলেও অঞ্চল অনুসারে আদর্শ ভাষারূপের মধ্যে নানা প্রয়োগগত ত্রুটি আমাদের কানে ধরা পড়ে। ভাষা শিক্ষককে এই কঠিন সত্যটিকেও মনে রাখতে হবে।

ভাষা-শিক্ষকের কাজ হচ্ছে, একই ভাষায় নানা রূপ ও ধ্বনি বৈচিত্রের সত্তাকে মেনে নিয়েও তার একটা সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ রূপ ছাত্রসমাজের সামনে উপস্থাপিত করা। এই লক্ষ্যে পৌছতে হ'লে তাঁকে দ্বিমুখীযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধানের তাত্ত্বিক জ্ঞানও তাঁর কাছে অপরিহার্য ও সেই সঙ্গে তার ব্যবহারিক শুদ্ধরূপ কোনটি তা তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে এবং নিয়মিত সুপ্রচুর অনুশীলনের সাহায্যে শুদ্ধতম ধ্বনিরূপটি আয়ত্ত করতে হবে। কথন ও পঠনের মধ্যে শিক্ষকের নিজের ত্রুটি থাকলে এবং আঞ্চলিকতার সীমারেখার উর্ধে উঠতে না পারলে তাঁর পক্ষে ভাষার নিরপেক্ষ আদর্শ রূপের প্রতিফলন কখনও সম্ভব হবে না। একজন পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষকের নিজস্ব উচ্চারণ বৈচিত্র যেটি তিনি তাঁর দৈনন্দিন কথাবার্তায় মধ্যে স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে ব্যবহার করেন—তা তাঁর অন্তরের সত্য হলেও শ্রেণীকক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠনাকালে সযত্নে বর্জনীয়। ব্যক্তিগত ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হবার সাধনার দ্বারা বৈজ্ঞানিক মনোভাব অর্জন করতে হবে বলেই এটি তাঁর কাছে একটি কঠিন পরীক্ষার মত।

আদর্শ উচ্চারণের এই সাধনায় তাঁর চাই একটি সংস্কারমুক্ত মন এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেই তাঁকে নিয়মিত চর্চায় এই মনোবল অর্জন করতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণে এবং সৌকর্য সাধনে শিক্ষকের মত মাতাপিতার ভূমিকাও স্বল্প নয়। শিশুর নিজস্ব পরিবেশে সু-উচ্চারণের সংস্কৃতির আবহাওয়া থাকলে স্বাভাবিকভাবেই অভ্যাস গড়ে উঠে। শিক্ষকের মনে রাখতে হবে উচ্চারণে পরিবেশের প্রভাবই সবচেয়ে বড়। তাই শিশুকে তার প্রভাবমুক্ত করতে হলে বিদ্যালয়কেই আদর্শ পরিবেশে রূপান্তরিত করতে হবে এবং শিক্ষককে শিশুর দোষমুক্ত উচ্চারণের অভ্যাস গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে হবে। সহজ কথায় বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক শ্রেণীগুলিতে ভাষার অর্থচর্চার উপর গুরুত্ব আরোপের সঙ্গে ধ্বনিগত বিশিষ্টতা অনুধাবনের উপরও যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা অবশ্য প্রয়োজন। ছড়া শিক্ষা, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি এবং গদ্য রচনা পাঠের বিশিষ্ট ভঙ্গীর চর্চার দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব। আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় সাধারণতঃ নীরব উপেক্ষা লাভ করে থাকে—সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক কথাবার্তায় আদর্শরূপের অনুসরণ। যাকে মার্জিত রুচির মানানুসারী কথোপকথন বলি—তা যথার্থ ই অনুসৃত হচ্ছে কিনা তার প্রভাব ছাত্রসমাজ স্বীকার করছে কিনা এসবই ভাষা শিক্ষককে ঠিকমত দেখতে হবে। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতারত শিক্ষককে এবিষয়ে আরও সতর্কতার সঙ্গে যত্নবান হতে হবে। কারণ, পরিবেশের প্রভাবেই সেখানকার উচ্চারণ গ্রাম্যতাদুষ্ট ও অমার্জিত। তাই সেটি জীবনধর্মী হলেও আদর্শ ভাষারূপের সার্বজনীনতার প্রয়োজনে সংশোধন যোগ্য।

আর একটি জটিল সমস্যার বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত থাকতে হবে। ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞানের অভাব, উচ্চারণ-বিচ্যুতি এবং মিথ্যা ভাবালুতা ভুল বানানের দিকে শেষ পর্যন্ত ছাত্রসমাজকে ঠেলে দেয়। উচ্চারণের ভুলের জন্যই 'র' ও 'ড়'-এর বিপর্যয়; শ 'স'-এর ভুল এবং সন্ধি-সমন্বিত শব্দের বানান ভুল করে থাকি। সন্ধির সূত্র আয়ত্ত করে বানান ভুল নিরসন অপেক্ষা তার উচ্চারণ প্রযুক্তির উপর অধিক গুরুত্ব দিলে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। শিক্ষককে সব ক্ষেত্রে হতে হবে উদার ও সহানুভূতিশীল। ভাষা জাতীয় সংস্কৃতি বলে কারও মনে কোন কঠিন সমালোচনার আঘাত না দিয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ সুপ্রয়োগের দ্বারা এবং গঠনমূলক সমালোচনার সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে।

ভাষা মানবচিন্তার লিপিচিত্র। আদিতে এই ভাষাই ছিল চিত্রলিপি, পরে বিবর্তনের পথে এটি রূপান্তরিত হয়ে বর্ণ বা অক্ষরের রূপলাভ করেছে। বাক্য হচ্ছে শব্দসমন্বিত এবং পূর্ণ মনোভাব প্রকাশক। ভাষার উচ্চারিত রূপ শব্দময় অর্থাৎ ধ্বনিসমন্বিত। পারস্পরিক ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনে ভাষার এই শব্দময়তা ব্যবহারিক গুণান্বিত এবং অর্থমণ্ডিত। আহ্বান ও কথোপকথনে ভাষার শব্দময় রূপ অপরিহার্য। আর পঠন ও তজ্জনিত উপলব্ধিতে **সরবতা ও নীরবতা** এই উভয় ভাবই অবলম্বন করা হয়।

ভাষা মানুষের নীরব চিন্তার প্রতিফলন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপরের কাছে মুখর হয়ে উঠবে বলেই যেন লিপির আকারে নীরবে অপেক্ষমান। স্তব্ধীভূত এই মানবচিন্তা ও অভিজ্ঞতা যখন গ্রন্থ মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করে তখন তার মধ্যে অভিব্যক্তির ইপ্সা ও সাগ্রহ প্রতীক্ষার বাণী অপঞ্চিত থাকে। পঠনের মধ্য দিয়েই তার সার্থকতা। এ ছাড়া আত্মবিকাশ ও ব্যক্তিতা সংগঠনে পঠনের মূল্য অপরিসীম। ব্যবহারের তাৎপর্যে ভাষা কথ্য ও লিখিত এই দুটি রূপ প্রাপ্ত। আবার লিখিত ভাষা রূপায়ণের বিভিন্নতায় গদ্য ও কবিতা—দু'ভাবে পরিবেশিত। বলা বাহুল্য, মানুষের প্রয়োজনের পার্থক্যই এই দুই রীতির মৌল ভিত্তি রচনা করেছে। প্রকাশ ও পরিবেশনা-রীতি যেমন বিভিন্ন, পাঠভঙ্গীও তেমনি উভয় ক্ষেত্রে পৃথক রীতির অনুযায়ী।

কোন্ বিশিষ্ট রীতিতে আমরা কোন লিখিত বিষয় পাঠ করব—তা নির্ভর করছে ভাষার লিখনভঙ্গী ও পাঠ প্রয়োজনের উপর। সাধারণত আমরা গদ্যের ভাষাকে কাজের ভাষা এবং কবিতার ভাষাকে ভাবের ভাষা বলে থাকি। কবিতার ভাষা ভাবগভীর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বলে তার রীতিপ্রকৃতি ভিন্ন এবং রসোপলব্ধি তার শেষ কথা বলে পঠন-ভঙ্গীও ভিন্ন। অপরপক্ষে গদ্য কাজের ভাষা এবং ব্যবহারিক বাস্তব জীবনের উদ্দেশ্যসাধক হওয়ায় প্রয়োজন বিশেষে সরব পাঠরীতি অনুসৃত হয়। তাছাড়া শিশু শিক্ষা, আবৃত্তি এবং অন্যবিধ পাঠে সরবতা অনিবার্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরব ও নীরব কোন বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করা হবে সেটি নির্ভর করছে রচনার বাহ্যিক ভঙ্গীর ও আভ্যন্তরীণ চরিত্রের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ, পঠন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করছে—সে বিষয়টিও এর নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করছে। স্বভাবতঃ আমরা যখন অপরের জন্য কোন লিখিত বিষয় পাঠ করি তখন ভাষার শব্দময়তা এবং অপরের শ্রবণসম্ভাবনা অবশ্যই বিবেচ্য। কিন্তু, নিজের জন্য অর্থাৎ সাহিত্য পাঠের আনন্দলাভই যখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তখন আমরা নীরবতা অবলম্বন করে কাব্য-রস-সাগরে নিমজ্জিত হই। কাব্য ব্যতীত সাহিত্যের অপর শাখার পঠনেও বিশেষত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নীরব পাঠই অবলম্বিত হয়। কারণ, অনুরূপ পাঠের মূল উদ্দেশ্য সাহিত্য-রসাস্বাদনা।

দুই জাতীয় পাঠের প্রয়োগগত দিকের বিস্তারিত আলোচনায় পূর্বে এর বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হতে পারে। শব্দের উচ্চারণই ভাষায় শব্দময়তা বা সরবতা। ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণমালা মধ্যস্থ বর্ণগুলির প্রত্যেকটির বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান আছে এবং সেই হিসাবে সেগুলি সুনির্দিষ্ট বিভাগের অন্তর্গত। তাছাড়া সর্বাঙ্গীনভাবে একটি নির্দিষ্ট ভাষার সবিশেষ উচ্চারণরীতি আদর্শ বলে গণ্য হয় এবং রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ এই সর্বজনগ্রাহ্য রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখতে তৎপর। শৈশব থেকেই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টার ফলেই এই আদর্শ উচ্চারণ আয়ত্ত করা সম্ভব। বাংলা ভাষা-শিক্ষকের একটি বড় কাজ হ'ল—ছাত্রসমাজের এই সু-অভ্যাসটি গঠনে উপযুক্তভাবে সাহায্য করা। শিক্ষার একটি লক্ষ্য যদি আত্মপ্রকাশ হয়, তবে তা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে যথোপযুক্তভাবে হ'তে পারে। রুচিসম্পন্ন কথোপকথন এবং যথাযোগ্য ভঙ্গীতে রচনা পাঠ এ সবই বিশেষ অনুশীলন সাপেক্ষ বিষয়। আর এই অনুশীলনের মূল কথা স্বরযন্ত্রের প্রয়োজনভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ।

সরব পাঠে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রস্তুতি ও যোগ্যতা অর্জন প্রয়োজন। ভাষায় অন্তর্ভুক্ত শব্দের অর্থদ্যোতকতা ও ধ্বনিমাধুর্য—এই দ্বিবিধ বিশিষ্টতা থাকে। সরব পাঠের সাহায্যে শব্দের এই দুই চারিত্রধর্মকে আমরা প্রাধান্য দিই। অপরের নিকট কোন কিছু পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য তার অর্থ উদ্ঘাটন ও মানুষের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন। আবার সাহিত্যগুণান্বিত রচনার সরব পাঠে অর্থ উপলব্ধির সঙ্গে ধ্বনির সঙ্গীতময়তার দিকেও আমাদের লক্ষ্য থাকে। কারণ, রসস্বাদনায় উভয়েরই সমান গুরুত্ব। আর এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সন্তোষজনক ভাবে সাধিত হওয়া তখনই সম্ভব—যখন আমরা বহু কষ্টার্জিত পাঠ নৈপুণ্যকে উপযুক্ত মাত্রায় কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হব। তাহলে দেখা যাচ্ছে—সরব পাঠের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে দৈহিক নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতির এবং পাঠ্য-বিষয় মধ্যস্থ ভাবের সঙ্গে অন্তরের যোগ-সাধন। বাক্যমধ্যস্থ বিশেষ অর্থের দিকে শ্রোতার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হ'লে পাঠকের ধ্বনিবিশেষের উপর প্রয়োজনানুরূপ শ্বাসাঘাত প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া উচ্চারণের স্পষ্টতাও পঠনের সবচেয়ে বড় গুন—যা যথার্থ অর্থ উপলব্ধির যথার্থ সহায়ক। জিহ্বায় জড়তা ও দৌর্বল্য আকাঙ্ক্ষিত পাঠ নিপুণতা লাভের পথে অন্তরায় স্বরূপ। শিক্ষককে এসব কথা মনে রেখেই যেমন নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, তেমনি ছাত্রগণের পাঠ যোগ্যতা অর্জনে যথার্থ সাহায্য করতে হবে।

### শিক্ষকের ভূমিকা :—

এবার কোন কোন পর্যায়ে **সরব পাঠের ব্যবহার** উপযুক্ত তার আলোচনা করা যেতে পারে। **প্রথমতঃ** শিশুশিক্ষার কথাই আমাদের মনে আসে। বয়স্ক ব্যক্তির অনুরূপ মানসিক যোগ্যতা শৈশবে অর্জন করা সম্ভব নয়। শিশু যখন কিছু চিন্তা করে, তখনও তাকে আপন মনে নির্জন ঘরে একা কথা বলতে শোনা যায়। অর্থাৎ শিশুর চিন্তা ধ্বনিময়। শিশুশিক্ষায় সরব পাঠের অনুসরণের এটি একটি বড়

কারণ। শিশু যতদিন না নীরব পাঠের জন্য মানসিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত তাকে সরব পাঠের পদ্ধতি অনুসরণে সাহায্য ও উৎসাহদান শ্রেয়। বর্ণ, শব্দ এবং বাক্যের যথাযথ উচ্চারণে দৈহিক যোগ্যতা প্রয়োজন এবং তার অর্জনও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। উপযুক্ত অভ্যাসের অভাবে অনেক সময় বয়স্কদের ক্ষেত্রেও জড়তা দেখা দেয়। এবং শিশুর পাঠ-জীবনে এটি স্বাভাবিক ঘটনা। শব্দের ও বাক্যের সুস্পষ্ট, পরিপূর্ণ ও অর্থব্যঞ্জক উচ্চারণ যতদিন না আয়ত্ত হয় ততদিন পর্যন্ত শিক্ষককে সরব পাঠের সাহায্য নিতেই হবে। কয়েকটি বিশেষ বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণে অসুবিধা দেখা দিলে কোন প্রতিকূল সমালোচনা না করে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট নিপুণতা অর্জনে ছাত্রকে সাহায্য করতে হবে। প্রতিক্রিয়া-যুক্ত ব্যবহারে ভাল কোন ফল ত পাওয়া যায়ই না, পরন্তু, তোতলামির মত অবাঞ্ছিত পরিণতি দেখা দেয়। অতএব, সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যোগ্যতার অভাবের সঙ্গে শিশুর বিশেষ প্রবণতার কথাও মনে রাখতে হবে। অধিকাংশ শিশুই একটু উচ্চরবে পড়তে ভালবাসে। কবিতা ও গদ্য কিংবা ছড়া—সব ব্যাপারেই একটা শব্দময় রূপায়ণের ঝোঁক শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়া বা স্বল্পদৈর্ঘ্যের কবিতা আবৃত্তি শিশুর কাছে একটি স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ ব্যাপার। সুন্দর উচ্চারণ—যা সরব পাঠের প্রধান সর্ত-তা অর্জনে আমরা এগুলির পরিকল্পিত ব্যবহারে সার্থক করতে পারি। ভবিষ্যত জীবনে যোগ্যতা অর্জনে প্রারম্ভিক অভ্যাস গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা-স্তরে সরব পাঠের পদ্ধতি বেশ কার্যকারিতার সঙ্গেই প্রয়োগ করতে হবে। এখানে একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। কবিতা ও গদ্যের পাঠভঙ্গী যে পৃথক এ বোধ শিশুর মধ্যে যত তাড়াতাড়ি জন্মায় ততই ভাল। তাকে কোন উপদেশ না দিয়ে সঠিক ভঙ্গীটি শিখিয়ে দিতে হবে। আবৃত্তি ও অভিনয়ের দিকে ছাত্রদের একটা বিশেষ ঝোঁক থাকে। সরব পাঠ ও আবৃত্তি শিক্ষাদানকালে তার স্বর, গ্রাম, যতি, ছন্দ, অর্থবোধ, প্রকাশভঙ্গি এবং ভাবব্যঞ্জনার দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী"—এই প্রাচীন উক্তিটির মধ্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও এর মূল্য আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিদ্যালয়ে গদ্য ও কবিতা উভয় পাঠনাতেই সরব পাঠের রীতি দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে। গদ্য পাঠনায় যখন এ রীতি প্রযুক্ত হয়, তখন একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই আমাদের লক্ষ্য থাকে। এর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর উত্তম উচ্চারণ আয়ত্তীকরণ, এবং স্বল্প অগ্রসর ছাত্রের কাছে বিশিষ্ট পাঠভঙ্গীকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা। **দ্বিতীয়তঃ**, সুষম পাঠের সাহায্যে বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি করা। **তৃতীয়তঃ**, শব্দ, অর্থ ও ভাব এই তিনটির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের সাহায্যে মানবিক অনুভবের সম্পূর্ণতার সীমা স্পর্শ করার চেষ্টা করা। গদ্যের পাঠন পদ্ধতিতে শিক্ষক কর্তৃক আদর্শ পাঠদানের নিয়মের অনুসরণেও বস্তুতঃ এই সব সত্য বর্তমান। ভাব ও অর্থ অনুযায়ী স্বরগ্রামের উত্থান

পতন, যতিচিহ্নের যথার্থ ব্যবহারের সার্থকতার দ্বারা ভাষার অর্থময়তাসাধন ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষকের আদর্শ পাঠের মধ্যে পরিস্ফুটিত হবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষকের পাঠের সময় ছাত্রগণ তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করবে বলেই শিক্ষকের সরব পাঠ যথা সম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে। উচ্চারণে স্পষ্টতাবিধান পাঠের সবচেয়ে বড় গুণ; কিন্তু শব্দবিশেষের উপর শ্বাসাঘাতের ফলে তার অর্থবৈচিত্র্য স্ফুটনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি বিশিষ্ট পাঠভঙ্গীর প্রয়োগের দ্বারাই যে তার স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখা যায়—এ সত্যও কোনক্রমে বিস্মৃত হলে চলবে না। কবিতার মত গদ্যেরও সুনির্দিষ্ট পাঠরীতি রয়েছে। পাঠটীকা রচনার সময় বা শিক্ষকের অলিখিত প্রস্তুতির সময় কবিতার পংক্তির পর্ব-বিভাগের অনুরূপ বিভাগও করে নিতে হবে এবং সেই অনুসারে পড়তে হবে। লেখার অন্তস্থ ভাবপ্রকাশ ও অর্থ-উন্মোচন পাঠের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়ায় তার উপর ভিত্তি করেই পাঠভঙ্গী নির্দিষ্ট হবে। পাঠের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে রচনার মূল ভাব।

শ্রেণীকক্ষে সরব পাঠরীতি প্রবর্তনে কয়েকটি বিষয়ে কিছু সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সরব পাঠের সীমারেখা সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হবে। **প্রথমতঃ**, শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে যে সরব পাঠ যুক্তিযুক্ত নয় তা মেনে নেওয়াই ভাল এবং সেই অনুসারে সরব পাঠের সীমারেখাকে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। উচ্চ এবং উচ্চতর শ্রেণীপাঠনায় নীরব পাঠই অধিক মাত্রায় শ্রেয়। অতএব নীরব পাঠকেও উন্নত মানের পাঠ পদ্ধতি বলে গণ্য করতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ**, সমগ্র শ্রেণীতে যৌথ সরব পাঠের কাজ চলতে থাকলে বিদ্যালয় পরিবেশের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। **তৃতীয়তঃ**, উচ্চতর শ্রেণীতে এক সময়ে একটি মাত্র ছাত্রকে সরব পাঠের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। **চতুর্থতঃ**, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী যথা চতুর্থ শ্রেণী থেকে সরব পাঠের সঙ্গে মর্মোপলব্ধির জন্য নীরব পাঠের রীতির প্রবর্তনও একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ সরব পাঠে শিশুদের অভ্যস্ত ক'রে নীরব পাঠের দিকে তাদের পরিচালিত করতে হবে। **পঞ্চমতঃ**, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্র উপযুক্ত বয়স লাভ করলেও শব্দময় পাঠের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি এ বিষয়েও শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে। **ষষ্ঠতঃ**, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্য পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনা প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপলক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগত পাঠের সময় নীরব পাঠরীতির প্রয়োগই শ্রেয়। কারণ, পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সরব পাঠে সময়, শক্তি ইত্যাদি নীরব পাঠের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে ব্যয়িত হয়।

কিন্তু, এত সব নিয়ম কানুন গদ্য রচনা পাঠের সময় মেনে চললেও কবিতা পাঠের সময় সরব পাঠই যুক্তিযুক্ত। এমন কি, ব্যক্তিগত কাব্য পাঠেও ধীর ও ছন্দশব্দিত উচ্চারণ কবিতার ধ্বনি সৌন্দর্য প্রকাশে এবং অর্থব্যঞ্জনা উপভোগে অধিক পরিমাণ সাহায্য করে। কবিতার আঙ্গিক-সৌন্দর্য ও আন্তর-সৌন্দর্য এই দুইএর সমন্বয় সাধনের সাহায্যেই কবিতার রসাস্বাদন সম্ভব। রসিক পাঠককে সে কথা মনে রেখেই কবিতা পাঠের রীতি স্থির করতে হবে। মানুষের কানের কাছে কবিতার একটা বড়

আবেদন রয়েছে। যদিও কবিতা ক্রমশঃ আলঙ্কারিক ছন্দোরীতি থেকে বেশ দূরে সরে গিয়ে অধিক পরিমাণে অর্থপ্রতীতি-ভিত্তিক শব্দময়তাকে অবলম্বন করছে এবং জটিল চিন্তাময়তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে—তবুও কবিতার সঙ্গীত ধর্মিতার মৌল বৈশিষ্ট্যটির মূল্য তাতে কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে না। কারণ, কবিতার ধ্বনিময় সৌন্দর্যের আবেদন মানুষের কাছে কখনও নিঃশেষিত হবার নয়। কবিতায় ভাবের সঙ্গে ধ্বনি কেমন সার্থকভাবে সম্মিলিত হতে পারে তা নানা প্রসঙ্গে আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন একাধিক কাব্য সমালোচক। কেবল মাত্র ছন্দ বা অর্থ বা অলঙ্কার কবিতার প্রাণ নয়—এ সব কিছুর সার্থক সমন্বয়ের' ফলে উদ্ভূত যে ব্যঞ্জনা তাকেই আমরা রসানন্দ বলে থাকি এবং এই ব্যঞ্জনাই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। আর এই শেষ ফলশ্রুতির অন্যতম প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গৃহীত হয় বলেই শব্দমাধুর্য কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ বলে বিবেচিত এবং কে না জানেন যে, সুকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি বা পাঠ শোনার অভিজ্ঞতা একটি দুর্লভ সৌভাগ্যকে সূচিত করে? "ঝর্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা"—সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতায় ঝর্ণার যে গতিপ্রবাহ ছন্দকে আশ্রয় করে সুন্দর হয়ে উঠেছে, তা সরব পাঠ ছাড়া তার সঙ্গীতমুখরতা আমরা কি ভাবে উপভোগ করব?

ব্যক্তিগত সাহিত্য পাঠের আনন্দলাভে সরব অপেক্ষা নীরব পাঠই অধিক কাম্য—যদিও কাব্য পাঠের বিশিষ্ট রীতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তির কাছে এটিই সর্বাধিক অনুসৃত পদ্ধতি ও রীতি। স্বল্প সময়ে অধিক পাঠ, জটিল চিন্তামূলক রচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ, মনন প্রধান কবিতার রসোপলব্ধি প্রভৃতির লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য নীরব পাঠের স্মরণ নিতে হবে। বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে যেখানে মানসিকতা অধিকতর পরিণত—সেখানে এই জাতীয় সুঅভ্যাস গঠন যথার্থই কাম্য। সরবও নয়, নীরবও নয়, স্বল্প ধ্বনি সহকারে ব্যক্তিগত পাঠের প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথাও মনে না রাখলেই নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার প্রত্যেকটি শব্দ ( word ) প্রতীকধর্মী। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে তাই ভাষায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার প্রতীক-দ্যোতকতা। অর্থহীন বর্ণের অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের নামই শব্দগঠন। সমভাষাভাষীর মধ্যে শব্দের অর্থময়তায় একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ আছে—অর্থাৎ ব্যবহারিক তাৎপর্যে প্রতি শব্দ সকলের কাছে সম-অর্থ বহনকারী। শব্দের অর্থ ব্যবহারে যেমন একটি শৃঙ্খলার তত্ত্ব মেনে চলা হয়—বাক্যমধ্যে তার সন্নিবেশেও সেরূপ একটি সর্বজনবোধ্য পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। এভাবেই ব্যাকরণের নিয়ম ও সূত্র গঠিত হয় এবং তা গৃহীত ও পালিত হয়। গদ্যের ভাষার মধ্যে এই সজ্জা-শৃঙ্খলার তত্ত্বটিই প্রধান।

গদ্যকে বলা হয় জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের ভাষা। কি অর্থে? গদ্য মানুষের নিয়ন্ত্রিত চিন্তা প্রবাহের পারম্পর্যকে অনুসরণ করে। জ্ঞানও হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা যা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ বর্জনের ভিতর দিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। কর্মও মানুষের নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াশীলতা, ইচ্ছা ও প্রয়োজনের বাস্তব রূপ নেয়। তাহলে গদ্যকে যখন চিন্তা ও জ্ঞানের ভাষা বলা হয়, তখন সম্ভবতঃ তার অভ্যন্তরস্থ শৃঙ্খলার সূত্রটির উপর অধিক জোর দেওয়া হয়। গদ্যের ভাষা তাই মানুষের চিন্তার উপযুক্ত প্রতিফলন এবং সর্বদাই সুগ্রন্থনার ধর্মকে মেনে চলে। শব্দকে যখন মানবিক চিন্তার ধারা এবং ব্যাকরণ তথা ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী সার্বজনীনগ্রাহ্য রূপে সন্নিবিষ্ট করে পরিবেশন করা হয়—তখনই সেটি গদ্য হয়ে ওঠে। কোন পাশ্চাত্য সমালোচক গদ্যের এই আভ্যন্তরীণ সত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন—'words in the best order'। এখানে order বলতে অর্থ ও চিন্তা-শৃঙ্খলার কথাই বলা হচ্ছে। গদ্য পাঠনার সময় শিক্ষককে সর্বদাই এই বিশিষ্টতার কথা বেশী করে মনে রাখতে হবে এবং সেই অনুসারে পদ্ধতির মান নির্ণয় করতে হবে।

গদ্যের আলোচনাকে ঠিক এই স্থানেই থামিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, গদ্যের রূপ মোটামুটি সহজ, সরল ও অনায়াস-বোধগম্য হলেও কখনও বা রচনাকার বিশেষে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে। তখন তার সঙ্গে কাব্যের আঙ্গিকগত কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া সুকঠিন। আধুনিক কবিতার ভাষা গদ্য বলেই তার তার এক নাম 'গদ্যকবিতা'—বাংলাতে যার প্রথম স্রষ্টা হলেন রবীন্দ্রনাথ। 'লিপিকা' গদ্যে রচিত হলেও কবিতা হিসাবেই তাকে গ্রহণ করা হয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থটির নাম অন্য সত্যের দিকে ইঙ্গিত করলেও এর অধিকাংশ লেখাই হৃদয়প্রধান ও সুললিত। চিন্তার ক্রম থাকলেও ভাবময়তার ও প্রকাশ সৌকর্যে অন্যগুলি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে, অক্ষম কবির অনেক প্রয়াসই গদ্য অপেক্ষা অনেক বেশী যান্ত্রিক ও নীরস বলে মনে হয়। কবিতার মত গদ্যেরও ছন্দধর্মিতা আছে এবং পাঠের গুণে তা স্পষ্ট ও মনোহারী হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অনেক রচনাই এই অর্থে কাব্যধর্মী। ভাষা প্রকাশের একটা চরম সীমারেখা আছে যেখানে গদ্য ও কবিতার ভেদ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে ভাষা সমধর্মী হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ সে কারণেই প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যের এই ব্যাপকতাকে বোঝাতে গিয়ে সমগ্র সাহিত্য ধারাকেই 'কাব্য' নামে চিহ্নিত করেছেন। তাই প্রাচীন সংস্কৃত গদ্য রচনায় অলঙ্কার বাহুল্য এবং ধ্বনি ঝংকার ছিল। যাই হোক, গদ্যের এই সূক্ষ্ম ভাব ও তত্ত্বটি সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য নয় বলেই গদ্য ও কবিতায় পৃথক ভাষাভঙ্গীর ধর্মকে মেনে চলাই সমীচীন। পৃথক রীতির এই অনুসরণ আমরা বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সাহিত্যরস পিপাসার তৃপ্তিসাধন গদ্য বা কবিতার শেষ লক্ষ্য হলেও এদের পৃথক উপাদানগত বৈচিত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

গদ্যের গঠনপ্রকৃতি সর্বত্র একরকম নয়। কারণ, গদ্যের অবলম্বনও বিভিন্ন। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, রচনা, প্রস্তাব, রম্যরচনা, নাটক, সমালোচনা প্রভৃতি ভিন্নপ্রকৃতির হলেও একটি সূত্রে এদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি ভিন্নধর্মী রচনার বাহন একটই—গদ্য। গদ্য এদের সাধারণ দেহ নির্মাণ করলেও ভাব ও বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা হেতু প্রকাশধর্মের মধ্যেও এদের পার্থক্য সূচিত হয়। শিক্ষককে এই পার্থক্যের কথা মনে রেখেই শিক্ষা-পদ্ধতির গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় নির্দিষ্ট বাংলা পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্টত দুটি শ্রেণীবিভাগ থাকে। একটি ধারা গদ্যরচনা আশ্রিত এবং অপরটি কবিতা সংকলন। গদ্যের আবার দুটি ধারা—একটি প্রবন্ধ, গল্প বা অন্যবিধ রচনার সংকলন এবং অপরটি দ্রুতপঠনের উপযোগী কোন গল্প বা কাহিনী পুস্তক। আবার শিশুপাঠ্য পুস্তকে থাকে বিচ্ছিন্ন বাক্যের সমাবেশ অথবা অর্থপূর্ণ একটি বিষয় অবলম্বনে স্বল্প দৈর্ঘ্যের রচনা। উচ্চতর পর্যায়ে গদ্য পাঠনার আলোচনার পূর্বেই আমরা নিম্নতর শ্রেণীতে কিভাবে বিষয়টি পরিবেশন করতে হবে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

শিশুদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকে, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই বিষয়বস্তুগুলিকে বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়ে থাকে। এই স্তরে উপযুক্তভাবে মাতৃভাষা চর্চার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় উদ্দেশ্য হ'ল শিশুকে বিশুদ্ধ ভঙ্গীতে অর্থাৎ ভাষার নিয়মানুসারে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করা। শিক্ষককে তাই দেখতে হবে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাবলী শিশুর জীবনসম্পৃক্ত কিনা এবং সেগুলির পূর্ণব্যবহারে শিশুরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণভাবে মনোভাব প্রকাশে গদ্য-পাঠগুলি কার্যকরীভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা। তৃতীয়ত, শিক্ষকের দেখা প্রয়োজন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু নতুন নতুন শব্দের উপর অধিকার বিস্তার করে তার কথা ও রচনার মধ্যে সেগুলির প্রয়োগ করতে পারছে কিনা। শিশু-পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত বাংলা গদ্যের আলোচনায় প্রধানতঃ এই সব দিকের উপরেই শিক্ষকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। গদ্যের গঠন-সৌন্দর্য ও কার্যকরী দিকই এখানে প্রধানভাবে আলোচ্য। নতুন নতুন শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠনের ভিতর দিয়ে তার প্রকাশ ভঙ্গীর যোগ্যতাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে হবে।

সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, মনোভাব প্রকাশে শিশু-শিক্ষার্থী গঠিত বাক্যাবলী একই সময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত, সৌন্দর্য সমন্বিত ও ভাষা বিজ্ঞানের দিক থেকে বিশুদ্ধ হয়ে উঠছে কিনা। এই স্তরে ব্যাকরণের সূত্রের আনুষ্ঠানিক আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকতে হবে। পরোক্ষভাবে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে তার দৃষ্টি ভাষার সঠিক রূপটির উপর রাখতে হবে এবং তা বুঝিয়ে দিতে হবে। তখন এটাই কাম্য যে, শিক্ষক নতুন বাক্যগঠনে শিশুর ক্রমবিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতাকেই প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করবেন। ক্ষুদ্রায়তন সরল বাক্য থেকে শুরু করে শেষের দিকে জটিল ও যৌগিক বাক্যগঠনরীতির দিকে অগ্রসর হতে হবে। প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যাতে চিন্তার শৃঙ্খলাটি ঠিকমত বজায় থাকে তার দিকেই অধিক দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ গদ্যের এটাই বড় গুণ। সুন্দর শব্দ ব্যবহারে কোথায় ও কিভাবে ভাষার মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে পরোক্ষভাবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট ভাষার বিশিষ্ট বাগ্‌ধারার সাহায্যেই তার নিজস্ব ধর্মটিকে বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিছুদিন চর্চার পর ভাষার উপর শিক্ষার্থীর কিছুটা দখল হলে অনুরূপ ভঙ্গীতে ভাষা ব্যবহারে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। পরিচিত শব্দের সাহায্যে বাক্যগঠন, স্বল্প দৈর্ঘের রচনার মধ্যে অভিজ্ঞতার পরিবেশন, গল্প বলা, বিবরণী প্রস্তুত প্রভৃতি প্রাথমিক ভাষাশিক্ষার কার্যকরী উপাদান।

বিদ্যালয়ে উচ্চ ও উচ্চতর পর্যায়ে **বাংলা গদ্যের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যগুলি** সংক্ষেপে সূত্রাকারে বিবৃত করা হল :—

(১) বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট ভঙ্গী ও রীতির সঙ্গে এবং তার বহুমুখিতা বিষয়ে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন।

(২) শব্দবৈচিত্র্য ও শব্দ সন্নিবেশকৌশল এবং অলঙ্কার বিচারের মধ্য দিয়ে ব্যাকরণের প্রযুক্তির বিষয় ব্যবহারিক ভঙ্গীতে আয়ত্ত করা। লক্ষ্যণীয় বাগ্‌ বৈশিষ্ট্যের ধারার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন।

(৩) ব্যাকরণের প্রয়োগভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে ভাষার শৃঙ্খলার তত্ত্বটি অধিগত করা এবং নিয়ম পালনের সত্যকে স্বাভাবিক মনোগত সত্যে পরিণত করা।

(৪) ভাষা যে একই সময়ে চিন্তা ও ভাবের বাহন—এই সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

(৫) গদ্যের সাহিত্য সৌন্দর্যের মর্মোদ্ঘাটন এবং কিভাবে তা গ্রহণ করতে হয় তার কৌশলটির উপস্থাপন ও প্রয়োগ।

(৬) বাংলা সাহিত্যের উন্নতমানের লেখকগণের রচনার বিশেষত্ব অনুধাবন এবং বিশিষ্ট লেখকের বিশেষ রচনার দিকে মন ও ঔৎসুক্যের পরিচালন।

(৭) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি।

(৮) ব্যক্তিগত সাহিত্য-প্রীতির উন্মেষ সাধন এবং স্বনির্ভর হয়ে পরিণত বয়সে শিক্ষার্থী যাতে বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদনে উন্মুখ হয়—সে বিষয়ে মানসিক জাগরণ। স্বল্প সময়ে যাতে অধিক বিষয় আয়ত্ত করা যায়—সে বিষয়ে যোগ্যতামুখী প্রস্তুতি।

(৯) সর্বোপরি মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার পথ ধরে বিশ্বসাহিত্যের রাজদরবারে উপনীত হবার যোগ্যতা অর্জন।

গদ্য পাঠনের এইসব লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যই বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট বাংলা পাঠ্য পুস্তকে বিবিধধর্মী রচনাবলী সংকলিত হয়। ছোটগল্প, উপন্যাসের অংশ, ভ্রমণ কাহিনীর অংশ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তামূলক প্রবন্ধ, হালকা রম্যরচনা, নীতি-বিষয়ক গল্প বা রচনা প্রভৃতি সাধারণত পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। বিখ্যাত লেখকের রচনা সংকলনের সময় প্রধানত: তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় রচনার বা রচনাংশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলা গদ্যের পাঠদান পদ্ধতির আলোচনার সমগ্র বিষয়টিকে আমরা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করতে পারি—

**(১) ভাষা—গঠন, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দিক—**

**(২) সাহিত্য—রসসৌন্দর্য উদঘাটনের দিক—**

প্রথমত:, আমরা ভাষাব বিষয়টিই আলোচনা করব। ভাষা সাহিত্যের আশ্রয় বা আধার বলেই—তার যান্ত্রিকতার দিকটি পূর্বে আয়ত্ত করে আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কাছে স্বাভাবিক করে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর মনকে বিষয়জ্ঞান আয়ত্ত করা ও সাহিত্যরসের আস্বাদনের অভিমুখী করে তুলতে হবে। গদ্যপাঠের রীতি এমন হবে—যার সাহায্যে শিক্ষার্থী ভাষার আঙ্গিকগত বিশুদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়। পাঠের পর কথ্যভঙ্গী বা লেখার মধ্যে যখন সে মূল বিষয়টি পুনরায় পরিবেশন করবে তখন সে যেন ব্যাকরণের সূত্রগুলি মনে না রেখেও শুদ্ধ ভাষারূপ প্রয়োগ করতে পারে। পাঠের উপস্থাপনা স্তরে সমগ্র পাঠকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি বিভাগেব উপব প্রশ্নাবলী ব্যবহারের যে রীতি আছে—তা প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে—একটি হ'ল বিষয়চর্চা ও উপলব্ধি এবং অপরটি হ'ল, উত্তরদান প্রসঙ্গে ভাষার কাব্যরূপটির উপর অধিকার স্থাপন। আলোচনার সময় প্রশ্নেব উত্তর দিতে গিয়ে ছাত্রগণ নিজের শব্দভাণ্ডাব থেকে নতুন শব্দ ব্যবহার ক'রে শুদ্ধরূপে উত্তর দিচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। পাঠ্যগ্রন্থ মধ্যস্থ ছোটগল্প, উপন্যাসের অংশ বা ভ্রমণ কাহিনীর রচনাশৈলী প্রাঞ্জল হওয়ায় তা মর্মোপলব্ধি করা বেশ সহজসাধ্য। কিন্তু, এসবের Reproduction বা পুনঃপ্রকাশ সেই পরিমাণে সহজ নয়। ছাত্রদের এই অসুবিধাকে দূর কবতে হলে শিক্ষকের সক্রিয় ও সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। ছাত্রদের কোন বিষয়ে লেখা ও বলা দুটোরই সমান গুরুত্ব আছে। সুষ্ঠু প্রকাশদক্ষতা অর্জন তাই গদ্যপাঠনার অপরিহার্য উদ্দেশ্য এবং যথোপযুক্ত ভাষা আয়ত্তীকরণের সাহায্যেই এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। ভাষাচর্চায় ব্যাকরণের আলোচনাও অপ্রতিরোধ্য। তবে গদ্যের বা কবিতার আলোচনায় কোন জটিল ব্যাকরণ সূত্রের দীর্ঘ আলোচনার অবতারণার পরিবর্তে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রয়োগমূলক আলোচনা করতে হবে এবং কোন গুণে ভাষা সাহিত্য-গুণান্বিত হয়েছে তার আলোচনা করাও প্রয়োজন। অর্থাৎ অলংকার পদবিন্যাস রীতি, পদ পরিবর্তনের নিয়ম ও ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা কখনও কখনও খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

এবার সাহিত্য প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। গদ্যসাহিত্য পাঠের শেষ লক্ষ্য হল—রস সঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে বিষয়ের অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্প সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং সর্বোপরি ছাত্রের মধ্যে এক সাহিত্য রুচির সৃষ্টি ও সাহিত্যবোধের উন্মেষ সাধন। এই লক্ষ্যসাধনে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অনুসরণ করা আবশ্যক—

(১) শিক্ষার্থীর মনকে পাঠাভিমুখী ( Motivation ) করার সময় সাহিত্যিকের একটি ছবি বা মূল উৎস গ্রন্থটির উপস্থাপনা প্রয়োজন। (২) মূল বিষয় আলোচনার সময় তাঁর অন্য সমধর্মী রচনা বা অপর কোন স্বদেশী বা বিদেশী লেখকের রচনার তুলনামূলক সংস্থাপন। (৩) নীরব পাঠের সাহায্যে লেখার রসাস্বাদন ও ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করা। (৪) শিক্ষককে আদর্শ পাঠের দ্বারা বিষয়টিকে মনোজ্ঞ করে তুলতে হবে এবং অভ্যন্তরস্থ ভাবকে পরিস্ফুট করতে হবে। (৫ সাহিত্যিকের রচনার বিশিষ্টতা নিরূপণ। (৬) প্রান্তিক আলোচনার সাহায্যে সম্পূর্ণতা বিধান ও কেন্দ্রীকরণ। (৭) পাঠদানকালে শিক্ষক মনোবিজ্ঞানসম্মত এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেই পাঠে আগ্রহী হবে এবং আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে গদ্যাংশের মর্ম ও রসগ্রহণে সমর্থ হবে।

৭

## দ্রুতপঠন-পুস্তক ঃ পাঠন পদ্ধতি

বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচী আছে। ভাষার জন্য ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের জন্য গদ্য ও কবিতার সংকলনগ্রন্থ নির্বাচিত হয়। এসব পুস্তক ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার উদ্দেশ্যে চয়িত হয়। কিন্তু, কেবলমাত্র এগুলির পঠন-পাঠনের সাহায্যেই সঠিক লক্ষ্যে পৌছান যায় না। পরীক্ষাকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এসবের দ্বারা সাধিত হতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, উত্তর জীবনে সাহিত্যপাঠ বা অন্যবিধ উদ্দেশ্যমূলক পাঠ যথা—সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র পাঠ প্রভৃতি এবং ব্যক্তি-রুচি অনুসারে নির্বাচিত সাহিত্যগ্রন্থ পাঠে অন্যবিধ ভঙ্গী ও রীতি অনুসৃত হয়। জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজন অবশ্যই দেখা দেয়। পাঠের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের একদিকে থাকে জ্ঞানানুশীলন, অপরদিকে থাকে সাহিত্যরস-আস্বাদন। বিদ্যালয়কেন্দ্রিক পাঠধারার চর্চায় মানুষের মনে কেবলমাত্র উত্তর জীবনপর্বের উন্মেষ স্তরটি গঠিত হয়। মানুষের অনন্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসপিপাসা নিবারণের জন্য তাই কর্মব্যস্ততার স্বল্প অবকাশের মধ্যে অধিক সংখ্যক গ্রন্থপাঠ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের দ্রুতপঠন পুস্তকের সাহায্যে আমরা তার একটা প্রস্তুতিপর্ব রচনা করতে পারি।

সুতীক্ষ্ণ ও বিস্তৃত বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখা গেছে বিদ্যালয়ের সাহিত্য সংকলনগুলি যথার্থ রসনিষ্পত্তির সাধনায় সফল হতে সাহায্য করতে পারে না। প্রসারিত কৌতূহল নিয়ে সাহিত্যজগতে বিচরণ করতে গেলে তাই চাই অন্যবিধ সাহিত্যগ্রন্থ এবং দ্রুত নীরব পঠনের দ্বারা আমরা ছাত্রসমাজকে সেই ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে চাই। যে পদ্ধতি অনুসরণে উত্তরজীবনে পাঠে আগ্রহ জন্মে, এখানে যেন তারই প্রস্তুতি চলতে থাকে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে কখনও এক বা একাধিক সাহিত্যপুস্তক দ্রুতপঠনের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য একখানি এবং সপ্তম ও পরবর্তী শ্রেণীর জন্য একাধিক সাহিত্য পুস্তক দ্রুতপঠনের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। অল্প সময় ব্যয়ে অনেকখানি লিখিত বিষয় পাঠ ও তার মর্মোপলব্ধি করা এবং সাহিত্যের বিস্তৃত দিগন্তের দিকে অগ্রসর হওয়াই দ্রুতপঠন গ্রন্থপাঠের প্রকৃত বা মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে থাকে বিবিধ রচনাভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় সাধনের মত গৌণ উদ্দেশ্য। মূল সাহিত্য সংকলন গ্রন্থ পাঠের সময় ছাত্রমনে যে সাহিত্য জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয় সাহিত্য ও সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে—এখানে যেন তারই পরিপূর্তি সাধিত হয়। তাই **দ্রুতপঠনের ব্যবস্থাকে সাহিত্য পাঠনার এক পরিপূরক পদ্ধতির অনুসরণ বলা যেতে পারে।**

নীরব পঠন একটি জটিল ও অনুশীলন সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। আকাঙ্খিত পাঠ দ্রুতি অর্জন দীর্ঘ সময়ের সাধনার ফল। ব্যক্তিবিশেষে এই কৃতকার্যতার পরিমাণ ও মান সমান নয়।

তবুও বয়স্ক-জীবনে এই পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যিক হওয়ায় সকলকেই অনুরূপ যোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট হতে হয়। সরব পাঠের যান্ত্রিকতা ও অপরের অসুবিধা সৃষ্টির বিষয় দক্ষ নীরব পাঠের দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ে দ্রুতপঠনের স্থান তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দ্রুতপঠন পুস্তকের বিশেষ চরিত্র ও শিক্ষার লক্ষ্যের কথা স্মরণ রাখলে এর পৃথক পাঠন পদ্ধতির কথাও ভাবতে হয়। সাধারণ ও প্রচলিত ক্ষেত্রে গদ্য শিক্ষাদানে মামুলী পদ্ধতি অনুসৃত হয়। কিন্তু দ্রুতপঠনের বিষয়টির গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে এই গতানুগতিক রীতির অনুসরণকে সমর্থন করা যায় না। এর উদ্দেশ্য ও যেমন ভিন্ন, তেমনি এর পাঠন পদ্ধতিও ভিন্ন হওয়া উচিত। দ্রুতপঠনের জন্য নির্দিষ্ট পুস্তকে কখনও কবিতা সংগ্রহ, গল্প সংগ্রহ, আবার কখনও বা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা দেখতে পাই। পুস্তকের পাঠ্যবস্তুর ধরণ অনুযায়ী পাঠ-পদ্ধতি বিভিন্ন হবে। কবিতা সংকলনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্তৃক একবার সরব পাঠ এবং পরে ছাত্রদের নীরব পাঠের রীতি যথার্থ ফলপ্রসূ। কবিতা পাঠনার সময় মূলভাবটি ছাত্রগণ অনুধাবন করতে পেরেছে কিনা প্রশ্নের সাহায্যে তা জেনে নিতে হবে। কঠিন শব্দাদির কোন বিস্তৃত আলোচনা না করে কেবলমাত্র সেই সব শব্দ ও শব্দগুচ্ছের আলোচনা অপরিহার্য যেগুলোর অর্থ না বুঝলে সমগ্রভাবে কবিতাটির মর্ম উপলব্ধিতে অসুবিধা দেখা দেবে। এমন কোনও শব্দ থাকা সম্ভব যার কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে। এসব শব্দের ব্যাখ্যা শিক্ষক প্রথম সরব পাঠের সময় করে দেবেন। পাঠশেষে মর্মগ্রহণের জন্য শিক্ষক এমন ধরণের প্রশ্ন করবেন, যেগুলোর উত্তরে খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা দরকার হবে না, কিন্তু মোটামুটি কবিতার ভাবমূর্তির পরিস্ফুটনে সাহায্য করবে। এসব ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমরা চাই দ্রুতপঠনের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়সাধন। ছোট প্রশ্নের দ্বারা এই উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধকতা সাধিত হয়।

দ্রুতপঠনে ছোটগল্প বা সংক্ষেপিত উপন্যাস থাকলে তার সমগ্রতার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ছোটগল্পের ভাবমূর্তি অনেকটা কবিতার মত এবং একটি অখণ্ড সত্যের উপর আলোকপাতই ছোটগল্পের মূলধর্ম। অবশ্য একালের ছোটগল্প এই লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে চিত্রধর্মিতা ও বিশ্লেষণ প্রাধান্যকেই অবলম্বন করেছে। বর্তমানে ছোট গল্প তাই কাহিনীপ্রধান নয়, চরিত্র প্রধানও নয়; একান্তভাবে ভাবপ্রধান। তথাপি, একটা না একটা বৈশিষ্ট্য ছোটগল্পে থাকবেই। এক্ষেত্রে স্বল্পসংখ্যক ইঙ্গিতময় প্রশ্নের সাহায্যে গল্পের মর্মরহস্য উদ্ঘাটন এবং গল্পকারের বিশেষ মানসিকতার উপর আলোকসম্পাতই যথার্থ কাম্য। রচনার কোন বিশিষ্ট ধারা গল্পকার অনুসরণ করেছেন এবং অন্য সমযুগীয় গল্পকারের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায় স্বল্প কথায় বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে সে বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। সমশ্রেণীর সাহিত্যে তার স্থান কোথায় সে নির্দেশও দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

সংক্ষেপিত উপন্যাসের মত বিস্তৃত আয়তন সমন্বিত রচনার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পঠিতব্য অংশটিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে ( Unit ) বিভক্ত করে নিলে পাঠ ও পাঠনার

পক্ষে সুবিধা হয়। কখনও বা পূর্বপ্রস্তুতি অনুসারে পঠিতব্য বিষয়ের মূল ভাবগুলি সূত্রাকারে বোর্ডে লিখে দেওয়া যায়। ছাত্রগণ এর সাহায্য নিয়ে নীরব পাঠে অগ্রসর হলে, ঠিক কিভাবে পড়তে হয় তা শিখতে পারবে। তবে এরূপ পূর্ব নির্দিষ্ট পথ ধরে চলার বিপদ আছে। এতে স্বাধীন-পাঠের আনন্দলাভ ও বিচারশক্তি প্রয়োগের সুযোগ বিনষ্ট হয়। তাই উচ্চতব শ্রেণীতে উক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়।

অনেক সময় খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনায় ব্যাখ্যাব উপযোগী অনেক সংখ্যক চমৎকার পংক্তি থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' বা 'পল্লী সমাজ', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতির নির্বাচিত অংশ দ্রুতপঠনের জন্য পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হলে দেখা যাবে এসবের অনেক অংশই সবিশেষ আলোচনার যোগ্য। প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর চিহ্নিত অংশ বা অংশগুলি ভাবসম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যার জন্য নির্দেশিত হতে পারে। গৃহকাজের বিষয় হিসাবেও এগুলো নির্বাচন করা যায়।

পরিশেষে একটি কথা মনে বাখা বিশেষ প্রয়োজন। দ্রুতপঠন ও তাব চর্চা সম্পর্কে প্রাচীনপন্থী শিক্ষক সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার মনোভাব নেই। বলা বাহুল্য, এই মানসিকতাব পরিবর্তন প্রয়োজন। উত্তরজীবনে দ্রুত ও নীরব পঠনেব গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়েব পাঠ্যক্রমে দ্রুতপঠনের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করতে হবে এবং শিক্ষা প্রাপ্ত আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষকের হাতে বিষয়টির অনুশীলনেব দায়িত্ব দিতে হবে। এর অন্যথা হলে, বিষয়টিকে শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত করার সব তাৎপর্যই বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা।

বাংলা রচনা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলেই তার শিক্ষাদানের পদ্ধতির আলোচনা একটি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু, কোন বিষয়ের প্রকৃতি ও অবয়বের সুস্পষ্ট ধারণা ব্যতীত তার আলোচনা ও পদ্ধতির বিচার সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই এ বিষয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

'রচনা' কথাটি যে আমরা খুবই সাধারণভাবে ও হালকা ভাবে ব্যবহারে অভ্যস্ত। তার কারণ বোধ করি এই যে, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট রচনা নামধারী পাঠ্য-পুস্তকগুলির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির একটা প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং সেই ধারণা থেকে আমরা জানি যে, রচনা প্রধানতঃ দু'রকমের—বস্তুমূলক ( objective ) এবং ভাবপ্রধান ( Subjective )। তারপর এদের উপবিভাগও রয়েছে। কিন্তু রচনার প্রকৃত সংজ্ঞাটি কি ?

ভাবাভঙ্গী হিসাবে গদ্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন না হওয়ায় রচনার বিকাশের ইতিহাসও খুব বেশী দিনের নয়। ধীরে ধীরে এর উন্নতিসাধন হয়েছে। তাই বেশ কিছু পূর্ববর্তীকালের সমালোচকেরা রচনা বলতে যা বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন—আমরা তার থেকে দূরে সরে এসে এক ব্যাপক ও ভিন্নধর্মী ধারণা গড়ে তুলেছি। রচনা হিসাবে যেগুলি সাহিত্য জগতে প্রচলিত ও পরিচিত—তাদের কতকগুলির উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে—এ বিষয়ে এত মতপার্থক্যের কারণ কি ? ইংরেজী সাহিত্যে *Bacon* ও *Locke* প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তাবিদ্ ও প্রবন্ধকার। বেকনের রচনাগুলিকে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী সংহত জ্ঞানভাণ্ডার বলে মনে হয়। লকের রচনাগুলিতে দার্শনিক তত্ত্ব ও মত বা সিদ্ধান্তের ঘন সন্নিবিষ্ট রূপ দেখতে পাই। স্পেন্সারের রচনাগুলি বৃহদায়তন এবং সেগুলির প্রত্যেকটিকেই একটা ছোটখাট বই হিসাবে দেখলে অন্যায় করা হয় না। বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত মনীষীগণের প্রবন্ধগুলি প্রধানত চিন্তামূলক ও সংহত—একটা সিদ্ধান্তের বলিষ্ঠতাও সেখানে লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনা, আর সেগুলির যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ—এই রচনাগুলির সাধারণ ধর্ম। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সাহিত্যগুণান্বিত রচনা আর একটু পরবর্তীকালের অর্থাৎ ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শনের' পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছিল। যথার্থ সাহিত্য গুণান্বিত, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত রচনার উন্মেষ ও উৎকর্ষ-সাধন হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে। পূর্ববর্তীকালে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং সামান্য পরবর্তীকালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, রাজনারায়ণ বসু এবং আরও পরে প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সমালোচক সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব ঘটে। রসাত্মক ও জ্ঞানগত এই দুই শ্রেণীর রচনার বিকাশ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি লক্ষ্য করি প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। উনবিংশ শতকীয় সমালোচনার ধরণ কেমন ছিল—তা দেখতে পাওয়া যাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সমালোচনা সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে এবং

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য' গ্রন্থে। রচনা যে কত ভিন্ন ধরণের হতে পারে তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'লোক-রহস্য' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'আধুনিক সাহিত্য' 'প্রাচীন সাহিত্য' 'সাহিত্যের পথে' 'ছিন্নপত্রাবলী' ও পররর্তীকালের চিঠিপত্র এবং 'শান্তিনিকেতন' ( দুই খণ্ড )। একই ব্যক্তির কলম থেকে বিষয়বস্তু ও মানসিকতার বিভিন্নতা অনুসারে কত বিশিষ্ট প্রকৃতির রচনা রূপলাভ করেছে। বোঝাই যায় - এই সব লেখকগণ কখনও বা কবি-দার্শনিক ও গদ্যে রসস্রষ্টা কখনও বা জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তৎপর। কখনও বা এদের মধ্যে লক্ষ্য করি ব্যক্তি-হৃদয়কেন্দ্রিক তন্ময়তা, আবার কখনও বা জিজ্ঞাসুমনের সত্যে উপনীত হবার বিতর্কবহুল প্রচেষ্টা। এ যুগের দিকপাল রচনাকাব শ্রীকুমার বন্দ্যোপধ্যোয় ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, প্রভৃতি কত রকমের রচনার মধ্যে তাঁদের রসসত্তা ও জ্ঞানী ব্যক্তি-সত্তার আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়েছেন। এঁদের লেখায় যেমন বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা আছে তেমন আছে রচনাভঙ্গীর পার্থক্য ও নিজস্বতা।

তাহলে আমবা রচনা বলতে কি বুঝব এবং কোন ধারণাই বা গড়ে তুলব ? রচনার সার্বজনীন সংজ্ঞাটাই বা কি হবে ? আজ থেকে বহু বছব আগে যখন রচনা সাহিত্য বিশেষ পবিণতি বা সমৃদ্ধিলাভ করে নি, তখন মহামনীষী জনসন রচনা সম্পর্কে বলেছিলেন—'An essay is a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly composition." স্পষ্টতঃ এ মন্তব্যেব মধ্যে একটা বিরূপতা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চাব যুগে অপরিণত গদ্য ভঙ্গীর সাহায্যে জ্ঞান চর্চার বিষয়টিকে জনসন সম্ভবতঃ হালকাভাবে দেখেছিলেন। প্রবন্ধের মধ্যে জ্ঞানের বিষয়টিকে তাই তিনি চর্বিত চর্বন বলে মনে কবেছেন—যার অন্তর্নিহিত সত্যের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ না করে বিষয়গত উপস্থাপনার প্রতি প্রবন্ধকাবের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। কিন্তু তবুও এই প্রাচীন সংজ্ঞাটিব মধ্যে একটি মৌলিক গভীর সত্য লুকিয়ে আছে, সেটি হচ্ছে loose sally of mind' যাকে আমবা পববর্তী অর্থাৎ আধুনিক যুগে 'ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত গদ্য' বলতে অভ্যস্ত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে রচনা-সাহিত্যেব এটাই সবচেয়ে বড় লক্ষণ। জ্ঞানের বিষয় কখনও তার সীমিত অবস্থানের গণ্ডী অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না এবং সাহিত্য-পদবাচ্য হবে না—যতক্ষণ না সেখানে ব্যক্তির হৃদয়স্পর্শে তার মধ্যে এক সাহিত্যিক উষ্ণতার সঞ্চার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান মন্তব্য মনে পড়ছে—জ্ঞানের বিষয় একবার জানলেই তা পুবাতন হয়ে যায়—অপরপক্ষে হৃদয়ের বিষয় কখনও অভিনবত্ব হারিয়ে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তাই জ্ঞানের বিষয় বচনার বিষয়ের সার্থক উপাদান হয়ে ওঠে না, যদি না সেখানে ব্যক্তি-বিচারশীলতা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের উদ্ভব ঘটিয়ে তার মধ্যে অভিনবত্বের সঞ্চার করে। জ্ঞাতব্য পৃথিবীটা আমাদের পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সামনে তার পরিপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে আছে, কিন্তু যতক্ষণ না সেটির উপর ব্যক্তি-দৃষ্টির বিশেষ আলো পড়ে তাকে দৃশ্যমান করে তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা

'সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী' হয়ে উঠছে না অর্থাৎ সাহিত্যে রূপান্তরিত হচ্ছে না। রচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে আমাদের এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। একজন রসিকের বিচারে বিষয়টি এরূপ :—

"সাধারণভাবে বলিতে গেলে জগতে এবং জীবনে এমন কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া রচনা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে না পারে; কিন্তু ভাল রচনা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষের জীবনের সঞ্চয়—যাহাকে আমরা বলি তাহার অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা। রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান সুখ-দুঃখ-আশা নিরাশায় ভরা জীবনের বহু বিচিত্র রহস্যময় স্মৃতি। জীবনের অভিজ্ঞতাকে আমরা রঙীন করিয়া চিত্রিত করি আমাদের কল্পনা দ্বারা—প্রজ্ঞার প্রাখর্য্যকে কমনীয় করিয়া লই হাসির স্নিগ্ধতা দ্বারা-সমালোচনাকে সরস করিয়া তুলি সহানুভূতিতে। এই অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সহিত কল্পনা, হাস্য এবং সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া আমাদের রচনা হইয়া ওঠে পরম আস্বাদ্য। কিন্তু এই সকল উপাদানের ভিতরে থাকা চাই একটা হৃদয়ের সারল্য—একটা আন্তরিকতা। রচনা যেখানে খাঁটি সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ বিষয়ের সহিত লেখকের একটা গভীর তন্ময়তা রহিয়াছে; লেখকের যে আত্মপ্রকাশ তাহা এই তন্ময়তার ভিতর দিয়া। লিরিক ধর্মাক্রান্ত বলিয়া রচনার আয়তন স্বভাবতই স্বল্পপরিসর হয়। রচনা সাহিত্যের মধ্যে তাই পরিধির একটা পরিমিতি রহিয়াছে। রচনা সাহিত্যের কাজ নিকটতম বন্ধুর মত হৃদয়ের কোমল গভীর নিভৃত কোণটিকে পাঠকের নিকট একান্ত অসংকোচে উন্মুক্ত করিয়া ধরা।"

এতক্ষণের আলোচনার একটা সহজবোধ্য সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করা যেতে পারে।

(১) যে কোন বিষয় নিয়েই রচনা লেখা যেতে পারে। এর সার্থকতা নির্ভর করবে লেখকের রূপায়ণ দক্ষতার উপর।

(২) ভাবের বিষয় এবং জ্ঞানের বিষয়—উভয়ই লেখার উপকরণ—যদিও সমধর্মী নয়, তবুও এই দুই জাতীয় বিষয় অবলম্বনেই অসংখ্য সাহিত্য, রচনা ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

(৩) বস্তুকে ব্যক্তি-হৃদয় অনুভব সাপেক্ষ করে তোলাই প্রধান শিল্পদক্ষতা। একাজে যিনি ব্যর্থ হন তাঁর লেখা কেবলমাত্র বস্তু বা ঘটনার উপস্থাপনা মাত্র হয়।

(৪) রচনাশৈলীর মধ্যে যে ধর্মটি প্রকাশিত হয়—তা মূলতঃ লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টির শিল্পাত্মক প্রতিফলন। শৈলীর অভিনবত্ব বিষয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে রসিকজনের হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

(৫) লেখকের বিষয়গত ধারণা সুস্পষ্ট হ'লে রচনাটি স্বল্প পরিসরের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভাবরূপ লাভ করে। ভাবপ্রকাশে সংহতি ও শৃঙ্খলা তাই ভাল রচনার লক্ষ্যণীয় গুণ। রচনাকে যেখানে জনসন 'loose sally of mind' বলেছেন—সেখানে বুঝতে হবে তিনি শিল্পীমনের এক জাতীয় হাল্কা ক্রীড়াশীলতার দিকেই ইঙ্গিত

করেছেন। লঘু মেঘখণ্ডের সঞ্চয়মানতার অনুরূপ মানসিক গতিশীলতাও রচনা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' আমরা এই লক্ষণটির প্রকাশ দেখতে পাই।

(৬) জ্ঞানের বস্তুকেও রসধর্মী করে প্রকাশ করাও একটি বিশেষ নৈপুণ্য সাপেক্ষ। আধুনিক বাংলা রচনা সাহিত্যে এই কাজটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও 'পরশুরাম'। এদের রচনার বিষয়বস্তুর কোন নির্দিষ্ট পরিসীমা নেই এবং এক অননুকরণীয় ভঙ্গীতে কত না বিষয়কে এক অচিন্তনীয় রসময়তার স্বরূপে প্রকাশ করেছেন। সকৌতুক সহৃদয়তা ও সর্বগ্রাসী সংস্কৃতিচেতনা এদের রচনাগুলিকে উদার মাধুর্য নিষিক্ত করেছে।

(৭) সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও সংবেদনশীল চিত্তের উপস্থিতি রচনাকে এক কালোত্তীর্ণ মহিমা দান করে। হৃদয়ের স্নিগ্ধ প্রলেপ যেখানে পড়ে না সেখানে বস্তু বস্তুই থেকে যায়।

রচনার এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রধানতঃ সৃষ্টিধর্মী, রসসাহিত্য রূপেই আমরা একে চিহ্নিত করেছি। বিদ্যালয় ও কলেজ নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে রচনা বলতে আর এক শ্রেণীর লেখাকে বোঝান হয়েছে— যেগুলি ধর্মের দিক থেকে বস্তুমুখী ও চিন্তামূলক। এগুলিকে 'রচনা' না বলে 'প্রবন্ধ' বলাই সঙ্গত। কারণ রচনা কথাটির মধ্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি বা সৃজনশীল মনোময়তার চরিত্র-চিহ্ন ব্যঞ্জনালাভ করেছে। রচনার মধ্যে যেন এক সরসতার আভাস আছে। অপরপক্ষে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ কথা দুটি সমার্থক এবং এদের বুৎপত্তি ও আভিধানিক অর্থ বিচার করলে রচনার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্যটি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুক্তিসমন্বিত কোন বিষয়কেন্দ্রিক সংযত ও সিদ্ধান্তপ্রধান রচনাই 'প্রবন্ধ বা নিবন্ধ' নামের উপযুক্ত। এখানে বস্তু, জ্ঞান, তত্ত্ব, চিন্তা, মতপ্রতিষ্ঠাই প্রাধান্যলাভ করে। অতএব নিবন্ধের মধ্যে আমরা সাধারণতঃ সহৃদয়তার ও সরসতার সন্ধান করি না—করলেও সে প্রত্যাশা কদাচিৎ পূর্ণ হয়—যেমন 'কমলাকান্তের দপ্তর' জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক তত্ত্বগ্রন্থ হয়েও এক অদ্বিতীয় সরস রচনা। যেকোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই এমন একটা রচনা সুদুর্লভ।

প্রবন্ধ ও রচনার এই স্পষ্ট বিভাগটি মেনে নিয়েই আমরা বিদ্যালয়ে এদের আনুষ্ঠানিক চর্চার পদ্ধতির বিষয়টি আলোচনা করব। প্রথমে রচনা পুস্তকে নানাজাতীয় প্রবন্ধের প্রভূত'সংখ্যক উপস্থিতি চোখে পড়ে। প্রবন্ধগুলিকে আবার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুসারে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতি বিষয়ক এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক। এদের সবগুলিই তথ্য কিংবা তত্ত্বমূলক। একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই এই সব যুক্তিবহুল রচনার লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ 'যুদ্ধ ও শান্তি' 'বিজ্ঞান-আশীর্বাদ না অভিশাপ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠের সামান্যতম অভ্যাস থাকলেই উপরোক্ত রচনা দুটির সকল তথ্য ও বক্তব্য জানা যাবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে সেগুলির কিছু না কিছু সংগ্রহ করে রাখা খুবই স্বাভাবিক। এসব যদি নাও ঘটে, তবে ঐ বিষয়ে প্রকাশিত অসংখ্য

পুস্তকের মধ্যে দু-একখানা বিদ্যালয় পাঠাগারে পাওয়া যাবে বলেই আশা করা যায়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পূর্বেই ঘোষিত হলে, তথ্য সংগ্রহে কোন অসুবিধা দেখা দেওয়ার কথা নয়। শিক্ষক মহাশয় নিজেও কিছুটা প্রস্তুত থাকলে আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রবন্ধরচনার পূর্বেই ছাত্রদের কাছে সূত্রাকারে পরিবেশন করতে পারেন। বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে এটি খারাপ নয়। তবে, সূত্র পরিবেশন করতে গিয়ে প্রবন্ধটিকে একেবারে একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে দেওয়া যে অনেকখানি ক্ষতিকর সে বিষয়েও অবহিত ও সতর্ক থাকতে হবে। এর ফলে প্রবন্ধ রচনার স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তির বিচারশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়। একটি প্রবন্ধে মূল বক্তব্য কি হবে তা নির্ভর করবে রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। কিছুসংখ্যক তথ্য থাকে সত্যের মতই সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু, কিছু তথ্যকে আবার প্রবন্ধকারের বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় এবং সেটি নির্ভর করে প্রবন্ধকারের প্রতিপাদনযোগ্য বক্তব্যের উপর। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ রচনার সময় অনেক ক্ষেত্রে সমজাতীয় বা একই তথ্যের ভিত্তিতে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রবন্ধকারের স্বাধীনতা থাকলে তার বিশিষ্ট মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে।

তথ্যমূলক প্রবন্ধে তথ্যই প্রধান বলে তার ব্যবহারের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। বিশেষত ব্যক্তি-জীবনী লেখার সময় তথ্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে গেলে একাধিক উৎস-গ্রন্থ পাঠ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সবশেষে, অপর কিছু আনুষ্ঠানিক তথ্যের সাহায্যে কোন একটি তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে হয়। চিন্তামূলক প্রবন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে একটিমাত্র স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধকারকে যেন পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে—তাকে যে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন ক'রে একটি মাত্র স্থির মতবাদ আঁকড়ে ধরতে হবে। জীবনে যেমন অনিবার্যতা আছে, তেমনি তাকে অতিক্রম করার আন্তরিক প্রয়াসও আছে। হয়ত এইসব প্রবন্ধে একটা মানবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমরা আশা করে থাকি। তবে সিদ্ধান্ত যখন বস্তু ও ঘটনা-বিশ্লেষণ নির্ভর-তখন এই জাতীয় প্রবন্ধে প্রবন্ধকারকে কিছু তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োগ করতেই হবে এবং এসবের উপযুক্ত প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করেই রচিত হবে সিদ্ধান্তের সুদৃঢ় সৌধ।

প্রবন্ধ রচনায় অনুশীলনের চরিত্র বুঝতে পারলে এটি কেন পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বস্তুতঃ এর চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা চাই ছাত্রদের মানসিক শ্রীবৃদ্ধি, হৃদয়ের প্রসারতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ হোক। এর ফলে তারা যুক্তি ও বিচারশীলতা, সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতা অর্জন করবে এবং চিন্তা ভাবনাকে লিখিত রূপদানে দক্ষতালাভ এবং সর্বোপরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হবে। এইসব লক্ষ্যের কথা মনে রেখে প্রবন্ধের চারটি অপরিহার্য উপাদানের কথা এইভাবে বলা যায়—(১) প্রয়োজনীয় তথ্য-সমাহার (২) উজ্জ্বল যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা (৩) সরল এবং ঋজু প্রকাশময়তা—যার মধ্যে সংশয়ান্বিত দ্বৈধভাব নেই এবং (৪) উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ—যার প্রধান লক্ষ্য কল্যাণ চেতনা। ছাত্ররচিত প্রবন্ধের মধ্যে উক্ত

উপাদান-সমৃদ্ধি পেতে হলে প্রভূত পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সাধনে যেমন বৌদ্ধিক যোগ্যতা প্রয়োজন তেমনি বিষয়-সমৃদ্ধি ও সুষ্ঠু আলোচনায় প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যসংগ্রহ। শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা এবং তারপর তথ্য সংগ্রহে উৎসাহদান। ধরা যাক বিদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে 'বাংলা দেশের মুক্তিসংগ্রাম' এই প্রবন্ধটি লিখতে দেওয়া হয়েছে; এখানে ছাত্রদের খুব সতর্কতার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তা ব্যবহারে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে, তবেই রচনা সার্থক হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী তার ভাষা নিরূপিত হবে। ঠিক কোন জাতীয় শব্দ ব্যবহার করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে না—এমন শব্দাবলীর ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে, এমন শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে পরিহার করা কর্তব্য। রাজনৈতিক ও সাহিত্য-বিচার বিষয়ক প্রবন্ধে এ রীতি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা প্রয়োজন। প্রবন্ধ রচনার ভাষার আলোচনায় সাধু ও চলিতের প্রশ্নও স্বভাবতই উঠবে। সংক্ষেপে বলা যায় —ছাত্রগণ স্বাভাবিকভাবে যে জাতীয় ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত—তাই প্রবন্ধ রচনায় ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমান বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভাষা এক সমৃদ্ধ চলিত বাংলা। অসংখ্য নতুন শব্দের উদ্ভব ও সার্থকতার সঙ্গে তাদের ব্যবহারের ফলে এ কাজটি অনেক সহজ হয়ে এসেছে। তাই, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদারের অতি-ঐশ্বর্যশালী গদ্যের পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশীর গদ্যের মত সাদামাটা গদ্যও প্রচলিত আছে—যদিও নামে মাত্র তিনি সাধু-ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। আধুনিক চলিত বাংলা যা প্রায় সর্বত্র এবং সব উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে—সুপ্রচলনের ভিতর দিয়ে সে ভাষা এক বিশেষ শক্তিমত্তা লাভ করেছে। অতএব, এই ভাষা ব্যবহারে কোন বাধা নেই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রবন্ধের ভাষা আদ্যন্ত হয় সাধু অথবা চলিত ভাষা হওয়া চাই। দুইয়ের সংমিশ্রণে গুরুচণ্ডালী দোষে সমগ্র প্রবন্ধটি দুষ্ট হতে পারে।

অতঃপর রচনার বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। রচনার বৈশিষ্ট্য পূর্বেই নির্ণীত হয়েছে। এখন এর পদ্ধতির আলোচনায় আসা যাক। বলাবাহুল্য, রচনা ভাবাত্মক ও সৃষ্টধর্মী হওয়া খুব অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী নয়। কারণ, প্রকাশভঙ্গীর নিপুণতা এবং পরিণত মন—যা উন্নতমানের ভাবগ্রহণে সক্ষম—তা পাওয়া যাবে একটু পরিণত বয়সের ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই। তাই, নবম শ্রেণীর পূর্বে এই জাতীয় রচনা লিখনের জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না। এখন বিচার্য, ঠিক কোন ধরণের পদ্ধতি রচনার পক্ষে ফলপ্রসূ হতে পারে। রচনার ধর্মগত স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রাখলে, প্রথমেই যে কথাটা বিবেচ্য তা হচ্ছে এর বিষয় ও রূপায়ণে রচনাকারের কিঞ্চিৎ বেশী স্বাধীনতা প্রাপ্তি। শিক্ষক হিসাবে আমাদের সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে আমরা সুযোগ পেলেই ছাত্রদের উপর নিজেদের সবকিছু চাপিয়ে দিতে চাই—এটা অনেকাংশে আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। রচনার মূল্যায়ণে তাই শিক্ষককে

বেশ উদার মতাবলম্বী হতে হবে এবং ছাত্রদের স্বাধীনতা বিষয়ে সহিষ্ণু হতে হবে। উপযুক্ত স্বাধীন আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে কোন কিশোর বা কিশোরীর পক্ষে স্বাধীনভাবে একটি ভাল কবিতা, গল্প বা রচনা লিখে ফেলা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিশোর নজরুল ছাত্র অবস্থায় যে ভাবে রচনা ও মৌলিক কবিতা রচনা করতেন—তা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের কাছে ছিল বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের মনে হয়, মৌলিক ও স্বাধীনভাবে রচনা লিখনের সুযোগ দিয়ে আমরা সহজেই ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারি এবং তার ক্রমোন্নতির সহায়ক হতে পারি।

এজন্য রচনা লিখনে মূলতঃ দু'টি পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে—(১) স্বাধীনভাবে কোন কিছু লেখার নির্দেশ দান (২) নির্দেশিত বিষয়ের উপর কিছু লেখার সময় কোন রকমের রচনা সূত্র না দেওয়া। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীর রচিত রচনার মৌলিক গুণগুলির জন্য শিক্ষার্থীকে বিশেষ উৎসাহ দিতে হবে। রচনাটির প্রকৃত সৌন্দর্য অথবা বিশিষ্টতা কোথায়—তার কারণ নির্দেশ ক'রে অপর ছাত্রের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে হবে। উপযুক্ত সাহিত্যিক প্রতিভার আবিষ্কার করাও সাহিত্য শিক্ষকের একটি মহৎ কাজ।

## ॥ ব্যাখ্যা, ভাবসম্প্রসারণ ও ভাবসংক্ষেপ ॥

'রচনা' শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করলে ব্যাখ্যা, ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ, পত্রলিখন, সারাংশ লিখন প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বিদ্যালয় জীবনে এগুলির গুরুত্ব এবং প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় যে শুধু এগুলো প্রয়োজন তাই নয়—ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও এগুলোর মৌল ধর্ম একই ভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। স্পষ্টতঃ পাঠ্য বিষয়গুলির উপলব্ধি ও প্রকাশের মধ্যে সম্পূর্ণতা সাধনে এগুলি খুবই কার্যকরী। এগুলির সম্যক চর্চার দ্বারা সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ছাত্রসমাজের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। সাহিত্যের ভাষার মধ্যে একটা আপাত-দুরূহতা আছে কিন্তু সৌন্দর্যও লুকিয়ে থাকে তারই অভ্যন্তরে। অলংকারের চাতুর্যের মধ্যে, ভাবের গভীরতায় এবং মনের প্রসারতার চমৎকারিত্ব, সৃষ্টিধর্মের অনন্যতার দ্বারা এগুলি চিহ্নিত। একটি ব্যাখ্যা বা ভাবসম্প্রসারণ তাই সাহিত্যিকের সঙ্গে ছাত্রের ভাবসাযুজ্যের সুযোগ এনে দেয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে দেখতে হবে যে ছাত্রদের এসব রচনার অভ্যন্তরস্থ ভাবটি ঠিকমত প্রকাশিত হয়েছে কিনা—অন্য কোনরকম অর্থে পৌছালে লেখাটির আর কোন মূল্য থাকছে না (যদিও কবিতাংশের ব্যাখ্যায় এই মত ঠিক নয়)। তাছাড়া, ভাবের উপযোগী ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা দেখাও শিক্ষকের কর্তব্য। উপযুক্ত ভাষাই ভাবের সঠিক বাহন। সাহিত্যে এই মিলন সাধনই প্রধান বিষয়। এরই ফলে রসনিষ্পত্তি। তাই ব্যাখ্যা ইত্যাদির ভাষাও হবে মনোজ্ঞ, সাহিত্য-গুণান্বিত।

# ৯ | ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ ঃ শিক্ষাদান পদ্ধতি

**ব্যাকরণের সংজ্ঞা ঃ—**

ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ অনুযায়ী ব্যাকরণ আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ, ভাষা-শিক্ষার জন্য যে এটি অপরিহার্য যে বিষয়ে সকলে না হলেও অধিকাংশই একমত। একথা সত্য যে ব্যাকরণ সৃষ্টির বহু পূর্ব হতেই ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। বহুব্যবহারে এবং যথেষ্ট ব্যবহারে তার মধ্যে আবিলতা দেখা দিলে ভাষার স্বাস্থ্য রক্ষায় জন্য এমন কিছু সংখ্যক নিয়ম কানুন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়— যা সবাই মেনে চলবেন। সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার এই নিয়মগুচ্ছকেই ব্যাকরণ বলা যেতে পারে। ব্যাকরণের আবশ্যকতা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করার জন্য এবং ক্রমবর্ধমান বৈচিত্রের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দানও ব্যাকরণের আর একটি কাজ। ভাষার প্রবহমানতার খাতিরেই ব্যাকরণের প্রাচীন ও বহুকাল অনুসৃত নিয়ম কিছু পরিমাণে শিথিল করতে হয়। একে সামঞ্জস্যবিধান বলা যেতে পারে। সবশ্রেণীর ভাষা ব্যবহারে ব্যাকরণের সূত্রানুসারে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করাটা যে অভিপ্রেত-সে সত্য মনে রেখেই ব্যাকরণের সংজ্ঞা আমরা এইভাবে দিতে পারি —"যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষায় পঠনে, লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায় সেই বিদ্যাকেই সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।" লিখিত, কথিতভাষার বিভিন্ন রূপের ব্যবহার বাস্তব জীবনে ও সাহিত্য জগতে বর্তমান। একই দেশে একটি ভাষা নানা রূপে ও ভঙ্গীতে কথিত হয়ে থাকে। লিখিত রূপের মধ্যে ( কথাসাহিত্যে ) তার নজির থাকলেও, আদর্শ লিখনপদ্ধতিতে এবং শিক্ষিত রুচিবান ব্যক্তির কথোপকথনে ভাষায় একটা নির্দিষ্ট আদর্শ রূপই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তথাপি অঞ্চলবিশেষে ভাষায় রূপে পরিবর্তন ও বিকৃতি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

**কেন ব্যাকরণ পড়ানো হবে ঃ—**

ব্যাকরণের সংজ্ঞার মধ্যেই ব্যাকরণ পাঠের মৌল উদ্দেশ্যটি বিধৃত আছে। আমরা এযুগের মানুষেরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে ধরে নিয়েছি যে, ভাষা থাকলেই তার নিয়মক সূত্র অর্থাৎ ব্যাকরণ থাকবে। আর জনগণের মধ্যে নিজেদের মত করে ভাষা ব্যবহারের প্রবণতাও তেমনি স্বাভাবিক। কিন্তু যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃত রক্ষার ভার তাঁরা বিষয়টিকে সাধারণের হাতে ছেড়ে না দিয়ে ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষায় জন্য যে নীতি নির্ধারণ করেন তাকেই আমরা ব্যাকরণ বলব। তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় জীবনগঠন-যার মধ্যে একটা সামগ্রীকতা থাকবে, তবে তার একটি অপরিহার্য উপাদান হবে ভাষাবিজ্ঞান। এই ভাষাবিজ্ঞান চর্চা একাধিক

ভাষাকে অবলম্বন করে চলতে পারে। নেহেরুর ত্রিভাষা সূত্রানুসারে একটি ভারতীয় ভাষা, মাতৃভাষা ও যেকোন একটি সমৃদ্ধ বিদেশী ভাষা—এই তিনটি ভাষার চর্চা বিদ্যালয় জীবনে কাম্য। মাতৃভাষার শিক্ষার বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেশী। মাতৃভাষা ও সাহিত্য যদি মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম বলে বিবেচিত হয় তবে তার বিশুদ্ধ প্রয়োগের কথাটা সব কিছুর আগে ভাবতে হবে। তাছাড়া অপর সকল শিক্ষণীয় বিষয় যদি মাতৃভাষাকেন্দ্রিক হয় তবে ত এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

ভাষার বিশুদ্ধির সঙ্গে আসে সৌন্দর্য্যময় আত্মপ্রকাশ। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এই সৌন্দর্যচেতনা এক শাশ্বত তৃষ্ণার আকারে বর্তমান। আর সেকারণেই ভাষা সাহিত্য হয়ে ওঠে আমাদের অজ্ঞাতেই। স্বভাব কবিত্বের সঙ্গে যদি প্রতিভা-নির্ভর সাহিত্যিক অনুশীলনটির কথা স্মরণ করি, তবে ব্যবহারিক ব্যাকরণের প্রসঙ্গটি এসেই পড়ে। সাহিত্যিকগণ সাহিত্যসৃষ্টির সময় ব্যাকরণখানি সামনে খুলে রাখেন না ঠিকই। কিন্তু বিশুদ্ধ ও সুললিত ভাষারূপ যে তাঁদের মনন ও বোধের অঙ্গীভূত এ কথা কে অস্বীকার করবেন? সাহিত্যিকের অনুভবকে, চিন্তা ও মননকে যা বহন ক'রে তা হচ্ছে ভাষার এক শৃঙ্খলিত রূপ যার মধ্যে শুদ্ধতা আছে, সৌন্দর্যও আছে। তাছাড়া ব্যাকরণের অন্তর্গত ছন্দ ও অলংকারের আলোচনা ভাষায় গোপন সৌন্দর্য ও ধ্বনি মাধুর্য্যকে যেন আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে, যা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে এক নব অনুভব-আলোকে উদ্ভাসিত করে। ভাষা দেহভিত্তিক ও সৌন্দর্য চেতনা-সম্পন্ন মানুষকে সাহিত্যপাঠে যেন নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্য-পাঠের সময় আমরা যেন আরও সচেতনভাবে সৌন্দর্য আবিষ্কারে যত্নবান হই।

ব্যাকরণ চর্চার দ্বারা মানসিক যুক্তিময়তা লাভ করা যায় এবং সেই শক্তি শিক্ষার অন্য বিভাগে সঞ্চারিত হয় বলে আগে বিশ্বাস করা হ'ত। বিষয়টি 'শিক্ষার সঞ্চারণ' বা Transfer of Training নামে খ্যাত। বর্তমানে এই তত্ত্বটি পরিত্যক্ত। যাই হোক, ভাষার ব্যাকরণভিত্তিক চর্চার মধ্যে যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের একটা অনুকূল ক্ষেত্র রচিত হয়, সে সত্য অনস্বীকার্য। কারণ, ব্যাকরণ সৃষ্টির আদিতে একটা বৈজ্ঞানিক মন বিশেষভাবে কার্যকরী। ভাষার যে একটা শুদ্ধরূপে দিতে হবে যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই শুদ্ধ রূপটিকে সকলকে মানতে বাধ্য করতে হবে—এমন একটা প্রেরণা বর্তমান থাকার ফলেই ব্যাকরণের উৎপত্তি। অতএব, নানা প্রাকৃতিক ঘটনার বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা যেমন পদার্থবিদ্যা বা রসায়ণ শাস্ত্রের সূত্র গঠন করি—ব্যাকরণের সূত্র গঠন অনুরূপ প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। যদিও একথা স্বীকার্য যে, ভাষায় ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থাকেই। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাষাচর্চার একটা সুনিশ্চিত ফললাভ এই হয় যে, বিনা বিচারে বা বিশ্লেষণে কোন একটা সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা দূর হয়ে যায়।

ভাষা একটি জীবনধর্মী ও জীবনভিত্তিক প্রক্রিয়ার ফল। ভাষা তাই মানুষের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতীক। যুগে যুগে জীবন-ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও যে পরিবর্তনের সূচনা হয়-তা আমরা সবাই জানি। তাই ভাষাবিজ্ঞানের

চর্চা করতে হবে মানুষের বাস্তবজীবন অর্থাৎ তার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই। ভালভাবে খোঁজ নিলে দেখা যায় কোন উন্নত ভাষার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে এবং ধ্বনি ও রূপ-পরিবর্তনের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের অনেক সত্য লুকিয়ে আছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন—ভাষায় জীবনধর্মী বৈচিত্র ও অনন্ত রহস্যের আকর্ষণই তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানী করে তুলেছে। ব্যাকরণ তাই আমাদের জীবনের সঙ্গে ভাষার অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগের সত্যকে পুনবায় অনুভব করতে সাহায্য করে এবং মাতৃভাষা চর্চায় বিজ্ঞানী সুলভ অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' শীর্ষক রচনাংশে নূতন নূতন ভাষা-দিগন্ত উন্মোচনের কাজে ব্রতী হবার জন্য ভাষাতাত্ত্বিক সুলভ আহ্বান জানিয়েছেন। একালে লোকসাহিত্য সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের যে দেশব্যাপী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার একটা কার্যকরী পরোক্ষফল এই যে, এর ফলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের আয়তন আরও কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এটি সুখের বিষয়। কয়েক বছর আগে 'দেশ' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলাব আঞ্চলিক শব্দাবলী সংগ্রহের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। শব্দগুলি ছিল অভিধান বহির্ভূত। এই আবেদনে সাড়া জেগেছিল সুপ্রচুর। তাহলেও, মাঝপথে এই প্রচেষ্টার পবিসমাপ্তি ঘটে। দুঃখের বিষয় বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও, লোকপ্রচলিত শব্দের বা অশ্লীল শব্দের এখনও পর্য্যন্ত কোন অভিধান রচিত হয় নি। সম্প্রতি শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় দীর্ঘকালের সাধনার ফল স্বরূপ 'অপরাধ জগতের ভাষা' নামে যে নতুন শব্দকোষ প্রণয়ন কবেছেন—তা অভিধানের জগতকে যথার্থ ই সমৃদ্ধ করল। এরকম একটা প্রবণতার সৃষ্টি হওয়াই মঙ্গলজনক।

মাতৃভাষায় ব্যাকরণের চর্চার ভিতব দিয়ে যেমন মাতৃভাষায় যথার্থ রূপটি শিক্ষার্থীর কাছে পরিস্ফুট হয়—তেমনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পথটিও তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়। আধুনিক পূর্ব-ভারতীয় ভাষা হিসাবে বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধানের অনুশীলনে তাই স্বতঃই অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক কারণে অপর পূর্বভাবতীয় ভাষার শব্দসম্পদ, তাব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাকরণের অপর নিয়মের আলোচনা এসে যায়। জীবনের ব্যাপ্তির ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে একটা পরিচিতিও গড়ে ওঠে,। মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া, মালভূম ও সিংভূম এবং উত্তরবঙ্গের ভাষাভঙ্গী আলোচনায় সংশ্লিষ্ট অপর ভাষায় আলোচনার প্রসঙ্গও অপরিহার্য। তেমনি আবার Syntax-এর আলোচনায় ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়ম এবং Semantics ও Morphology-এর আলোচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া বাংলা ব্যাকরণও বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী। তাই অপর ভাষাভিজ্ঞতা ব্যাকরণ অনুশীলনের যথার্থ সহায়ক।

উন্নতমানের আত্মপ্রকাশকে শিক্ষার একটা লক্ষ্য বলে ধরলে ব্যাকরণের বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়। কারণ, ব্যাকরণই আমাদের শব্দের যথার্থ ও নিপুণ ব্যবহার শিখতে সাহায্য করে ও সে বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। এই জ্ঞানের

সঙ্গে সৌন্দর্য-দৃষ্টি ও সাহিত্যিক প্রতিভা ও রুচি সংযুক্ত হলেই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়। বাংলা বাগ্‌ধারার সম্যক জ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক ভাষা প্রয়োগকে আরও সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ এবং সরস করে তুলতে পারে। আরও অধিক আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমরা ব্যাকরণের জ্ঞানকে ভিত্তি করে মাতৃভাষাকে প্রয়োগ করতে পারি এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণও করতে পারি।

ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত 'ণত্ববিধি' 'ষত্ববিধি' 'সন্ধি' ও 'সমাসের' জ্ঞান আমাদের ভাষার অশুদ্ধি থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে, এবং ভাষাকে আরও শ্রুতিমধুর করে। অধিকন্তু, বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা কোন্ বিশিষ্ট গুণে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় তা আমরা এইসব জ্ঞানের সাহায্যেই যাচাই করে দেখতে পারি। আজকাল সাহিত্য সমালোচনায় কোন সাহিত্যিক বিশেষ ধরণের কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কতবার ও কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন—তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। এর সাহায্যে সৌন্দর্যের অনুধাবন অপেক্ষা সৌন্দর্যের ব্যবচ্ছেদই যে অধিক পরিমাণে সম্ভব-সেকথা সত্য হলেও এতে সমালোচক ও পাঠকের ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহলের নিবৃত্তি হতে পারে। বানানে সাম্প্রতিককালে যে সর্বাত্মক ব্যভিচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে—ব্যাকরণ পাঠ ও অনুসরণে চরম অনীহাই যে তার সবচেয়ে বড় কারণ-সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

## শিক্ষার কোন স্তর থেকে ব্যাকরণ প্রবর্তিত হবে ?:—

ব্যাকরণ শিক্ষার স্তরকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) ব্যাকরণের পরোক্ষ রূপায়ণ ও অনুসৃতি এবং (২) প্রত্যক্ষভাবে ব্যাকরণের নিয়ম অনুশীলন। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাকরণ পুস্তক ব্যবহার করব না অর্থাৎ সেখানে শিক্ষক মহাশয় পরোক্ষভাবে লিখন ও কথনের অশুদ্ধি দূর করবেন এবং প্রয়োগের সাহায্যে ভাষার শুদ্ধরূপটি শেখাবেন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাকরণ পুস্তকের ব্যবহার শুরু হবে। এর কারণ হ'ল এই যে প্রথমদিকে যখন শিক্ষার্থী সবেমাত্র আনন্দের সঙ্গে বাংলার লিখিত রূপের পরিচয় লাভ করছে তখন ব্যাকরণের মত দুরূহ বিষয়ের অবতারণা যুক্তিযুক্ত নয়। এই সময় শিশু মানসিকতার দিক থেকেও ব্যাকরণের নিয়ম আলোচনা করা বা প্রয়োগ করার পক্ষে অনুপযুক্ত। তার বিচার-বোধও তখনও জাগ্রত হয় নি এবং ভাষার স্বাভাবিক কথ্যরূপের সঙ্গে ব্যাকরণের যোগ কোথায়—তা সে বুঝে উঠতে পারে না। তবে এই স্তরে ভাষার শুদ্ধ রূপটি কি, তা ছোট ছোট বাক্য ও সহজ শব্দ গঠনের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে হবে।

পঞ্চম শ্রেণী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাকরণ আলোচনায় যুক্তি এই যে, তখন শিক্ষার্থী মানসিকতায় দিক থেকে অনেক অগ্রণী এবং কার্যকারণের তত্ত্বটি মোটামুটি বোঝে। মাতৃভাষা ব্যবহারে তখন সে মোটামুটি দক্ষ হয়ে উঠেছে। ইংরেজীর সঙ্গেও প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ। গল্প বলা, ছোট রচনা ও সাধারণ ব্যাখ্যা বা কবিতার ভাবার্থ প্রভৃতি লিখতে শেখার ফলে এবং সাধারণভাবে কথ্য ভাষার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশে নিপুণতা অর্জনের ফলে ভাষার নিয়মের সাধারণ দিকগুলি আলোচনার একটা

যোগ্যতা সে ততদিনে অর্জন করে বলেই মনে হয়। এর সঙ্গে একটা কার্যকরী শব্দভাণ্ডারও তার গড়ে ওঠে।

## কিভাবে ব্যাকরণ পড়ানো হবে :—

ব্যাকরণ শিক্ষকের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। তাঁকে কোন-ক্রমেই গোঁড়া বা প্রাচীন পন্থী হলে চলবে না। ব্যাকরণের অনেক কিছুই যে মুখস্থ রাখলে ভাল হয়—তা স্বীকার্য। তবুও সূত্র মুখস্থের উপর জোর না দিয়ে ছাত্রের বিশ্লেষণী শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে বেশী করে। শিক্ষককে যেমন মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, তেমনি সরস পাঠনভঙ্গীর সাহায্যে ব্যাকরণের নীরসতার অবসান ঘটাতে হবে, স্বাধীন বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং ছাত্র তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হচ্ছে কিনা, তা দেখতে হবে। এমনিতেই ব্যাকরণ পাঠের ও পাঠনায় নানা সমস্যা রয়েছে। তার ওপর নতুন সমস্যা সৃষ্টি অনুচিত। সাহিত্য গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনমত উদাহরণ সংগ্রহ করে ব্যাকরণের আলোচনায় প্রয়োগ করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরেই ভাষাজ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই স্তরেই অধিক সতর্কতার প্রয়োজন। ছোটদের উপযোগী বই এর সাহায্যে শিশুকে শব্দ ও বাক্য বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে। শিশু যে 'বাক্য' হিসাবেই সেগুলো শিখবে তা নয়। মনোভাব প্রকাশ কোন রীতিতে শিখছে ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহারের দ্বারা সেই ধারণাই সে লাভ করবে। 'আমি যাই' 'তুমি পড়' 'পাখী ওড়ে' প্রভৃতি দুই শব্দ বিশিষ্ট বাক্যের মধ্যে একটা ভাব ও প্রকাশগত সারল্য আছে। সমজাতীয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বিভিন্ন পুরুষে তার ব্যবহারে কিরূপ পার্থক্য হয়—তা বুঝতে ও প্রয়োগ করতেও সে পারবে। যথা—'আমি পড়ি' 'তুমি পড়' 'সে পড়ে।' পরস্পর সন্নিহিত দুটি বাক্যের দ্বারা সর্বনামের ধারণা সৃষ্টি করা যায়। সামান্য দীর্ঘায়িত বাক্যে বিশেষণের সার্থক ব্যবহার দেখান যায়। 'বিশেষ্য' বা 'বিশেষণ'—এই জাতীয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করেও খেলার ছলে সমজাতীয় শব্দের তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

প্রথম শিক্ষা-জীবন থেকেই শিক্ষার্থীকে শব্দের ধ্বনি-মিষ্টতার স্বাদটি উপভোগে সাহায্য করতে হবে। এই জ্ঞান তাকে কবিতার ছন্দ-মাধুর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করবে এবং পরবর্তী শিক্ষাস্তরের জন্য কবিতা-পাঠে উৎসাহী করে তুলবে। ছড়া শিশুশিক্ষায় ধারাল হাতিয়ার। প্রচুর সংখ্যক ছড়ার ব্যবহার করে যেমন ছন্দ-পরিচিতি ঘটান যায়, তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্যময় বাংলা শব্দও শেখান যায়। কবিতার যে একটা আলাদা ভাষা আছে এবং ব্যাকরণের নিয়ম যে সব জায়গায় খাটে না—এ বোধটাও ছড়ার সাহায্যে জন্মান দরকার। শব্দের রূপান্তর সাধন ও রূপান্তরিত শব্দের সাহায্যে বাক্যগঠনও ব্যাকরণের পাঠ—অথচ শব্দগঠনকে মজার খেলা হিসাবেই ছেলেরা একে গ্রহণ করবে।

ব্যাকরণের পাঠদানে 'আরোহী পদ্ধতি' (Inductive Method) তুলনামূলক ভাবে অধিক কার্য্যকরী। প্রাচীনকালে ব্যাকরণ শিক্ষা সূত্রকণ্ঠস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণ ছিল সূত্রের অনুসারী। বুঝতে পারার বিষয়টিও গৌণ ছিল বলেই মনে হয়। ব্যাকরণের জ্ঞানের প্রয়োগ ছিল যান্ত্রিক। একালে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসারের ফলে শিক্ষাধারার মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কোন পদ্ধতি যথাযথ হবে—তা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত ও গৃহীত হয়েছে। প্রথমে একাধিক উদাহরণ ব্যবহার ও সেগুলির প্রয়োজনানুরূপ বিশ্লেষণের সাহায্যে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে ছাত্ররাই। শিক্ষক মহাশয় কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন। এই পদ্ধতিতে ছাত্রগণ বিষয় বিশ্লেষণে স্বাধীনতার স্বাদ পায় এবং নিজেরাই অনেক সময় উদাহরণ সরবরাহ করে। এ যেন একটা অনুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়া। শিক্ষার পরবর্ত্তী স্তর অর্থাৎ কলেজ জীবনে এই পদ্ধতি উন্নতমানের বিচারশীলতার ভিত্তি রচনা করবে এবং এর দ্বারা যে ধারণা গড়ে ওঠে তা বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

এখন সাহিত্য ও ব্যাকরণের পারস্পরিক সম্পর্কটি নির্ণয় করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে ব্যাকরণের যথার্থ জ্ঞান সাহিত্য রসের উদ্বোধন ঘটায় এবং এ দুটি ঠিক পরস্পরবিরোধী নয়। সাহিত্য-আলোচনায় ব্যাকরণের সূত্রপাত করার বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁরা মত আনন্দবাদীর পক্ষে এটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে ব্যাপক অর্থে আমরা যাকে 'সাহিত্য' বলেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্য প্রধানত, কবিতার ক্ষেত্রেই করেছেন। কবিতা অতি সুকুমার বলেই নিতান্ত অনিবার্য না হলে ব্যাকরণের অবতারণা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। তবে কবিতার মধ্যেও এমন পংক্তি থাকে যেখানে শব্দ ও তার গঠন বা অর্থের আলোচনা অপ্রতিরোধ্য। গদ্যের পাঠনায় আমরা এ জাতীয় সংস্কার বর্জন করতে পারি এবং প্রয়োজন বিশেষে ব্যাকরণের আলোচনা পাঠ্যবিষয় অবলম্বনেই করতে পারি। এর একটা বড় গুণ এই যে, মূল বিষয় সুপরিচিত হওয়ায় ব্যাকরণের আলোচনা বেশ সরল, হৃদ্য ও স্মরণযোগ্য হয়ে ওঠে।

উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষককে দ্বিবিধ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণে তাঁর দখল ত থাকবেই; উপরন্তু তাঁকে ভাষায় চলমান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তাঁর বিশ্লেষণক্ষমতা হবে তর্কাতীত এবং উদাহরণ ব্যবহারে তাঁকে খুবই পারদর্শী হতে হবে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকলে তা বিশিষ্ট যোগ্যতা বলে গণ্য হবে। ভাষা জীবনকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং ভাষার প্রয়োজনেই ব্যাকরণের ব্যবহার করা আবশ্যক বলে একই ভাষায় বিবিধ কাল ও সংস্কৃতি-অবলম্বী রূপটি তাঁর জ্ঞানের সীমার মধ্যেই থাকা চাই।

"আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান—দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র-নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতাগুণেই জগদ্‌ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"

—রবীন্দ্রনাথ ( লোকসাহিত্য )

১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত লোকসাহিত্য নামক রচনার অংশ হিসাবে উপরের অংশটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল। শিশুজগত ও ছড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ছড়ার সাধারণ চরিত্র বিষয়ে সকল লক্ষ্যণীয় দিকগুলিই এই রচনাংশটির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। কবি মনের সুবিশাল কল্পনা বিলাস ও গভীর অনুভূতিপ্রধান হৃদয়ের উচ্ছ্বাস শিশুর মনোজীবনকে স্পর্শ করে যেন ছড়ার স্বপ্ন-জগতে উপস্থিত হয়েছে—যে জগৎ তাঁরই দৃষ্টিতে স্বর্ণসুষমাময়। রবীন্দ্রমনে যে লোক-জিজ্ঞাসা ছিল তারই ফলস্বরূপ আমরা তাঁকে লোকজীবন প্রচলিত ছড়ার এক সংগ্রহ গড়ে তুলতে তৎপর দেখি। এক অনন্ত প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা নিয়েই তিনি এই সংগ্রহকার্যে ব্রতী হন। কবি ত শুধু সঞ্চয়ী নন—তাঁর রূপমুগ্ধতা ছিল বলেই শাশ্বত কালের এই জাতীয় সম্পদের অনন্ত বৈচিত্র্য ও দ্যুতির একটা কাব্যধর্মী মূল্যায়নের এক সাধু প্রচেষ্টা তিনি করেছেন।

উদ্ধৃতাংশটি বিশ্লেষণ করলে আমরা ছড়ার প্রধান বিশেষত্বগুলি সহজেই অনুধাবন করতে পারি। ছড়ার আভ্যন্তরীণ ধর্মের মধ্যে যে একটা আপাতলঘুতার ভাব আছে তা রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়েছে। তাই তার সঙ্গে মেঘের তুলনা করেছেন—যার ভারহীন লঘু চলার ছন্দই আমাদের মনোহরণ করে। জড়জগতের স্থবিরতা ও যান্ত্রিকতা যাকে স্পর্শ করে না, বড়দের বিচারবোধের দ্বারা যা আক্রান্ত নয়—অযৌক্তিকতা যেখানে বিশ্লেষণ প্রবণতাকে হেলায় অতিক্রম করে—কল্পনা যার মধ্যে মধুর স্বপ্নের নীড় রচনা করে সেই ত ছড়া। বয়স্ক মন থেকে তা উদ্ভূত হলেও বয়স্কমনস্কতা নেই ছড়ার মধ্যে। যুক্তি ও বাস্তবতার ভাববোধকে অস্বীকার করে অবিরাম তার মানসগতি, যা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ ক'রে সৃষ্টি করে অনবদ্য কল্পনাময় রসের জগৎ। মেঘের মতই ছড়া ভাবের বর্ষণের দ্বারা পলায়নপর শিশুমনের ভূমিকে অভিষিক্ত করে আনন্দের বারিধারায়। মেঘের প্রকাশ তার নিয়ত পরিবর্তনশীলতা ও অনন্ত-

বর্ণপরিবর্তনগত রূপ-বৈচিত্রের মধ্যে। ছড়া যেন শিশুমনে তেমনিই রঙ ধরায়, মত্ত হয় ভাবের লুকোচুরি খেলায়।

সমুদ্রবক্ষের সুবিশাল উৎস থেকে যেমন মেঘের উদয়, স্নেহরসসিক্ত মাতৃহৃদয় কন্দর থেকে তেমনি ছড়ার ঝর্নাধারার নিঃসরণ। তার ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণসুষমা শিশু মনকে নানা রঙে রঞ্জিত করে—পূর্ণ করে তোলে এক অপরিচিত ঝংকারে। আপন শিশুর মনোরঞ্জনে সদা তৎপর মাতৃহৃদয় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন এক কল্পনা সমৃদ্ধ ভাবের জগৎ যার মধ্যে শিশুহৃদয় অনন্ত নির্ভরতায় ও ঔৎসুক্যে ভ্রাম্যমান। শিশু যে কি চায়—তা মায়ের অপেক্ষা আর কে বেশী জানেন? মাতৃস্তন্য দুগ্ধ পুষ্ট কোমল শিশুদেহের অভ্যন্তরে তাই থাকে স্নেহরসসমৃদ্ধ এক তৃষার্ত হৃদয়। এই শিশু হৃদয় যে প্রতিমুহূর্তে এক কল্পনার সৌন্দর্যময় জগতের জন্য উন্মুখ—তা জেনেই মা তার তৃষ্ণা নিবারণ করেন রূপকথার ও ছড়ার রসধারায়। রূপকথার স্বপ্ন দেখার বিষয়টি কাহিনীধর্মী ছড়ার মধ্যেও বিদ্যমান। শিশুমনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রতিনিয়ত যে অসম্ভবের স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলছে—তার মুগ্ধকর-রূপ অনুধাবনের ক্ষমতা বড়দের নেই। শুধু মাতৃহৃদয় অসীম ভালবাসা দিয়ে শিশুর অনুভবকে নিজের অনুভব করে তুলতে সক্ষম এবং তাঁর অমলিন পরিশুদ্ধ জীবনবোধ ছড়ার মধ্যে শিশুর জন্য সেইসব বস্তু ও ভাবের সমাবেশ ঘটায়—যার মধ্য থেকে ধূপের ধোঁয়ার মত অথবা নববর্ষনসিক্ত মাটির গন্ধের মত এক অনাবিল গন্ধ উৎসারিত হয়ে শিশুর হৃদয় দিগন্তে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। এই সব ছড়ার মধ্যে শিশুর স্বাভাবিক দুঃখ বেদনার আকুলতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে মাতৃহৃদয়—

> "ওরে আমার ধন ছেলে।
> পথে বসে বসে কান্‌ছিলে॥
> মা বলে বলে ডাকছিলে।
> ধুলো-কাদা কত মাক্‌ছিলে॥
> সে যদি তোমার মা হ'ত।
> ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত॥"

অথবা

> "ধুলোর দোসর নন্দকিশোর ধুলো মাখা গায়
> ধুলো ঝেড়ে করব কোলে আয় নন্দরায়।"

মাতৃস্নেহ কত গভীর হ'লে দেবতা ও মানুষের সীমারেখায় অবলুপ্তি ঘটে—সে সত্য এই ছড়ায় পরিস্ফুট। মানব সন্তানে দেবত্বের আরোপে ও সমীকরণে এখানে যেন মানবশিশুই অধিক মর্যাদা লাভ করেছে। মায়ের অপার ভালবাসা সন্তানকে ঘিরে কত বিচিত্ররূপেই না অসংখ্য ছড়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। অনুরূপ ছড়ার কয়েকটির প্রথম পংক্তি এখানে উল্লেখ করা হ'ল—

(১) ধন ধন ধনিয়ে / কাপড় দেব বুনিয়ে। (২) ধনকে নিয়ে বনকে যাব। (৩) খোকো আমাদের সোনা / চার পুখুরের কোনা (৪) খোকা এল বেড়িয়ে, দুধ দাওগো জুড়িয়ে

(৫) রাণু কেন কেঁদেছে। (৬) দোল দোল দোলানি কানে দেব চৌদানি……দেখ শশুর চেয়ে—আমার কত সাধের মেয়ে। ইত্যাদি।

আমরা বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রচলিত ছড়াগুলির মধ্যে যত বেশী অসঙ্গতি ও যুক্তিহীনতার আবিষ্কার করি না কেন—শিশুর ছড়াসক্তি এইসব বিচারবোধের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত ও ক্ষুন্ন হয় না। কারণ, শিশুর একটি সর্বগ্রাসী গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং যে কোন যুক্তি-তা যতই উদ্ভট হ'ক না কেন—শিশুর কাছে সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। শিশুমনের সীমাহীন কল্পনাময়তা সর্বদাই নবনব রহস্যের জগৎ সৃষ্টিতে নিরত এবং অসম্ভবের সীমারেখা অতিক্রম করে যাওয়াটাই তার স্বভাবধর্ম। একটি সামান্য কঞ্চিকে আমরা যতই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হিসাবে বিবেচনা করি না কেন—শিশু অপু তারই মধ্যে তীক্ষ্ণ দীপ্ত খরধার তরবারির ধর্ম আরোপ করে নির্জন বনপথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সহজেই—রক্তপাত ও শত্রু নিপাতও নিতান্ত কম হয় না। তাই শিশুর সামনে আমরা যখন টিয়াপাখী মাঝি দ্বারা চালিত নৌকা ভাসিয়ে দিই—তা শিশুর কাছে শুধু বিশ্বাসযোগ্যই হয়ে ওঠে না—গ্রহণের তৎপরতা তার চোখ দুটোকে ঔৎসুক্য উজ্জ্বল করে তোলে—

"আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে॥
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা॥"

শিশু-চরিত্র অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ শিশুর এই বিশ্বাসপ্রবণতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয়, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই বরঞ্চ ভালোই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরও অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই নাই; কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষসীমাবর্ত্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে—যদি কিছুই সম্ভব হয়-তবে সকলেই সম্ভব।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে অভিনবত্ব শিশুর পক্ষে যথার্থই আকর্ষণীয় এবং কল্পনা প্রসারেও তার কোন বাধা নেই; তার পক্ষে 'রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে চাঁদের আলো'র অবস্থা ভেবে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা দেখা দেয় না।

শিশুমনে কল্পনার আতিশয্যই তাকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। দিবাস্বপ্ন আমাদের কাছে ঠাট্টা ও শ্লেষের বিষয় হলেও শিশুর কাছে স্বপ্ন দেখার প্রবণতা একটা অপ্রতিরোধ্য ব্যাপার। স্বপ্নের মধ্যে মানুষের মনের এই যে ভ্রমণশীলতা, তা প্রধানতঃ অবাস্তব হলেও বাস্তবজীবনের অপরিপূর্ণতা ও অভাববোধ এর মধ্যেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। স্বপ্ন দেখার একটা তাৎক্ষণিক সত্যের বিষয় আছে। জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন অসার,

অর্থহীন ও ভিত্তিহীন বলে প্রতিপন্ন হলেও, স্বপ্নের স্বল্প সময়টুকুতে তা যথার্থই অর্থময়। শিশুর কাছে সব স্বপ্নই অর্থ ও তাৎপর্যে পূর্ণ। তাই বড়দের কাছে যা অসঙ্গত ও অবাস্তব—শিশুর কাছে তা একান্তই বিশ্বাস্য ও গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন ছড়ায় আমরা প্রচুর অসঙ্গতির সন্ধান পাই। এমন কি আমরা একই ছড়ার মধ্যে পারস্পরিক অসঙ্গতি ও সহসা প্রসঙ্গান্তর গমনের বিষয় দেখতে পাই। ধারাবাহিকতার অভাব যেন কোন একটি বিষয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের সম্পৃক্ততার অসহনীয়তা থেকেই উদ্ভূত। জটিলতা ও বিষয়অনুসরণ স্বল্প-দীর্ঘ ছড়ার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য নয়। ভারহীনতা ও বাউলসুলভ বিষয়-ঔদাসীন্য ছড়াকে ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ভাব-গৃহস্থের অতিথি করে তোলে। মেঘের মতই তা ক্ষণে রূপ ও রঙ বদলায়। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তার সহজ পথ পরিক্রমা। "ও পারে জস্তিগাছটি জস্তি বড়ো ফলে"—এই প্রথম পংক্তিযুক্ত ছড়াটির মধ্যে সহসা হরগৌরীর মাঠে পাকাপাকা পান পাওয়ার সম্ভাবনা কত সহজেই না মনে এসেছে এবং তার সামান্য পরেই হঠাৎ সুবলের বিবাহের বৃত্তান্ত —সেখান থেকে দিগনগরের কন্যাদের স্নানের প্রসঙ্গ—এইভাবেই একখানি লঘু মেঘখণ্ডের মত ছড়াটি নানা দেশ বিদেশের বিবিধ পটভূমির উপর দিয়ে চলে যেতে যেতে সেখানকার জীবনকে ছুঁয়ে তার উপর তার স্নিগ্ধ ছায়ায় একটা মধুর আস্তরণ বিছিয়ে গেছে।

ছড়ার মধ্যে এক নয়নাভিরাম চিত্রধর্মিতা আছে। দুএকটি আঁচড়ে নিপুণ শিল্পী যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের আভাস রচনা করেন, ছড়ায় রচনাকারও তেমনি স্বল্প প্রচেষ্টায় হাল্কা রঙে সার্থক ছবি আঁকেন—অবলম্বন হয় পরিচিত রূপকল্প-যার সঙ্গে আমাদের জনজীবনের একটি নিবিড় পরিচয় আছে :

"খোকা নাচে কোনখানে।
শতদলের মাঝখানে॥
সেখানে খোকা চুলঝাড়ে।
খোকা খোকা ফুল পড়ে।"
তাই নিয়ে খোকা খেলা করে॥

মায়ের মনের শিশুকেন্দ্রিক স্বপ্নকল্পনা এক মধুর চিত্র রচনা করে—যার মূলে থাকে মানবিক ভাবোচ্ছ্বাস এবং তারই শিশু অভিষিক্ত হয় দেবত্বের ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে। বলা বাহুল্য, মায়ের হৃদয়ের এই সৃষ্টিসুষমার এক সার্বজনীন আবেদন আছে—এই আবেদনই কোন সুদূর অতীতে সৃষ্ট ছড়াটিকে সীমাহীন ভবিষ্যতের মায়েদের হৃদয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অজ্ঞাত রচনাকারের সৃষ্টির ঐশ্বর্য গড়ে ওঠে তারই জীবনের চতুর্দিকের দৃশ্যময়তা ও জীবনধর্ম থেকে তিল তিল করে বস্তু ও ভাব আহরণের সাহায্যে। দৃষ্ট ছবির সঙ্গে মিশে যায় তার স্বভাবকবির নৈপুণ্য ও কল্পনা-প্রবাহ। কল্পনার রঙীন স্পর্শ তাকে করে তোলে আরও বর্ণাঢ্য, আরও অভিনব, আরও পরিণত এক পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি।

**ছড়ার বিষয়বস্তু ॥**

ছড়ায় বিষয়বস্তু কি? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে-জীবন। কোন জীবন? —যে জীবন আমরা যাপন করে আসছি—ইতিহাসের ঝঞ্ঝাবাত্যার মধ্যেও যে জীবনপ্রবাহ গতিশীল। ছড়াগুলির মধ্যে জীবন তার আদি প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত। সেগুলির গায়ে মাখা আছে ভিজে সোঁদা মাটির গন্ধ—যার ঘ্রাণ যে কোন মানুষই নিতে পারে এবং ফিরে যেতে পারে তার ফেলে আসা শৈশবে। তাপদগ্ধ জীবনের মধ্যাহ্নে যদি পুনরায় প্রাতঃসূর্যের স্নিগ্ধ কিরণসম্পাতের মাধুর্য উপভোগ করতে হয় তবে আর একবার গিয়ে বসতে হবে শৈশবেব সবুজ ঘাসে।

সংগৃহীত ছড়াগুলির অধিকাংশের মধ্যেই স্নেহ ভালবাসার উষ্ণতা অনুভব করা যায়। খোকাকে ঘিরেই মায়ের যত স্বপ্ন-যত সাধ আহ্লাদ—যত ব্যাকুলতা ও আর্তি। কখনও সুখস্বপ্ন তাঁকে বিভোর করে তোলে, কখনও বা কল্পিত দুঃখ বেদনা তাঁকে বিহ্বল করে কাঁদায়। সন্তান যখন কন্যা তখন ত তাঁর দুশ্চিন্তা অন্তহীন। এই সেই সমাজ যেখানে নারীর সূচনা থেকে সমাপ্তিব জীবন অতিক্রান্ত হয় পরাশ্রয়ে এবং যেখানে তাব চরম ও পরম আশ্রয়ই হয় বিবাহিত জীবন। অথচ, সেই অনিবার্য জীবনেব মধ্যেই আছে সম্ভাব্য বিনষ্টি ও দুঃখ জটিলতা। তাই শিশুকন্যার বিবাহের চিন্তা যেমন মায়েব কাছে অপ্রতিরোধ্য, তেমনি তাকে ভেবে রাখতে হয় পারিপার্শ্বিকেব মধ্যে চলমান বেদনাক্লিষ্ট জীবনধাবার প্রতিরূপ। মায়ের মনের প্রায় সবটাই জুড়ে থাকে এই গার্হস্থ্যজীবনাশ্রয়ী হৃদয়ব্যথার গভীরতা। পিতামাতার সঙ্গে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সেখানে বিবাহিতার কোন সমৃদ্ধিব স্বপ্নেই পূর্ণ হবার নয়—তাই সন্তানকে ঘিরে তার হাহাকার ধ্বনিত হতেই থাকে; সন্তানের উক্তিতে অনেকটা যেন গঞ্জনার ভাব থাকলেও মায়ের হৃদয়ের কাছেই তার শেষ আবেদন—কেন না এ ত বস্তুতঃ মায়েরই ফেলে আসা শৈশবস্মৃতি

(ক) "অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব লো পরেব ঘব॥
পরের বেটা মারলে চড়।
কান্তে কান্তে খুড়োর ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
রেখে আয় গে মায়ের বাড়ি॥

অথবা

"আমরা যাব পরের ঘরে পর-অধীন হয়ে।
পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে॥

ছড়াগুলির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য :—"আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো নিয়ে। অপ্রাপ্তবয়স্ক

অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়। সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণা দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে।"

এইভাবে বাংলাদেশের সাধারণ সমাজজীবন, তার সমগ্র নারীজীবন ও শিশুজীবনের সকাল বৈচিত্র্যসমূহ ছড়াগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন কোন ছড়ায় আর্থিক সমৃদ্ধির আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে আবার কোথাও বা ইতিহাসের ঘটনা ছড়ার উপাদান হয়ে উঠেছে :

"খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে"

## ॥ ছড়ার ভাষা ও ছন্দ ॥

বাংলাদেশে প্রচলিত ছড়াগুলিতে প্রচলিত কথ্য ভাষায় শব্দসম্ভার ব্যবহৃত হয়েছে। ছড়াগুলি অতিমাত্রায় জীবনধর্মী হওয়ায় জন্য প্রকাশভঙ্গীও তদনুরূপ হয়েছে। তাছাড়া এগুলি সাধারণ মানুষের সৃষ্টি হওয়ায় গ্রাম্যকবির উপযুক্ত সরল ও স্থূল ঢঙ অনুসৃত হয়েছে। যে সব শব্দের মধ্যে গ্রাম্যমানুষের সুখ, দুঃখ বেদনা, স্নেহ, ভালবাসা, কলহ, আশা, আকাঙ্খা, প্রভৃতির মনোভাব প্রকাশিত—ছড়ায় কবি যেন সেগুলিকেই অবলম্বন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় ছড়ার ভাষা "গৃহচারিণী, অকৃতবেশা, অসংস্কৃতা। ছড়ায় সাধারণত তৎসম শব্দ বিরল, তদ্ভব, দেশী গ্রাম্য শব্দই প্রাধান্য পেয়েছে। যেখানে শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত, সেখানে প্রচলিত বাগ্‌ধারাকে গ্রহণ করা হয়েছে, যথা -

শব্দ—কানতে কানতে, বাদ্দি, ভাঙা, ঠেঙা,
গাল, হেঁশেল, কুঁড়ো ইত্যাদি
শব্দগুচ্ছ—যমুনাবতী স্বরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে, হাড় হল ভাজা ভাজা,
তাক ঠুমাঠুম বাদ্দি বাজে।

ছন্দের প্রতি শিশুর আকর্ষণ চিরকালের। শিশু প্রথম কথা বলা শিখেই দুলে দুলে ছড়া বলতে ভালবাসে। অর্থ হয়ত সে কিছুই বোঝে না কিন্তু ধ্বনিসুষমাই তার কাছে প্রধান, ছন্দের সঙ্গীতমুখর তরঙ্গময় প্রবাহ তার চিত্তকে ধ্বনিঝংকারে মুখরিত ক'রে তোলে।

বলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দকে যে ছড়ার ছন্দ বলা হয় তার একমাত্র কারণ হ'ল ছড়ার মূল পাঠরীতি এই ছন্দটির মধ্যে অনুসরণ করা হয়েছে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে। ছড়ার উৎস লোকজীবন হওয়ায় তার উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যেও লোকপ্রভাব আছে। ছড়া লোকজীবনে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় উচ্চারণ রীতিতে দ্রুততা ও ধ্বনি প্রাধান্য এসেছে। ছড়ায় ছন্দ তাই শ্বাসাঘাত প্রধান এবং প্রতি পর্ব চতুর্মাত্রিক যেমন—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
(ক) মাসি পিসি / বনকাপাসি / বনের মধ্যে / টিয়ে।
মাসি গিয়েছে / বৃন্দাবন / দেখে আসি / গিয়ে॥"
প্রতি পর্বে—চার মাত্রা।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

(খ) "আলতো পাটি / আলতো পাটি।
আলতো পাটি / লাল দোপাটি॥
জামের ভিতর / আমের আঁটি॥
চলছে জাহাজ / জোয়ার ভাঁটি॥"
প্রতি পর্বে—চার মাত্রা।

## ॥ ছড়া ও শিশু-শিক্ষা ॥

শিশু- শিক্ষার সঙ্গে ছড়া অঙ্গাঙ্গীভাবে, জড়িত। শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই শিশুপাঠ্য বিষয়সমূহ ও পাঠ পদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। সরল বিশ্বাস, কল্পনা প্রবণতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তা, কল্পনা-প্রবণতা, অনুকরণ প্রিয়তা, আত্মপ্রকাশ উন্মুখতা, চিত্র ও সঙ্গীতপ্রিয়তা, স্নেহাসক্তি প্রভৃতি শিশুমনের স্বাভাবিক চারিত্রবৈশিষ্ট্য। শিশুশিক্ষায় পাঠক্রম ও পাঠরীতি শিশুমনের এই সব প্রবণতার দিকে লক্ষ রেখেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—শিশু নবীন হয়েও চিরনূতন। ছড়াগুলি কোন আদিকালে রচিত কে বলবে? ছড়াগুলি সমাজের বহুকালব্যাপী পরিবর্তনের প্রভাবকে অতিক্রম করে তাদের স্থায়িত্ব বজায় রেখেছে। ছড়ায় এই চিরন্তনত্ব তার শাশ্বত প্রাণধর্মেরই প্রতিফলন। এমন এক দুর্বার ও অপরিবর্তনীয় জীবনরস তাকে চিরকাল সঞ্জীবিত রেখেছে যে, সেগুলো এখনও পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে রসের জোগান দিয়ে চলেছে। শিশুর সদা প্রাণচাঞ্চল্যের ও আনন্দপ্রিয়তায় সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই চিরকালের শিশুদের জন্য চিরকালের এই ছড়া।

শিশুর প্রথমজীবন ইন্দ্রিয় ও কল্পনা নির্ভর। ছড়াগুলির একদিকে আছে সাদাসিধা বাস্তব জীবন—যা চোখে দেখা যায় এবং কানে শোনা যায়; অপর দিকে আছে সুদূরপ্রসারী কল্পনা। সেই সঙ্গে আছে সহজ আশা আকাঙ্খা ও দুঃখ বেদনা। তাই কল্পনাবিলাসী শিশু ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সাগরতীরে বালুর ঘর, আর মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করে। "খোকা যাবে নায়ে/লাল জুতুয়া পায়ে" ছড়াটি শিশুকে কোন এক স্বপ্ন রাজ্যের দিকে নিয়ে যায়। শিশুর আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা স্বাভাবিক ও তীব্র। তার পরিতৃপ্তির জন্য "খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে" জাতীয় ছড়ায় উপযোগিতা যথেষ্ট বেশী। ছড়াটির পরবর্তী অংশও ( ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙ, মাছ নিয়ে গেল চিলে ) বিস্ময়বোধ চরিতার্থ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ছড়াগুলির মধ্যে আছে প্রবল ধ্বনিময়তা ও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য। সামান্য সুরসহ ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে অনেক শিশুকেই আবেশ ভরে নাচতে দেখা যায়। এই অঙ্গভঙ্গী তার অন্তরাশ্রয়ী আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ। এবং এ তার চিত্তবৃত্তির বিকাশ সাধনের সহায়ক।

ভাষাশিক্ষায় পাঠ হিসাবে, বিশেষতঃ শিশুকে যখন কোন রকম পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়নি, তখন ছবিসহ ছড়া তার পক্ষে যথার্থই উপযোগী। শিশুর বাচনিক আত্মপ্রকাশ ছড়ার অনাড়ম্বর ও সহজবোধ্য ভাষার সাহায্যে সহজেই হতে পারবে। অনধিক চার পংক্তির ছড়া তার প্রাথমিক পাঠ হিসাবে নির্বাচন করতে হবে।

## ছড়ার পাঠদান পদ্ধতি :—

শিশুর জন্য সেইসব ছড়াই আদর্শ স্বরূপ যেগুলোকে আমরা ইংরেজীতে Nursery Rhyme বলে থাকি। যে কোন জাতির লোকসাহিত্য ভাণ্ডারে ছড়ার প্রাচুর্য দেখা যায়। কিন্তু তার সবগুলো শিশু-শিক্ষার উপযোগী নয়। যে সব ছড়া বিষয়বস্তু ও প্রকাশ বৈশিষ্ট্যে শিশুমনের পরিপোষক—কেবল সেগুলিই নির্বাচনের মর্যাদালাভ করবে। এগুলির মধ্যে থাকবে প্রকাশ-সারল্য, পরিচিত বিষয়বস্তু, অথবা পরিচয়-ভিত্তিক অথচ অনুমাননির্ভর বিষয় ( যথা 'হাটিমা টিম টিম' - মুরগীর সাদৃশ্য যুক্ত ) এবং কল্পনাপ্রাধান্য ও সঙ্গীতময়তা।

শিশুশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছড়ার বিষয়বস্তু ও ভাবসাদৃশ্যযুক্ত ছবি থাকতেই হবে। এই ছবির আবেদন অমোঘ। শিশু পড়া শেখার আগেই ছবি দেখে ছড়া চিনতে ও বলতে শিখবে। শিশু যে তা বলতে পারে—তা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে। এই স্তরে শিশুকে ছড়া মৌখিকভাবে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

বিদ্যালয়ে ছড়ার পাঠদানে চিত্রকে ( বহুবর্ণরঞ্জিত ) প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করা অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রেণীভিত্তিক পাঠদানে সকলের দেখার উপযোগী আকৃতিবিশিষ্ট চিত্রের ব্যবহার সমীচীন। ছড়ার পাঠদানের পূর্বেই সেটি দেওয়ালে যথাস্থানে রাখতে হবে। শিক্ষকের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা যৌথভাবে শিক্ষককে অনুসরণ করবে। প্রয়োজন বিশেষে শিক্ষককে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়ার পাঠ দিতে হবে। মাঝে মাঝে শিক্ষককে কল্পনাউদ্দীপক প্রশ্ন করতে হবে। তাতে বৈচিত্র্য আসবে এবং শিশুর আত্মপ্রকাশ ক্ষমতা বাড়বে। শিশুরা পঠনক্ষম হলে সমগ্র ছড়াটি একটি বড় কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখে নিয়ে যাওয়া দরকার। ছড়ার অভ্যন্তরস্থ শব্দের সাহায্যে কার্ড তৈরী করে সমগ্র ছড়াটির রূপদান আর একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

**॥ কবিতার সংজ্ঞা ॥**

(১) "Poetry is a metrical composition · it is the art of writing pleasure with truth by calling imagination to the help of reason".
—*Johnson*

(২) "What is poetry but the thought and words in which emotion spontaneously embodies itself ? —*Mill*

(৩) "Poetry in a general sense may be defined as the expression of the imagination." —*Shelley*

(৪) Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge."
—*Wordsworth*

(৫) "Poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach." —*Matthew Arnold*

(৬) ক। "আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না- কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ।" – রবীন্দ্রনাথ

খ। "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। —রবীন্দ্রনাথ

(৭) "কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না, কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক এবং বস্তুতন্ত্র।" —বিপিনচন্দ্র পাল

কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয়ে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি নিশ্চয়ই কবিতার বিষয়বস্তুকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। কবিতা সাহিত্যের সুপ্রাচীন শাখা বলে বিবেচিত হলে, এর বিপুলতা, বৈচিত্র, আস্বাদন যোগ্যতা ও চিরন্তনতা সম্পর্কেও আমাদের নিঃসংশয় হতে হবে। সেই সঙ্গে একথাটাও ভাবতে হবে যে, কাব্যসৃষ্টির অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকেই কাব্যের চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্যের অভ্যন্তরস্থ রহস্যসূত্রটি কি—সে বিষয়ে একটি জিজ্ঞাসার দ্বারা মানব মন আকুলিত হয়েছে। এই জিজ্ঞাসারই অপর নাম কাব্য জিজ্ঞাসা। কেবলমাত্র পাঠকমনেই যে এ বিষয়ে বিস্ময়বোধ জাগ্রত হয়েছে তা নয়। সমালোচক তথা আলঙ্কারিকবৃন্দ এর উত্তরদানে অগ্রসর হয়েছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে—স্বয়ং কাব্যস্রষ্টা অর্থাৎ কবিও আপন অন্তরমধ্যে এর সৃষ্টিরহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। ফলে গড়ে উঠেছে বিপুলায়তন অলঙ্কারশাস্ত্র যার কাজই হল সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও মর্মানুসন্ধান।

কবিতা কি—তা বোঝার চেষ্টাও যেমন হয়েছে বোঝানর আকাঙ্খাও তেমনি কম নয়। এই ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়েই কবি ও সমালোচকবৃন্দ কবিতার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু, তার ফলে বিষয়টি স্বচ্ছতালাভ করেছে কিনা তা বলা শক্ত। কারণ কবিতা সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, কবিতা অনুভবের বিষয়, অনুধাবনের বিষয় নয়। কবিতার আবেদন রসিকের হৃদয়ের কাছে। তাই কবিতা বিষয়ে সকলের মনেই একটা ধারণা থাকলেও—সেটি সন্তোষজনকভাবে ব্যক্ত করা সুকঠিন।

উপরের উদ্ধৃতিগুলির রচয়িতা দেশী ও বিদেশী খ্যাতনামা কবি ও সমালোচকবৃন্দ। তাঁদের নিজেদের উপলব্ধি অনুসারে কবিতার সত্যকে তাঁরা এই সব স্বল্পায়তন বিবৃতির মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন। জনসনের সংজ্ঞাটিতে দেখা যায় তিনি প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন—একটি আঙ্গিক বা গঠনকৌশল এবং অপরটি হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে সত্য ও হৃদয়ানন্দের মিলন সাধন। সাহিত্যের সত্য ও বাস্তব সত্যে অমিল থাকলেও কাব্যের প্রারম্ভিক উপাদান যে বস্তুসত্য—তা ধরা পড়েছে বিপিন পাল মহাশয়ের মতবাদে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ রসবাদী তথা আনন্দবাদী কবি ও দার্শনিক। তাই অন্যত্র একটি রচনায় তিনি বস্তুময়তায় শৈল্পিক রূপান্তরের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী করে। জনমনের সংজ্ঞাটির মধ্যে একটা পূর্ণতার ভাব আছে। অর্থাৎ তিনি একদিকে যেমন কবিতার দেহ গঠনকৌশলের ইঙ্গিত দিয়ে তাকে Technique নির্ভর বলেছেন, অপর দিকে কল্পনা, ভাব, বিচারবোধের সমন্বয়ে কবিতার ভাবসৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়ে কবিতার আত্মার ধর্মকেও ব্যক্ত করেছেন। Imagination বা কবিকল্পনা যে কবিতার অপরিহার্য উপাদান এ সত্য প্রায় সব সমালোচক ও কবিরই স্বীকার্য্য। কল্পনার তীব্রতাই বাস্তব সত্যকে গভীরভাবে রূপান্তরিত ক'রে হৃদয়কে অপার সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে—ভাবের প্রকাশ হয় রূপকল্পের ব্যবহারে—কল্পনাই তার সহকারী। শেলীর মত রোমান্টিক কবির কাছে কবিভাবনা যে কল্পনারই নামান্তর মাত্র—সে সত্য ধরা পড়েছে। হৃদয়ের অতিমাত্রিক ভাবাত্মক প্রসারণশীলতাই কাব্য-সৃজন ক্ষমতার দ্বারা বিশিষ্ট সুকুমার রূপলাভ করলেই তাকে আমরা কবিতা বলি। মাইকেল মধুসূদন—যাঁর মধ্যে রোমান্টিকতা ও ক্লাসিকতা—এই উভয়ের সুদুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল তিনিও কবিতা সৃষ্টিতে ভাবময়তার সঙ্গে কল্পনার মিলনসত্যের বিষয়কে বড় করে দেখেছেন। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 'কবি' ও 'কবিতা' নামে যে সনেট আছে—তাতে তিনি কবিতা নির্মিতির (সৃষ্টি) রহস্যটিকেই ব্যক্ত করেছেন। কবিতা যে অলৌকিক শক্তিসাপেক্ষ সে বিষয়ে তিনি বলেছেন—

> "দয়া করি নবে,
> কবি-মুখ-ব্রহ্মলোকে উরি অবতার
> বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর নগরে।—"

বস্তুজগৎ থেকে উদ্ভূত ভাব এবং সেই ভাবের সঙ্গে যখন কল্পনার সুষম সমন্বয় ঘটে তখনই হয় কবিতার সৃষ্টি। কবির মনোজগতই তার নির্মাণশালা যেখানে তিনি

ভাবনিষ্ঠ শিল্পী ও ভাবের রূপময়তা ভাষার দেহেই পরিস্ফুটনে সক্ষম ; তিনিই কবি—যিনি এই নির্মিতি-পারদর্শী :

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।" —মধুসূদন

কথা কবিতার দেহ, ভাবই তার আত্মা। কথার মধ্যে অর্থময়তা আছে—যার মধ্যে ভাষা পায় পরিদৃশ্যমান বস্তুজগত ও মানবিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু কবিতাতে তার প্রাধান্য কোথায়? সেই সত্য সৌন্দর্য কোথায়—যা বাসা বেঁধে আছে কবিতাদেহের মর্মমূলে? *Mathew Arnold*-এর 'Perfect form of utterance'-এর দ্যোতনা কি শুধু অনন্যসাধারণ শব্দ-সাধনার অলৌকিক নৈপুণ্যে না কি এই perfection তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাধকোচিত প্রয়াসে? *Arnold*-এর সংজ্ঞার মধ্যেই এর উত্তর নিহিত আছে—তিনি যাকে delightful utterance বলেছেন তাই ত সেই রসানন্দময় মানবিক ভাষাভিত্তিক প্রকাশ যা শেষ পর্যন্ত একটা perfection বা চরম উৎকর্ষের সীমারেখা স্পর্শ করে। আর তাই আমরা কবিতার ভাষাকে বলি—'Best words in the best order'—সেজন্যই উৎকৃষ্ট কবিতার ভাষা সর্বদাই অপরিবর্তনীয়।

একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। কবিতার প্রাণ তার ভাষাও নয়—ভাবও নয়—কল্পনাও নয়; এ সবেরই সুষম সম্মিলনে উদ্ভূত এক অলৌকিক রসানন্দ, ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যাকে বলেছেন—ব্যঞ্জনা।

**কবিতা ও পাঠক্রম**

কবিতা যদি মানুষের Supreme Art বা শিল্পোৎকর্ষের চরম ও পরম অভিব্যক্তি হয়—আর শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় "Manifestation of perfection already in Man."—তবে উভয়ের সাযুজ্যসাধন যে একান্তই কাম্য তা না বললেই চলে। অর্থকরী বিদ্যার লক্ষ্যে পৌঁছে আমরা পার্থিব অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখি এবং তার সার্থকতাও আমাদের কাছে স্বল্প নয়। কিন্তু হৃদয়তৃষ্ণা, যার নিবৃত্তি আমাদের সেই মহানন্দের আস্বাদন লাভে সাহায্য করে—তার জন্য আমাদের শিক্ষায় থাকবে কোন উপাদান? কবিতা ও সঙ্গীতই হবে তার মাধ্যম—যার স্বাদগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভাবময় বিশ্ব আমাদের হৃদয় সংবেদ্য হয়ে ওঠে এবং আমাদের করে তোলে সহৃদয়। অতএব, কবিতাকে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় কোন ব্যক্তির দ্বিমত থাকার কথা নয়।

কেবলমাত্র একটি সতর্ক বাণী এখানে উচ্চারণ করা আবশ্যক। কবিতা যেহেতু সুকুমার শিল্পকলা, সেইহেতু এর পঠন-পাঠনে শব-ব্যবচ্ছেদের মত আসুরিক রীতি অবশ্যই বর্জনীয়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। কবিতাপাঠের উদ্দেশ্য তত্ত্বের নিষ্কাশন নয়, বস্তু-সত্যে

উপনীত হওয়া তার লক্ষ্য নয়; আত্যন্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে জাগতিক মূল্যবোধের রাজ্যে উপনীত হওয়াও নয়—কেবলমাত্র রস-সত্যের নির্মল আনন্দটুকুই তার শেষ লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কবিতা হইতে তত্ত্ব বাহির না করিয়া যাহারা সন্তুষ্ট না হয় তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে, তত্ত্ব তুমি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব।"

## বিদ্যালয়ে কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য :—

কবিতায় আমরা যে সার্বজনীন সত্য সৌন্দর্যের কথা বলি তা মানুষের উত্তরজীবনেই যথার্থরূপে প্রাপ্তব্য, অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের রসসাধনার দ্বারা সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। বিদ্যালয় জীবনকে তার প্রারম্ভিক প্রস্তুতির স্তর বলতে পারি। ছড়ার সাহায্যে আমরা যেমন শৈশবেই কল্পনার সর্বার্থসাধক সৌন্দর্যেব স্বর্গরাজ্যে উপনীত হয়ে বিমলানন্দ লাভ ক'রে ধন্য হই-পরিণত বয়সে তেমনি উন্নত মানের কাব্যচর্চাব মধ্যে এক সাংস্কৃতিক জগতের অভ্যুদয় হয় এবং কাব্যের রসগ্রহণে সক্ষম হই। বিদ্যালয়ের কবিতা চর্চার সাহায্যে কবিতাটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ করতে ছাত্রদের সহায়তা করতে চাই। একটি কবিতা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ—কেন আমাদের ভাবময়তার সঙ্গিনী তার আভাস মাত্র রচনা করাই আমাদের মত সাহিত্য শিক্ষকের কাজ। কবিতার স্রষ্টা এই সব রসসাধকের সঙ্গে পরিচয় সাধনও আমাদের অন্যবিধ উদ্দেশ্য। কবিতা রচনার সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে যে জাতীয় সংস্কৃতির সাধনার বিবিধ স্তর প্রচ্ছন্ন আছে তার স্বরূপ সন্ধান করাও আমাদের লক্ষ্য। যে সব সাধক কবি তাঁদেব সাধনার দ্বারা এক পরিব্যাপ্ত খ্যাতি লাভ করেছেন—তাঁদের কাব্যভাব ও ভাবনার মূলসূত্রের সঙ্গে পরিচয় সাধন প্রয়োজন। কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবমূর্তির সঙ্গে হৃদয়গত সাযুজ্যলাভের মধ্য দিয়ে রসমাধুর্য আস্বাদন আমাদের শেষ ও প্রধান লক্ষ্য হলেও শিক্ষার্থীর অন্যবিধ জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করাও সাহিত্য শিক্ষকের কাজ, যদিও কবিতায় কেন্দ্রীয় সত্যের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা সর্বপ্রধান কর্তব্য।

## কাব্যপাঠ-রীতি ও প্রকৃতি

কাব্য পাঠে আমরা লাভ করি দ্বিবিধ আস্বাদন—রূপময়তা ও ভাবময়তার রসসৌন্দর্য। ছন্দের ধ্বনিময়তাকে অবলম্বন করে সুরচিত কবিতার সঙ্গীতধর্মকে উপলব্ধি করি সুচারু পাঠরীতির সহায়তায়। কবিতায় ছন্দোপ্রাধান্য ধ্বনিঝংকারের এক অনির্বচনীয় রসলোকে আমাদের উত্তীর্ণ করে। ভারতচন্দ্র ও সত্যেন্দ্র দত্ত প্রধানতঃ এই গুণেই পাঠক হৃদয়কে জয় করেছিলেন। বিহারীলালই সর্বপ্রথম আমাদের মনকে রূপলোকের দর্শনগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য ও ধ্বনির শ্রুতিমধুরতায় সীমা অতিক্রম করে ভাবের রসচেতনার জগতে নিয়ে এলেন—যেখানে পরিচয় সাধিত হ'ল এক করুণ বিষাদের অর্ধ-বিমূর্ত প্রকাশের সঙ্গে।

সঙ্গীতের আবেদন-আমাদের কাছে শাশ্বত বলেই কবিতায় সাঙ্গীতিক ধর্ম আমাদের আকর্ষণ করবেই। এ যুগের 'আধুনিক কবিতার' ক্ষেত্রে এক মিশ্ররীতির অনুসরণ চলছে। তবে আঙ্গিক-বিশিষ্টতা কানের কাছে ধ্বনিমিষ্টতার যে আবেদন সৃষ্টি করে তার ক্রমবর্জনই কবিদের কাছে পালনীয় হয়ে উঠছে। কোথাও বা স্বল্প পরিমাণে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈচিত্র্যের সন্ধানে কবিরা অন্বেষণব্রতী হয়ে কবিতাকে প্রচলিত ছন্দপ্রভাব মুক্ত করে অর্থময়তার প্রাধান্য দিয়ে কবিতাকে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে করে তুলতে প্রয়াসী। এ কবিতা আমাদের নতুনত্বের স্বাদ দেয় সন্দেহ নেই। মননশীল অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রধান বলে আধুনিক কবিতা প্রধানতঃ বৌদ্ধিক চর্চা নির্ভর। এসব কবিতায় তাই ভাবের অভাব না থাকলেও ভাব-সৌকুমার্যের ক্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। এসব কবিতায় পৃথক স্বভাব-ধর্মের জন্য পাঠ রীতি ও আবেদনও ভিন্নধর্মী।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কখনও কখনও আধুনিক কোন কোন কবির কবিতা নির্ধারিত হলেও, সেগুলি অতি-আধুনিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রাণার' কবিতাটির নাম করা যেতে পারে। অতি আধুনিক কবিতার ভাব ও প্রকাশধর্মের জটিলতা উক্ত কবিতায় নেই। আধুনিক কবিতা ও পাঠকের মধ্যে আছে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, তা অতিক্রম করতে হলে চাই সদাজাগ্রত চিত্ত ও প্রখর বৌদ্ধিক তৎপরতা এবং দার্শনিক তত্ত্বের জ্ঞান। সুকান্ত আধুনিক কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে ভাবপ্রাধান্যই সূচিত হয়েছে। কাব্য-নির্মিতিতেও তিনি প্রচলিত ছন্দকে অস্বীকার করেন নি। এরূপ কবিতায় পাঠ-মাধুর্য ও ভাবোদ্বেলতা--উভয় বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে।

বিদ্যালয়ের নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণত বস্তুপ্রধান ও সরল রচনাভঙ্গীর স্বল্প দৈর্ঘ্যের কবিতা নির্বাচিত হয়। শিক্ষার্থীর অকিঞ্চিৎকর যোগ্যতার কথা ভাবলে এরূপ নির্বাচন-নীতিকে সমর্থন করতেই হয়। এসব কবিতার পাঠদানে অর্থ-উপলব্ধি অবশ্যই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু আরও দুটি বিষয়ের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। রচনাশৈলী যেখানে ভাবনির্ভর সেখানে যথাযথ পঠনের দ্বারাই শিক্ষককে ভাবটি মূর্ত্ত করে তুলতে হবে। কোন বিশেষ অংশটি ভাবের বিশেষ প্রকাশক তার ব্যাখ্যা করাও প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ কবিতার সত্য যে ঠিক নির্দিষ্ট অঙ্গের মধ্যে নিহিত থাকে না—বরং তার অভিব্যক্তি যে অখণ্ড—শিক্ষার্থীদের এটা উপলব্ধি করাতে হবে।

আরও কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় বা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পড়াবার সময় তাঁদের মৌল কবিধর্মের উল্লেখ করে আলোচ্য কবিতার সঙ্গে তার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্য সমধর্মী কবিতা পাঠ্যকবিতার আলোচনার প্রসঙ্গেই পাঠ করতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' বা 'দুর্ভাগা দেশ' শীর্ষক কবিতা পড়াবার সময় কবির কোন জীবন-দর্শনের উৎসমূল থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে—সে সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য-সাহায্যে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়তে হবে।

## কবিতা পাঠন-কৌশল

(ক) সাহিত্য পাঠনার Motivation বা মানসিক আনুকূল্যবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন বিশিষ্ট কবির কবিতা পাঠের প্রারম্ভে সমধর্মী অন্য কবির কবিতা বা একই কবির অপর কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করে বা তাঁর বিষয়ে আলোচনার সূচনা করে ছাত্রদের মনকে পাঠাভিমুখী করতে হবে। পাঠ-ঘোষণার পূর্বেই কবির একটি নাতিবৃহৎ প্রতিকৃতি এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট সহায়ক।

(খ) শ্রেণীর ছাত্রগণের মানসিক যোগ্যতার মান অনুসারে একটি সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি প্রদান অবশ্য পালনীয় কাজ এবং আধুনিক সাহিত্য পাঠনরীতির অপরিহার্য অঙ্গ। কবিতা কবি-মনেরই ফসল। কবিতা রচনায় উৎস জানা থাকলে তা অবশ্যই বিবৃত করতে হবে। কবির রচনাকর্মের প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলির নাম বোর্ডে লিখে দিলে ভাল হয়।

(গ) কবিতায় রচনা কৌশল বা ভাবধর্মের তুলনামূলক আলোচনা পাঠনপদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করে এবং কাব্যচর্চাকে আরও ব্যাপক পরিসরের মধ্যে নিয়ে যায়। ইংরেজী উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে তার অনুবাদ করে দেওয়া সমীচীন।

(ঘ) ব্যাকরণ ও শব্দার্থের আলোচনা অপরিহার্য বলে মনে হলে তা করতে হবে। যেমন, 'জুতুয়া' শব্দটির ব্যাকরণগত তাৎপর্য বিচার অপেক্ষা ভাব-পরিবহন ক্ষমতার পরিচয় প্রদানই অধিক কাম্য। কোন দুরূহ শব্দের অবস্থানের জন্য ভাব গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হলে, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

(ঙ) আলোচনার প্রশ্ন যেন শেষ পর্যন্ত কবিতার ভাবকে উন্মোচিত করে—তা দেখতে হবে। পরিশেষে কবিতার সামগ্রীকতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(চ) শিক্ষক কর্তৃক কবিতার আদর্শ-পঠন একটি আবশ্যিক বিষয়।

অনুবাদ বলতে আমরা সাধারণত সীমিত সংখ্যক ভাষার মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তরকরণকেই বুঝি। ভাষা শিক্ষায় ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ অথবা বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ কিংবা ভারতীয় কোন প্রধান স্থানীয় ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ অথবা বাংলা থেকে অন্যভারতীয় ভাষায় অনুবাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সভ্যতার ক্রমপ্রসারের ফলে বর্তমান যুগে পৃথিবীর আয়তন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেব মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদান একান্তই কাম্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষার লক্ষ্য যদি জীবনের পরিপূর্ণতা সাধন হয় তবে ভাব বিনিময়ের দ্বারা আমরা হৃদয়ের সমৃদ্ধি লাভ করে লাভবান হতে পারি। তাই বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরেজী থেকে বা ইংরেজীতে অনুবাদের বিষয় উল্লেখিত হলেও অপর সব গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদের প্রয়োজনও স্বীকৃতি লাভ করছে। বস্তুত সাহিত্যিক প্রয়োজন সাধনেও আমাদের ইংরেজী ভাষা ব্যতীত অপর বিদেশী ভাষার উপর সরাসরি নির্ভর করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ গ্যেটের 'ফাউস্ত' এবং হাইনরিখ ব্যোলের 'যুদ্ধ যখন শুরু হয়' সরাসরি জার্মাণ ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়ে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

কেবলমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে যে আমাদের অন্য ভাষার উপর নির্ভর করতে হয় —তাই নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের অন্য ভাষার উপর নির্ভর করতেই হয়; উপরন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যে ভাবে জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ করতে চাই—সেটিও সম্ভব হতে পারে বিভিন্ন সভ্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অনুবাদের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে তোলার মাধ্যমে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটিও আমাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কর্মজীবনে অসংখ্য শিক্ষিত মানুষকে শিক্ষাকাল শেষে বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সংবাদপত্র সংস্থায়, নানা শ্রেণীর সরকারী সংস্থায়, সর্বভারতীয় কর্মযজ্ঞে এবং বিদেশে নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত হতে হয়। সেসব ক্ষেত্রে কর্মসাধন ও ভাবের বিনিময়ের জন্য প্রধানতঃ ইংরেজী বা অপর কোন ভারতীয় বা বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্যের কথা মনে রাখতে হবে। বিদেশী ভাষায় কাজ চালিয়ে নিতে পারলেও, প্রধানত মাতৃভাষার মাধ্যমেই আমাদের চিন্তাশীলতা ও ভাব-উপলব্ধি গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে একটা গোপন, অদৃশ্য, মানসিক অনুবাদের প্রক্রিয়া যেন সর্বদাই চলতে থাকে। যাঁরা ইংরেজী মাতৃভাষার মত শেখেন নি অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিখেছেন—তাঁদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ একটি সাধারণ জীবনসত্য। অনুবাদের ভিতর দিয়ে এই যে অপরিহার্য যোগসাধন—একে আমরা বাস্তবজীবনে অস্বীকার করতে পারি না। তা ছাড়া স্বল্প শিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের যে ভাবের আদান প্রদান—তা প্রধানতঃ মাতৃভাষা বা অপর

সহজ ভারতীয় ভাষা নির্ভর। শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর ইংরেজী আশ্রিত সঞ্চিত বা আহরিত জ্ঞান পরিবেশন করতে গিয়ে যে পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন পরোক্ষভাবে—তাকে আমরা অনুবাদ ছাড়া আর কিই বা বলতে পারি ?

শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকার করে নিলেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিশ্বভাষা, বিশেষভাবে ইংরাজীভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। জাতীয় বিদ্যার সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যার প্রকৃত মিলনের মধ্যে-ই আমাদের চিত্তের মুক্তি নিহিত। ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা হেতু ভাষা হিসাবে ইংরেজী আমাদের ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষার পরই বিশেষ স্থান অধিকাব করে আছে। কোন গোঁড়া জাতীয়তাবাদীর পক্ষেও এ সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব। ইংরেজীর দুইশত বছরেব অপ্রতিহত প্রভাব হেতু ভারতীয় শিক্ষাধারায় প্রধান কাঠামোই গড়ে উঠেছে ইংরেজীকে ভিত্তি-করে। আমাদের শৈশবেও আমরা বাংলা ব্যতীত অন্য পাঠ্য পুস্তক ইংবেজীতেই দেখেছি। যে সব বিষয়ের উত্তরও ইংরেজীতেই লিখতে হ'ত। তার ফলে ইংরেজীর ভিত্তি ছিল দৃঢ়মূল। স্বাধীনতার পর অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে সন্দেহ নেই। তবুও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এখনও পঠন-পাঠন ইংরেজী নির্ভর। তার ফলে শিক্ষাভিত্তিক জ্ঞান ও ভাবের উপলব্ধির জন্য আমরা এখনও মানসিক প্রক্রিয়ার উপর অর্থাৎ অনুবাদের উপর নিভর করি। যতদিন না সম্পূর্ণ শিক্ষাধাবা মাতৃভাষা নির্ভর হচ্ছে—ততদিন ইংরেজী চর্চা ও তার বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব সমান ভাবেই বর্তমান থাকবে।

ভাষা শিক্ষায় অনুবাদ ও প্রত্যানুবাদ কেমন করে স্থান করে নিল, এদের তাৎপর্যই বা কি, এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। একটি ভাষার শিক্ষালাভে যে মানসিক সমৃদ্ধি আসে, অপর ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা থাকলে সেই পরিমাণে অনেক বেশী সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আমরা লাভ করতে পারি। সরাসরি ইংরেজীর চর্চা, এবং অর্জিত সেই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধন করতে পারি তবে তার দ্বারা আমরা উপকৃতই হব। অনুবাদ চর্চা আমাদের দুটি ভাষায় সম্যক অধিকার অর্জনের সুযোগ এনে দেয়। কোন মাতৃভাষা-অনুরাগী অনুরূপ দক্ষতা অর্জন করলে, মাতৃভাষায় উন্নতির জন্য তিনি তাঁর নৈপুণ্যকে অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। অনুবাদ সাহিত্য যে কোন দেশের পক্ষেই সম্পদ বিশেষ। তা ছাড়া বিশ্বসংস্কৃতির প্রকাশ ও সম্প্রসারণ ত এভাবেই হয়। সমৃদ্ধতম সংস্কৃত সাহিত্যের ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী অনুবাদের মাধ্যমেই তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যও প্রধানতঃ ইংরেজী থেকে অনূদিত অসংখ্য পুস্তকের প্রকাশনার দ্বারা অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

স্থির ভাবে চিন্তা করলে অনুবাদের আর একটি উজ্জ্বল দিকের কথা আমাদের মনে রাখতে হয়। মাতৃভাষা প্রীতি সকল সভ্যজাতির প্রধান জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আমাদেরও মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ আছে এবং অনেকেই কেবলমাত্র সেকারণেই তাঁদের জীবনের সকল শিক্ষালব্ধ ধনই মাতৃভাষার চরণে নিবেদন করেছেন। এটি অতীতেও

ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। বলা বাহুল্য, মাতৃভাষায় এই পুষ্টি সম্ভব হয়েছে তার কেবল নিজস্ব ভঙ্গীটুকু অবলম্বন করেই—তা নয়। ক্রমোন্নতির স্তরগুলিতে ইংরেজীর অনেকখানি দান করেছে। ইংরেজীর নিজস্ব গঠনরীতির প্রভাব যেমন আধুনিক বাংলার দেহে পড়েছে, তেমনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু সমৃদ্ধ ভাষায় শব্দসম্পদ আমাদের অভিধানের পুষ্টিসাধন করেছে। সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'আমাদের ইংরেজী শেখা' নামক পুস্তকে এই ভাষাপ্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আধুনিক বাংলা গদ্যের সাংগঠনিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—এর মধ্যে বিদেশী ভঙ্গী লক্ষ্যণীয় ভাবেই অনুকৃত হয়েছে।

অনুবাদের সময় বিদেশী ভাষার গঠন রীতির সরাসরি অনুসরণ অবশ্যই নিন্দনীয়। কারণ প্রত্যেক ভাষায় নিজস্বতা তার শব্দসন্নিবেশ কৌশল ও বাক্য গঠনরীতির এবং বাগ্‌ধারার উপর নির্ভরশীল। সে দিক থেকে দেখলে অনুবাদের মধ্যে ভাষার নিজস্বতা বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সামান্য উদারতার সঙ্গে বিবেচনা করলে এবং মাতৃভাষার পুষ্টির কথা মনে রাখলে একটা মধ্যপথ অবলম্বন করা একেবারে অসম্ভব নয়। একটি সহনশীল সীমা পর্যন্ত ভাষা-প্রভাবকে স্বীকার করলে ইংরেজীর কিছু ভঙ্গী, বৈশিষ্ট্য সহজেই বাংলায় গ্রহণ করা যায়। আমাদের দেশের যে সকল ইংরেজী-বীশ পণ্ডিত বাংলা ভাষায় কিছু অবদান রেখেছেন—তাঁদের লেখায় ইংরেজী প্রভাব যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

## ॥ অনুবাদের সমস্যা ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁরা শিক্ষাসংক্রান্ত রচনার ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের জটিলতার কথা বলেছেন একটি উদাহরণের সাহায্যে। 'Horse is a noble animal'—এই ইংরেজী বাক্যটির কোন সন্তোষজনক অনুবাদ সম্ভব নয়। কোন অনুবাদ করলেও তা আমাদের মনঃপূত হবে না। অনুবাদে সমস্যার উদ্ভব কেমন করে হতে পারে—এটি তার একটি চমৎকার নমুনা।

বিদ্যালয়ে আমরা অনুবাদ চর্চা করি বটে—কিন্তু তার জন্য যে একটি মানসিক পরিপক্কতার প্রয়োজন—সে কথা মনে রাখি না। অনুবাদে উভয় ভাষাতেই সমান দক্ষতার প্রয়োজন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বাস্তবে এই নিপুণতা দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলা মাতৃভাষা হলেও ছাত্রগণের ভাষাদর্শে আবশ্যকীয় মান কোথায়? বিদেশী ভাষা হওয়ায় ইংরেজীর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। প্রধান অসুবিধা এই যে, অধিগত ইংরেজীতে প্রয়োজন-সংখ্যক-শব্দপ্রাচুর্য্য ( working vocabulary ) থাকে না। তার ফলে অনুবাদে বাধার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ে বিশেষ করে শাব্দিক অনুবাদের উপর জোর দেওয়া হয় বলে ছাত্রদের স্বাধীন বাংলা রচনাও ক্রমে ক্রমে ইংরাজী বাগ্‌ভঙ্গীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ভাষায় যথার্থ জ্ঞান তার Idiom বা বাগ্‌ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। ইংরেজী চর্চার আধিক্য না থাকলে এই অধিকার জন্মায় না।

অনুবাদের আর একটি সমস্যা এই যে, কোন ক্ষেত্রে ঠিক কোন রীতি অবলম্বন করতে হবে তা অনেকেরই জানা থাকে না। বিজ্ঞান বিষয়ের অনুবাদ সর্বদাই যথাসম্ভব মূল ভাষানুগ হওয়া উচিত। সাহিত্যের ভাষা হবে যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে তার চারিত্র্যধর্মের অনুরূপ।

বিজ্ঞানবিষয়ক বচনার অনুবাদে হাতের কাছে পরিভাষা-কোষ না থাকার ফলে রচনার মানেব অবনতি-আর এক সমস্যা। উপযুক্ত পূর্ব-প্রস্তুতির দ্বারা এই সমস্যার দূরীকরণ সম্ভব। বিশেষ মতান্ধতা অনুবাদের আর একটি বড় সমস্যা।

## ॥ অনুবাদের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ॥

কোন জাতীয় বিষয়ের অনুবাদ করা হচ্ছে এবং সে অনুবাদ মূলতঃ কাদের জন্য—এ দুটো বিষয়ই অনুবাদের নীতি-নির্ধারক। কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেব অনুবাদে যে রীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হবে, সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদে সে তুলনায় ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ আবশ্যক। বিজ্ঞান গ্রন্থের ভাষার মধ্যে প্রতি শব্দই সুনির্বাচিত—কারণ সত্যের প্রকাশই তার প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব অনুবাদের ভাষাও সুচিন্তিত শব্দ সমবায়ে গঠিত হওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শব্দ তালিকার উপর নির্ভর করতে হবে—কারণ প্রযুক্ত শব্দের সর্বজনগ্রহণীয়তা থাকা চাই। যে কোন শ্রেণীর পল্লবগ্রাহিতা ও পরিবর্তনশীলতা সতর্কতার সঙ্গে বর্জনীয়। বর্তমান পরিবর্তিত পটভূমিকায় গণশিক্ষার যুগে ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুবাদ-প্রত্যানুবাদের গুণাগুণ বিচার করতে হবে। যে সব শব্দের প্রতিশব্দ উপযুক্ত পরিচিত লাভ করে নি, তার পাশে ইংরেজী পরিচিত শব্দটি লিখলে ভাব ও অর্থগ্রহণে সুবিধা হবে। ইংরেজ-সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পরবর্তী কালে বাংলার মধ্যে অসংখ্য ইংরেজী শব্দ খুব সহজেই এসে গেছে এবং এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'টেবিল' 'চেয়ার' এর মত 'টেষ্ট টিউব' ও 'গ্লোব' এর বিকল্প পারিভাষিক শব্দ থাকলেও অবিকৃত ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা দোষের নয়। এ বিষয়ে উন্নাসিকতা মঙ্গলজনক হতে পারে না। ঔদার্যের ফলেই আজ ইংরেজী পৃথিবীর সমৃদ্ধতম ভাষা—এটি অবিস্মরণীয় সত্য। শুধু শব্দই নয়, ইংরেজী বাক্য গঠনের বিশিষ্ট রীতি—যা ইতিমধ্যে আধুনিক বাংলায় ব্যবহার করা হয়েছে—সেই জাতীয় বাক্য আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার অনুবাদে বাক্যের গঠনগত জটিলতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সহজভাবে অর্থপ্রকাশ হবে বড় লক্ষ্য।

অনুবাদ ভাষা শিক্ষার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা কখনই ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের অনুবাদে ভাষাকে জীবনধর্মী ও দেশীয় সংস্কৃতির উপযোগী করে গঠন করতে হবে। কারণ, সাহিত্যের উৎস হচ্ছে জীবন এবং সেই জীবনের রসই আমরা সহজে গ্রহণে সমর্থ-যার সঙ্গে আমাদের মোটামুটি একটা পরিচয় আছে। আর বিজাতীয় জীবন ও সভ্যতাভিত্তিক সাহিত্যের রসগ্রহণের জন্য চাই বিশেষ সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও সাধনা। বেশী দূরে

যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হাতের কাছেই একটা চমৎকার উদাহরণ আছে। টীকা-সমন্বিত উপন্যাস যে কল্পনার বাইরে ও অবাঞ্ছিত সেটাই আমাদের প্রচলিত ধারণা। অথচ সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এর পাতায় পাতায় অসংখ্য পাদটীকা রয়েছে—যেগুলোর অস্তিত্ব ব্যতীত এই উপন্যাসের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। বীরভূমের বিশেষ আঞ্চলিক কথাবার্তা ও লোকগীতিগুলির অক্ষুণ্ণ-সৌন্দর্য্য অনুবাদ সম্ভব নয় বলেই তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়নি।

অপর একটি মতও আছে। মূল উপন্যাস বা ছোটগল্পের কথাটাই বেশী করে ভাবা হয় এবং অনুবাদেও তার মূল সুরটি বজায় রাখা হয়। অনুবাদের দুটো আদর্শই আমাদের সামনে বর্তমান আছে। কালিদাসের নাটকের প্রাচীন ধারার অনুবাদ আছে, আবার ডঃ অমূল্য চন্দ্র সেনের অনুবাদে আধুনিক বাংলা ব্যবহারও করা হয়েছে। ইবসনের Doll's House' এর একেবারে পরিবর্তিত পটভূমিসমন্বিত অনুবাদ আছে। 'ওমর খৈয়ামের' কত ধরণের অনুবাদ যে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। পাঠকসমাজ এর সবগুলি সমান আদরে গ্রহণ করেনি।

কবিতার অনুবাদ হয় না—এটাই সাধারণ মত। কারণ, কবিতাই বোধ করি মানুষের ভাবের জটিলতম প্রকাশ। কিন্তু, স্বয়ং কবি কতৃক গীতাঞ্জলির সার্থকতম ইংরেজী অনুবাদের উজ্জ্বলতম ইতিহাস আমাদের সামনেই আছে। এক্ষেত্রে এটাই সত্য এই যে, কবিতার অনুবাদও কবিকর্ম বলেই তার দায়িত্বভার একমাত্র কবিই বহন করতে পারেন। এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

এবার বিদ্যালয়ের অনুবাদ চর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক। সত্যি কথা বলতে কি, আদর্শবাদের দ্বারা চালিত হয়ে অনুবাদের প্রাথমিক চর্চার ক্ষেত্ররূপে বিদ্যালয়কে নির্বাচন করলেও এর সফলতা বিষয়ে খুব একটা আশাবাদী হওয়া চলে না। প্রধান কারণ, মনোভাব ও যোগ্যতার অভাব। তবে শিক্ষক নিষ্ঠাবান হলে কিছু ভাল ফল আমরা আংশিকভাবে আশা করতে পারি। প্রথম পর্যায়ে, অনুবাদের জন্য বেশ সহজ অনুচ্ছেদ নির্বাচন করা যেতে পারে। তারও পূর্বে অনেকে বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ব্যবহারের পক্ষপাতী। ফলপ্রাপ্তি দিয়েই একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বাগ্‌ধারা ব্যবহারে খুব সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

অনুবাদে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হলে খ্যাতনামা সাহিত্যিকের রচনায় সহজ অংশ নির্বাচিত হতে পারে। মূল রচনায় ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকছে কিনা—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অনুবাদে সাহায্যের জন্য কিছু টীকাও ব্যবহৃত হতে পারে। যেখানে শাব্দিক অনুবাদ অসম্ভব, সেখানে ভাবানুবাদ করতে হবে।

শুধু ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ নয়—বাংলা থেকেও ইংরেজী অনুবাদের ব্যবস্থা থাকা দরকার—তা অবশ্য আছেও। অনুবাদের ভাষার মধ্যে তার নিজস্বতা থাকছে কিনা সেটিই বেশী করে দেখতে হবে। অনুবাদের শেষে ইংরাজী অংশের কথা ভুলে গিয়ে শুধু মাত্র বাংলা অনুবাদটি পড়ে দেখতে হবে তা খাঁটি বাংলা হয়েছে কিনা, না জারজ ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভাষা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রতীকময় প্রকাশ। ভাষায় অন্তর্ভুক্ত বর্ণ ও শব্দসমষ্টি মানুষের নির্দিষ্ট জ্ঞান ও ভাবকে প্রকাশ ও পরিস্ফুট করে। উচ্চারিত শব্দ মানুষের ভাষাভিত্তিক ধ্বনিময় আত্মপ্রকাশ, আর লিখিত শব্দ তার চিত্ররূপ মাত্র। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সীমিত পরিবেশের মধ্যে আমরা যখন ভাবের আদানপ্রদান করি তখন আমরা উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যের সাহায্য নিই। কিন্তু যখন দূরবর্তী কোন ব্যক্তি বা ভবিষ্যতের মানুষের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করি তখনই লিপির মত চিত্রময় প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়টি যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য ধ্বনি ( sound ) বা চিত্রের একটি সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শরূপ স্থির করে নিই। কারণ, কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হলে আমরা আর তাকে সার্বজনীন ভাষা না বলে সাংকেতিক ভাষা বলি—যদিও ভাষায় সাধারণ ধর্ম প্রতীকদ্যোতকতা। ভাষাসৃষ্টির আদিকালে এমনি চিত্রলিপির প্রচলন ছিল, যার প্রাথমিক নিদর্শন প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নমুনার মধ্যে এখনও দেখা যায়। পরে মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা বর্জিত হয় এবং অন্যবিধ সংকেত চিত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবেই বিবিধ ভাষার অন্তর্গত লিপিমালা গড়ে ওঠে।

তাহলে লিপির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ একটি সহজ ধরণের প্রতীক ব্যবহার করে নিজের মনোভাব প্রকাশ করা এবং সেই মনোভাবকে দূরবর্তী বা পরবর্তী কালের মানুষের কাছে তুলে ধরা। বোধগম্যতাই যদি লিপির শেষ কথাই হয় তবে তার একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপের কথা মেনে নিতেই হবে এবং বাস্তবে সেটাই দেখা যায়। একটি ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ লিপির যে রূপ নির্দিষ্ট করেন সেটিই আদর্শ বলে গ্রাহ্য হয়। তবে একদিনেই সে কার্য সিদ্ধ হয় না। একটু বেশী সময় ধরে কিভাবে বর্ণের আকৃতি পরিবর্তিত হয় তার চমৎকার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থের প্রথম অংশে।

আধুনিক যুগে মুদ্রণ যন্ত্রের কল্যাণে বর্ণমালার নির্দিষ্ট রূপটি দেশের সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বিস্তৃতিলাভের সুযোগ থাকায় তার বিকৃতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে একটিমাত্র আদর্শ লিখন-রীতি অনুসরণ করা হলেও, সাধারণ লিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের লিখন ক্ষমতার গুরুতর পার্থক্য হেতু প্রভূত পার্থক্য লক্ষিত হয়। তার ফলে অধিকাংশ স্থলেই হাতের লেখা অপাঠ্য না হলেও দুষ্পাঠ্য হয়ে ওঠে। বাস্তব জীবনের এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিদ্যালয় জীবনে বিশেষভাবে লিখন চর্চার সুযোগ থাকা দরকার—যার ফলে লিখনের মান যথাসম্ভব উঁচু মানের হতে পারে। এ বিষয়ে ভাল ফল লাভ করতে গেলে কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের মনেই নয়—সমগ্র জাতীয়জীবনে একটি অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সুরুচিসম্পন্ন হস্তাক্ষরের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক মূল্য আছে এবং সমগ্রভাবে জাতীয় গৌরববৃদ্ধির

সহায়ক। তারাশঙ্কর ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় মূল পাণ্ডুলিপি দেখলেই এ সত্যটি ধরা পড়ে।

তাহলে, ভাল হাতের লেখা যদি সামগ্রীক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তবে তার লক্ষণগুলিও আমাদের জেনে নিতে হয়। সংক্ষেপে সূত্রাকারে এগুলি লিখিত হ'ল—

(১) স্পষ্টতা অর্থাৎ সহজে পাঠযোগ্যতা এর সবচেয়ে বড় গুণ। কারণ, লিখনের উদ্দেশ্যই হ'ল অপরের কাছে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন। লেখাব মধ্যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ছাপ যতই থাক না কেন তা যেন কোনক্রমেই দুষ্পাঠ্য হয়ে না ওঠে। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে শব্দমধ্যস্থ প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট করে লেখা প্রয়োজন।

(২) লেখাব মধ্যে অবশ্যই দ্রুততা থাকবে, কিন্তু আকৃতির বিশেষ বিপর্যয়সাধনের হাত থেকে লেখাকে বাঁচাতে হবে। এজন্য উপযুক্ত অনুশীলনের প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির লেখার অভ্যাসটি বজায় রাখা উচিত।

(৩) প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব লিপিবৈশিষ্ট্য আছে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণে ও ব্যঞ্জনবর্ণের যে আকারগত ধরণ-ধারণ আছে তা মেনে চলা সকলেরই কর্তব্য। মাত্রাযোগ বা মাত্রাহীনতা যে সব বর্ণের বৈশিষ্ট্য তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন একান্তই কাম্য। কারণ, খুব শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব (জনসন, রবীন্দ্রনাথ) ব্যতীত ভাষার কোনরূপ বিশৃঙ্খলাকে মেনে না নেওয়াই উচিত। তাছাড়া প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের লিখনরীতিব মধ্যে যে বৈচিত্র থাকে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে আদৌ আশা করা যায় না। অতএব তাকে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে। বাংলা বর্ণে মাত্রার ঔদাসীন্য সম্ভবত একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আশু প্রতিবিধান আবশ্যক।

(৪) শব্দের প্রতিটি বর্ণের মধ্যে এবং বাক্যের প্রতিটি শব্দের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রাখলেই লেখা মোটামুটি সুন্দর দেখায়। নিয়মটি তাই মেনে চলা আবশ্যক।

(৫) ভাল লেখার, আর একটি বড় গুণ এই যে, প্রতি অক্ষরই সমান উচ্চতাবিশিষ্ট হবে। আকৃতির সু-সমঞ্জস্ততার জন্যই লেখা সুন্দর দেখায়।

(৬) যতি চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা লেখায় অর্থপ্রতীতি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এটি উন্নতমানের লিখনরীতির পরিচায়ক। রামমোহনের গদ্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যের পার্থক্যের এটি একটি বড় কারণ।

(৭) উত্তম হস্তাক্ষর মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। অতএব স্পষ্ট ও সুন্দর হাতের লেখা ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক।

(৮) যতি চিহ্নের মত লেখায় অপর নিয়মকানুন—যথা, লেখায় বাঁদিকে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়ার রীতি, নতুন অনুচ্ছেদে ফাঁক রাখা ইত্যাদি মেনে চলতে হবে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, লিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া। বয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে লেখার কাজটি অবলীলাক্রমে সাধিত হয়। কিন্তু, একটু ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, এই কৃতিত্ব অর্জনের পিছনে বহুদিনের একাগ্রতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও শ্রম রয়েছে। লেখার মধ্যে মানসিক শৃঙ্খলার বিষয়টি বর্তমান। কারণ, লেখা মানুষের চিন্তাময় মনের বিজ্ঞানসম্মত চিত্রময় প্রকাশ। মানসিক চিন্তাকে আমরা শৃঙ্খলার সূত্রে বিন্যস্ত

করে লেখার মধ্যে রূপ দিই। এই কাজে খানিকটা সময় পাওয়া যায় বলে, মানুষের কথ্যভাষার তুলনায় লেখার মধ্যে অধিক শৃঙ্খলা ও চিন্তায় পরিপূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়।

লেখার আর একটি গোপন দিক আছে। বুদ্ধি, মন, দেহ—এ সবের সুষ্ঠু সমন্বয়ের ফলেই লেখার কাজটি সুসম্পন্ন হয়। মাংসপেশীর উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত লেখার কাজ ভালভাবে চলতে পারে না। তাই আমরা দেখি—শিশুরা লিখতে শেখার পর যে ধরণের লেখা লেখে তার মধ্যে ইপ্সিত সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না। লেখার একটা নির্দিষ্ট মানে পৌছাতে তাকে দীর্ঘ সময়ের সাধনায় ব্যাপৃত থাকতে হয়। এটি সম্পূর্ণ অভ্যাসের ব্যাপার। অব্যবহারের ফলে যেমন অনেক জিনিসই নষ্ট হয়ে যায়—তেমনি বয়স্কজীবনে লিখন চর্চার অভাবহেতু লেখার দক্ষতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পুনরায় অনুশীলনের দ্বারা এই ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হয়।

লিখনকে পেশীভিত্তিক মানসিক প্রক্রিয়া বলে মেনে নিলে, শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এর প্রয়োগ করতে পারি—তা ভেবে দেখতে হবে। শিশুর স্বাভাবিক চাঞ্চল্যহেতু দীর্ঘ সময়ের মানসিক সংযোগ সহজে সম্ভব হয় না। তা ছাড়া প্রথমদিকে পেশীগত দক্ষতা অর্জনেও সে সক্ষম হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে লিখন শিক্ষায় এ দুটোই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এদের কথা মনে রেখেই শিশুর লিখন বিষয়ে নীতি ও পথ নির্ধারণ করতে হবে। একেবারে গোড়ার দিকে শিশুকে অক্ষর বা বর্ণ লিখতে দেওয়া অনুচিত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে আমরা কিরূপ রীতি অনুসরণে করব তা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল—

(১) লিখন বিষয়ে প্রথম এবং প্রধান অবলম্বনীয় নীতি হ'ল শিশুকে যুগপৎ পঠন ও লিখন শিক্ষা দিতে হবে। পঠন ভাষার উচ্চারিত শব্দময় রূপ, আর লিখন তার চিত্রিত রূপ। তাই এ দুটির মধ্যে সাযুজ্য স্থাপন প্রয়োজন। যে বিষয়টি শিশু পড়ছে—সেটি সে লিখতেও চাইবে। শিশুর এই কর্মময় প্রকাশ খুবই স্বাভাবিক। গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক। এই শিক্ষানীতিতে ভাষাশিক্ষায় বাক্যক্রমিক ও শব্দক্রমিক পদ্ধতির ( Sentence Method ও Word Method ) প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিশু কোন খেলা বা কাজ সম্পন্ন করলে তার অভিজ্ঞতা শব্দ বা সহজ বাক্যে প্রকাশ করবে। একটু ভাল লিখতে শিখলে দিনলিপি ( Diary ) রাখার নিয়মও মেনে চলতে হয়। এটিও তার আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। নার্সারী স্তরে মন্তেসরী প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিগত জিনিসের গায়ে তার নামটি লেখা থাকে। শিশু তার নিজের নামটি চিনতে অর্থাৎ পড়তে শেখে এবং লিখতেও শেখে—এইভাবে তার পড়ার সূত্রপাত হয়।

(২) শিশুর মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা-পর্যায়ে সে লিখতে সক্ষম না হতেও পারে। এর একমাত্র কারণ হ'ল-সে মনের দিক থেকে যতখানি এগিয়ে যায়—পেশীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ঠিক ততখানিই পিছিয়ে থাকে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখন শিক্ষার সময় শিশুর নির্দিষ্ট বর্ণটি লিখতে না পারার ঘটনার মধ্যে অথবা অক্ষরটির

বিকৃতি সাধনের মধ্যে উক্ত সত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। প্রাচীন কালের অনুদার শিক্ষাধারায় তাই 'দাগা বুলান'ব ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তাতে যে উদ্দেশ্যসাধন হত না-তা নয়। তবে, এব দুটো কুফল লক্ষ্য করা যেত; প্রথমতঃ শিখতে সময় লাগত যথেষ্ট এবং দ্বিতীয়তঃ অক্ষমতা হেতু শিশুর আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটত—যার ফলে ভাল লেখার প্রতি বিতৃষ্ণাও দেখা দিত। আধুনিক পদ্ধতিতে শিশুকে যথাসময়ে নিপুণতা অর্জনে সাহায্য কবা হয়। শিশুকে কাগজ পেন্সিল বা স্লেট পেন্সিল বা নীচু বোর্ড ও চক দিয়ে খুশিমত হিজিবিজি বা দাগ কাটতে ( Scribbling ) দিতে হবে। এর ফলে শিশু যেমন স্বাধীনতাব স্বাদ পাবে—তেমনি চক বা পেন্সিল ধরার কৌশলটিও আয়ত্ত করবে। ইচ্ছামত বক্ররেখা অঙ্কনেব অভ্যাস গঠিত হলে তবেই শিশু সরল-বেখার নিয়ন্ত্রিত রূপটির বিষয় বুঝতে পারবে এবং ক্রমে অক্ষরের জটিল আকৃতিব রূপায়নে দক্ষ হয়ে উঠবে। কারণ, অক্ষরগুলি নিয়ন্ত্রিত রেখা ছাড়া আব কিছুই নয়—কোথাও বক্রবেখা আবার কোথাও বা সবলবেখা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে আমরা লেখার মধ্যে ব্যবহার কবে থাকি।

(৩) ঠিক পরবর্তী স্তবে শিশুকে দুরকমের উপকবণ সরবরাহ করতে হবে—(ক) বিভিন্ন জ্যামিতির আকৃতির নক্সা এবং (খ) কেবলমাত্র সীমাবেখাযুক্ত শিশুদের উপযোগী ছবি। আর্ট ক্রেয়নের সাহায্যে শিশু জ্যামিতিক নক্সাগুলি বিভিন্ন রঙ এ পূর্ণ করবে—এগুলিব কোনটি হবে ত্রিভুজ, কোনটি বৃত্ত বা চতুর্ভুজ বা অপর কোন চিত্তাকর্ষক নক্সা। আজকাল সাদা কালোয় ছাপা বিভিন্ন রকমের সীমারেখা সম্বলিত ছবি পাওয়া যায়। শিশু-পত্রিকাতে কেবলমাত্র কতকগুলি বিন্দু মুদ্রিত থাকে এবং আঁকাব নির্দেশসূচক সংখ্যাও দেওয়া থাকে। শিক্ষা-উপকরণ হিসাবে এই সব বিষয় উপযুক্তভাবে ব্যবহার কবলে শিশু যেমন ছবি আঁকার আনন্দ পাবে, তেমনি পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও অর্জন করবে। এই পদ্ধতি কিছুটা আয়ত্ত হলেই শিশুকে বড় বড় রঙীন অক্ষর ( আজকাল কাঠের তৈরী অক্ষর পাওয়া যায় ) দেওয়া যেতে পারে। সেগুলি সাজিয়ে ছোট ছোট শব্দ তৈরী করা যায় এবং সেই সকল শব্দই স্লেটে বা কাগজে বড় আকারে শিশুকে লিখতে বলা যায়। প্রয়োজন অনুসারে শিশুকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। ঠিক এই স্তরে শিশুকে বাংলা হরফেব মূল বৈশিষ্ট্য অনুসারী কিছু নক্সা আঁকতে বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সবটাই করতে হবে খেলার ছলে।

(৪) বাংলা বর্ণমালার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একেবারে প্রথম থেকেই শিশুকে অবহিত করতে হবে। কোন অক্ষরে মাত্রা আছে বা নেই অথবা যুক্তাক্ষরের বৈশিষ্ট্যও বুঝিয়ে দিতে হবে।

(ক) মাত্রা বর্জিত—এ ঐ ও ঔ ঙ ঋ ইত্যাদি।

(খ) মাত্রা যুক্ত—অ আ ক ম চ দ ইত্যাদি।

(গ) অর্ধ-মাত্রাযুক্ত—প গ থ প ইত্যাদি।

(ঘ) যুক্ত ব্যঞ্জনে রূপান্তর—এ>ত্র, ও>ত্ত ইত্যাদি।

(৫) প্রথম দিকে লাইন টানা কাগজে শিশুদের লিখতে দিলে ভাল হয়। তার ফলে অক্ষরগুলির সমানতা বজায় থাকবে।

(৬) অক্ষরসীমার উপরে যেমন ‘ি’ বা ‘ী’ ব্যবহৃত হয়, নীচে তেমনি ু বা ূ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এজন্য ইংরেজী লেখার উপযোগী কোন লেখার কাগজ ব্যবহার করলে ভাল হয়।

(৭) সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল লেখাই হবে শেষ লক্ষ্য।

ভাষা যে প্রতীকধর্মী ও চিত্রের গুণবিশিষ্ট সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একটি ভাষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতির জীবন অবলম্বন ক'রে ক্রমশঃ নানা পরিবর্তনের সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। ভাষার যাত্রাপথে চলার সময় তাই তার অঙ্গে নানা পরিবর্তনের রেখা চিহ্নিত হয়ে যায়। শব্দের অর্থের যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি তার দেহে অর্থাৎ বানান এবং তার উচ্চারণেও কালবিশেষে গভীর পরিবর্তনের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সহসা তার প্রাচীন রূপটি প্রত্যক্ষ করলে তাকে চিনে ওঠা কঠিন হয়। শব্দমধ্যে এই পরিবর্তন স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়কেই অবলম্বন ক'রে গড়ে ওঠে। কোন যুগে এই পরিবর্তন দ্রুত হয়, আবার কোন যুগে এই গতি বেশ মন্থর।

ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সব প্রভাব নানা কারণে সূচিত হয় এবং পরিবর্তনের ঐতিহাসিক রূপটি ফুটে ওঠে তাঁদেরই প্রচেষ্টার মধ্যে যাঁদের ভূমিকাও ঐতিহাসিক। ভাষার অন্তর্গত শব্দের বাহ্যিক রূপ অর্থাৎ তার বানান ও উচ্চারণ এই সব পরিবর্তন ও প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ে এবং শব্দ তার প্রাচীন রূপটি হারিয়ে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ও মর্যাদা লাভ করে। আমরা আগে কথা বলি, পরে লিখতে শিখি। ভাষার লিখিত রূপের চেয়ে কথিত রূপ অনেক প্রাচীন হওয়ায় প্রয়োগক্ষেত্রে ভাষার উচ্চারণ তার বানানকে প্রভাবিত করে। যেখানে উচ্চারণ ও বর্ণ যোজনার মধ্যে স্বভাবগত অমিল রয়েছে, সেখানে উচ্চারণ শুদ্ধ হলেও বানান বিভ্রাট ঘটে থাকে। ইংরেজী ভাষার ইতিহাস থেকে সামান্য তথ্য নেওয়া যেতে পারে। পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত Caxton সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং মুদ্রণের সময় তিনি পাণ্ডুলিপির বানান নিজের বিবেচনা ও জ্ঞানানুসারে অনেকখানি পরিবর্তন করতেন। তার ফলে ইংরেজী বানান বেশ আধুনিক রূপ লাভ করে। তারপর ঐ একই শতকের বিখ্যাত ব্যক্তি জিওফ্রে চসার (১৩৫০-১৪০০) ইংরেজী ভাষা ও রচনা পদ্ধতিতে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বানান সংস্কার ঘটে আদি আধুনিক যুগে ষোড়শ শতকে শেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) দ্বারা। আধুনিক যুগে তিনি বোধহয় সর্বাধিক সংখ্যক নতুন বানান ও নবগঠিত শব্দ বেশ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সেকালের মনোভাব অনুসারে ব্যাকরণের নিয়মের লঙ্ঘনও করা হয়েছিল লক্ষ্যণীয়ভাবে। তারপর আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষাকে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক রূপ দিলেন জনসন তাঁর যুগান্তকারী অভিধান Dictionary of the English Language প্রকাশ করে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে। আর আধুনিক যুগে এ বিষয়ে পৃথিবীখ্যাত কাজ হল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, অসংখ্য মানুষের দীর্ঘ ৭০ বছরের সাধনার ফলস্বরূপ 'A New English Dictionary on Historical Principles'. । যাই হোক,

জনসনের অভিধান ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে ভিত্তিস্থানীয় বলে গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গ তার মূল্য স্বীকার করলেন এইভাবে—"At once it became the standard work, for long the arbiter of English usage and the standard for English spelling.

যাই হোক এ প্রসঙ্গে প্রধান বক্তব্য এই যে, কোন ভাষার বানান গড়ে ওঠে যুগ যুগ ধরে। জনমানসের প্রতিফলন যেমন তার মধ্যে হয়—তেমন বহু মনীষীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ক্রমে তার একটা স্থায়ী, আধুনিক ও বিশুদ্ধরূপও গড়ে ওঠে। শব্দ ও বানানে কালক্রমে পরিবর্তন যে বেশ গুরুতর তা এই ছোট তালিকা থেকে সহজেই চোখে পড়বে :

| চতুর্দশ শতক | | আধুনিক যুগ |
|---|---|---|
| Heed | — | Head |
| Sterres | — | Stars |
| Hevene | — | Heaven |
| dar Seye | — | Dare Say |
| Hors | — | Horse |
| Lene | — | Lean |

ইংরেজীর মত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও সুদীর্ঘকাল ধরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডার এবং তার আঙ্গিকগত নানা বিষয় গড়ে উঠেছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে বাংলা ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস বিবৃত করার সময় সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি না করে এবং যথেষ্ট প্রাচীন ধারা থেকে উদাহরণ সংগ্রহ না করে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ থেকে বাংলা বানানের কিছু নমুনা দেওয়া গেল। এই ভাষা যখন ব্যবহার করা হয়েছে—তখনও ব্যাকরণ রচিত হলেও কোন বাংলা অভিধান প্রণীত হয়নি এবং বানানগুলির প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যায়—জনসনের পূর্ববর্তী ইংরেজীর মত বাংলাতেও একটা স্বেচ্ছাচার চলছিল এবং বাংলাকে আমরা যতই সংস্কৃত প্রভাবিত বলি না কেন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে অন্ততঃ বানানে ও বাক্যগঠনরীতিতে সে প্রভাবকে একটা বিশুদ্ধ রূপ দেবার কোন বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টা করা হয়নি। বানানগুলি যে রচনার অন্তর্ভুক্ত তার রচনাকাল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

| পুরাতন বানান | | আধুনিক বানান |
|---|---|---|
| সামিগ্রী | — | সামগ্রী |
| বিক্ষাত | — | বিখ্যাত |
| সম্পত্য | — | সম্পত্তি |
| নাভ | — | লাভ |
| দির্গ্যের | — | দিগের |

| পুরাতন বানান | | আধুনিক বানান |
|---|---|---|
| দেসাচার | — | দেশাচার |
| যাবদিয় | — | যাবতীয় |
| সিল্পকার | — | শিল্পকাব |
| জাহাব | — | যাহার |
| ডাণ্ডাইল | — | দাঁড়াইল ইত্যাদি |

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে বাংলা শব্দ তার বানান ও উচ্চারণ এবং বাক্যগঠন ভঙ্গীকে আধুনিক রূপ দেবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য কবা গেল। বাংলা বানান যে আজ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কারণ বহুবিধ। স্বল্প শিক্ষিত বা অধিক শিক্ষিত—সকলের কাছেই এটি একটা সমস্যা। প্রায় আধুনিক যুগে বাংলা বানান যে একটা নির্দিষ্ট রূপলাভ করেনি তার প্রধান কারণ দুটি—(১) জনসনের মত কোন বৈজ্ঞ'নিক দৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভার অভাব এবং (২) মুদ্রাযন্ত্রের অপ্রচলন। এর সঙ্গে শিক্ষা ব্যাপ্তির অভাব, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর শিথিলত' এবং গদ্যসাহিত্যের বিলম্বিত সূচনা প্রভৃতি কারণগুলিও বিবেচনাব যোগ্য। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস থেকে দেখা যায়—বিখ্যাত সাহিত্য কর্মগুলি অনুলিপিকারের সাহায্যেই জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করত। ভাষার কাব্যধর্মিতা আলোচনার বিষয় বলে গণ্য হলেও, রচনাব অপর কোন আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হত বলে জানা যায় না। তাছাড়া, মুদ্রাকর প্রমাদের মত অনুলিপিকাবেব ভ্রান্তিবশতঃ নানা বৈষম্য ও বিচ্যুতি মূল বচনার মধ্যে অনুপ্রবেশ কবত। সমালোচনার কোন মনোভাব না থাকায় সংস্কারের কোন প্রশ্ন উঠতো না। এভাবেই বানান ভুল এবং অন্যবিধ ভুল দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে চলে আসছে।

একালে শিক্ষার প্রসার এবং মুদ্রণ যন্ত্রের কল্যাণে পুস্তক সহজপ্রাপ্য হওয়ায় বানানের শুদ্ধ রূপটি সকলের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে, সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সামগ্রীক প্রভাবহেতু, ভাষার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিক্ষিত সমাজে একটা সচেতন মনোভাবও দেখা দিয়েছে। বাংলা বানানের জটিলতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার অশুদ্ধ রূপ তাই আজ সকলের কাছে সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে। তাই তার প্রতিকারের কথাও আজ ভাবতে হচ্ছে।

বাংলা বানান সমস্যার সমাধান করতে গেলে ভাষার ইতিহাসের আলোচিত সত্য ও তথ্যগুলিকে মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ, গতিশীলতা ও পরিবর্তনময়তা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে, আমরা যখন তার একটা স্থায়ী রূপ দিতে চাই তখনই পরোক্ষ প্রতিকূল শক্তি হিসাবে এগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আদর্শের পাশাপাশি তাকে অস্বীকারের আদর্শও বর্তমান থাকে। তাই বানান ভুলের প্রতিকারে একদিকে থাকবে আদর্শনিষ্ঠা এবং অপর দিকে থাকবে সমস্যাভিত্তিক বাস্তব চেতনা।

**বানান ভুলের কারণ ঃ—**

বানান ভুলের সম্ভাব্য কারণগুলো এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এই আলোচনা থেকেই এই সমস্যা সমাধানের পথও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(১) **জাতীয় ঔদাসীন্য**—বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষায় আমাদের সকলেরই একটা অনায়াস-পটুত্ব আছে। প্রাচীনকালের ধর্মাদর্শের অনুসরণে বাংলা কাব্যের ভাষা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সাহিত্যিকের হাতে যে ভাবে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল সে নিপুণতা ও ঐকান্তিকতার কিছুমাত্র অংশ পরবর্তী জীবনধারার মধ্যে সঞ্চারিত হলে বাংলা ভাষার আধুনিক রূপায়ণের জন্য উনবিংশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাষানিষ্ঠা তথা আঙ্গিকনিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক অবহেলার সম্মুখীন হয়েছিল সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতকে। তাই কাজের ভাষা হিসাবে বাংলা ঠিকমত গড়ে উঠতেই পারেনি। এখানে সেখানে যা একটু বাংলা লেখা হত—তা ছিল নিতান্তই গতানুগতিক এবং পত্রলিখনের গদ্য ছিল একেবারে সংস্কৃতানুসারী। এমনকি উনবিংশ শতক—যাকে আমরা জাতীয় জাগরণের কাল বলে গৌরব বোধ করি—সেই ইউরোপ থেকে ধার করা জাতীয়তাবাদের দিনে বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করেছিলেন আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ-যার একপ্রান্তে ছিলেন ইংরেজীধারায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং অপরদিকে ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও সত্যোদ্ঘাটনের পর আর কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—যার গর্ভ থেকে আধুনিক বাংলা ভাষা জন্মলাভ করেছে সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণও বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য এখানে সামান্য দুটি উদাহরণ ব্যবহার করব। কি ভাবে বাংলা বানানের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান হয়েছে—তা যে কোন সতর্ক পাঠকের চোখে সহজেই পড়বে। একটি উদ্ধৃতি অবশ্য সামান্য পূর্বের।

(ক) "যে দিনে য়েশু ঘর হইতে যাইয়া বসিলেন সমুদ্রের তিরে। এবং হেন বড় মানব্য একত্তর হইল… …ও সকল মানব্য তটের উপর ডাণ্ডাইল।……তাহার সিকড় না হওনের কারণ সুস্কভাব হইয়া গেল।……যাহার শুনিবার কন্ন আছে সে শুনুক।"

(খ) "একটা ছিন্ন পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল। অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন, পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি।"

—রাম রাম বসু।

এই ধারা আধুনিক যুগেও প্রসারিত এবং অতি আধুনিক কালে প্রধানতঃ ছাত্র সমাজের মধ্যে এবং এক জাতীয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে বানানে নিয়মহীনতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এমনকি কিছু সংখ্যক শিক্ষকও এই ধারণা পোষণ করেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত ইতিহাস বা ভূগোলের মত বিষয়ের উত্তরপত্রে অশুদ্ধ

বানান ব্যবহার খুব একটা দোষের নয়। তাছাড়া, একথা সত্য এই যে—এক শ্রেণীর ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালী বাংলা না জানাকে ( এবং সম্ভবতঃ ভুল বাংলা জানাকে ) আত্ম-শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। যেহেতু, নতুন বাংলা শব্দ গঠনে এবং বানানে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঐতিহাসিক সাহিত্যিক প্রতিভার সুযোগ নিয়েছিলেন, সেজন্য অনেক অক্ষম ব্যক্তিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান। তার ফল কি হয়েছে বা আমারা সবাই জানি। আজকাল পাঠ্যপুস্তক, পত্র পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং অন্যবিধ পুস্তকেও লেখকের খুশি অনুসারে বানান ব্যবহার করতে দেখা যায়। বাংলাভাষায় আদর্শ অভিধানের সংখ্যা এখন নিতান্ত স্বল্প নয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের নমুনাও আমাদের হাতের কাছেই আছে। তা সত্বেও, অনুকূল ফল যে পাওয়া যাচ্ছে তা নয়। অতএব, এই সিদ্ধান্ত করা অবশ্যই অন্যায় নয় যে—এক সর্বব্যাপী ঔদাসীন্যের ফলেই বাংলা বানান সমস্যা আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

**(২) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা—**

বাংলা ভাষাভিজ্ঞ কোন জাপানী শিক্ষা প্রেমিকের সাম্প্রতিক (এপ্রিল, ১৯৭৭) একটি প্রবন্ধ থেকে জানা গেল যে বর্তমানে জাপানে বাংলা শিক্ষাদানেব সীমিত প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' ও 'দ্বিতীয় ভাগ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই পাঠ্যপুস্তকের বয়স একশত বৎসবেরও বেশী। তাহলে, কোনগুণে এটি এখনও ভাষাশিক্ষাব প্রথম সোপান? তাঁর সময়ে মানসিক চাহিদার কথা প্রায় বিশেষ চিন্তা করা হত না এবং তার গুরুত্ব দেওয়া হত না, তবুও এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি শব্দ ও পাঠসন্নিবেশে এমন এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বীতি প্রয়োগ করেছিলেন যার ফলে এই পুস্তকের ভিত্তিতে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন—তাঁদের বানান ভুল হয় না বললেই চলে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে সামান্য কঠিন এবং পরিবেশন রীতি নীরস হলেও ( রঙীন চিত্র সমন্বিত নয়, মুদ্রণ ও কাগজও ভাল নয় ) এ দুটি পুস্তকের প্রয়োজন আজও নিঃশেষ হয়নি। 'সহজ পাঠেব' মান ত যথেষ্ট উন্নত।

সেকালেব শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক মনস্তত্ত্বভিত্তিক না হলেও, বানান মুখস্থ করাব উপর এমন একটি গুরুত্ব দেওয়া হ'ত বলেই, একবার আয়ত্ত করা বানান সমস্ত জীবনে আর ভুলে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতানুগ ভাষা ও রচনারীতি ব্যবহার কবায় ছাত্রদের তৎসম শব্দের জটিল বানান ও তার প্রয়োগ শেখা সম্ভব ছিল। এই ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে আধুনিক শিক্ষাধারা অনুসাবী পাঠ্যপুস্তকের। আধুনিক যুগে চিন্তাধারার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরিবেশন রীতি অনেক উন্নত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তবুও কোথাও কোথাও গুরুতর ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। একটি উদাহরণ দিতে চাই। সরকার প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক 'কিশলয়-এ' এক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের 'সাধু' রচনা চলিতে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে পরিবেশন করা হয়েছে। এর ফলে বইটি নাকি সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে একই ছাত্রকে

হয়ত 'সাধুভাষায়' রচিত অন্য পুস্তক পাঠ করতে হচ্ছে। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ না থাকলেও প্রশ্ন করা যায় অনুরূপ পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারছি কি, না আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে ?

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অপর পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত ও পরিবেশিত। আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু, এইসব পুস্তকের পঠন-পাঠনে যে রীতি অনুসৃত হওয়া উচিত—বাস্তবে তা হয় না। তার ফলে প্রস্তুতিও ব্যর্থ হয়ে যায়। বানানে যে ধরণের নিবিড় চর্চার সুযোগ থাকলে তা স্থায়িত্ব সরকারে আয়ত্ত করা যায়—তা আমাদের বিদ্যালয়ে' নেই বললেই হয়। ভাষা যদি মনোভাবের চিত্ররূপ হয় তার উপস্থাপনও হবে যথাযথ। অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই আরও বেশী শ্রমসাধ্য লিখনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। বোর্ডের কাজ হবে বেশী এবং ছাত্রদের লিখনের অভ্যাস বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া অস্বীকার করায় উপায় নেই—যে বানান Irregular অর্থাৎ ধ্বনিবিজ্ঞানের সূত্রানুসারী নয়—তা মুখস্থ না করে উপায় নেই। কঠিন ইংরেজী বানানের ক্ষেত্রে আমরা সমগ্র শব্দটির চিত্ররূপ মনে রাখি—সেই সঙ্গে সেটি মুখস্থ রাখার চেষ্টা করি এবং ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা তার যথার্থতা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করি।

মনোবিজ্ঞানী থর্ণডাইকের শিক্ষণ সূত্রে ( Laws of learning ) দেখা যাচ্ছে অধীত বিষয়কে স্থায়ীভাবে মনে রাখতে হলে কিছু সময় অন্তর তার অনুশীলন অবশ্যই প্রয়োজন। সপ্তাহে একদিন পুরাতন পাঠের চর্চার সুযোগ থাকলে কঠিন বানানগুলো মন থেকে মুছে যেতে পারবে না।

পাঠ্যপুস্তকের প্রতি পাঠে নতুন কিছু শব্দ পরিবেশন করার রীতি আছে। গল্প বা প্রবন্ধের মধ্যে শব্দগুলোকে সন্নিবেশ করে ছাত্রদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করা হয়। নিম্নশ্রেণীগুলোতে এই পদ্ধতির আরও সুষ্ঠু ও ব্যাপক প্রয়োগ দরকার। একটি শব্দকে যথাসম্ভব ছাত্রদের জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার বিষয় করে তুলতে হবে। তাছাড়া শব্দগঠনের দিকটি বোধ হয় আমাদের বিদ্যালয়ে একটু বেশী মাত্রায় অবহেলিত হয়। একই শব্দকে বিভিন্ন বাক্য মধ্যে ব্যবহার করা বা একটি শব্দের সাহায্যে নতুন শব্দ গঠন ক'রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা বা সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের বাপক প্রয়োগের দ্বারা যথার্থ বানানটি মনে রাখতে সাহায্য করা প্রভৃতি প্রয়োজনমত অনুশীলন করা হয় না।

ব্যাকরণ ও অভিধান—যার সাহায্যে সার্থকভাবে বিশুদ্ধ বানান শিক্ষা দেওয়া যায়—সেগুলোর সার্থক ব্যবহার আমাদের দেশে কখনও হয় না। ফলে ব্যাকরণের সঙ্গে ব্যবহারিক ভাষার কোন যোগসূত্রই গড়ে ওঠে না—বা শেষ পযন্ত যা পরীক্ষার একটা উপাদানই থেকে যায়। মূল বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত করে না পড়ালে, আজকের দিনে পৃথক ভাবে ব্যাকরণ চর্চার কোন সার্থকতা নেই। কারণ, রসায়ণ শাস্ত্রের সূত্রের মত ব্যাকরণের সূত্রও অল্পদিনেই মন থেকে মুছে যায়। কোন ছাত্রের ব্যাকরণের কোন সূত্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও যদি শুদ্ধরূপে ভাষা প্রয়োগ করতে

সক্ষম হয়—তবে তাকে যোগ্য বলে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা থাকা উচিত নয়। খুবই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোন বিদ্যালয়েই ঠিক আনুষ্ঠানিক বা কার্য্যকরীরূপে অভিধান দেখার কৌশল শেখান হয় না। অথচ, অভিধানই বিশুদ্ধ ভাষারূপের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ছাত্রকে অভিধান মনোভাবাপন্ন করে তোলাকে ভাষাশিক্ষার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বলে গণ্য করতে হবে।

## (৩) ব্যাকরণের জটিলতা

ভাষার চলমানতাহেতু ভাষার মধ্যে বিপুল পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়, অথচ সেই তুলনায় ব্যাকরণ পিছিয়ে পড়ে অর্থাৎ পরিবর্তনের সূত্র ধরে নতুন সূত্র বা বিচারধারা সংযোজিত হয় না। তার ফলে বানানের উপর তার একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঠিক কোন বাংলা বানানটি ব্যবহার করব—তা নিয়ে বেশ দ্বিধায় পড়তে হয় অনেককেই। এক্ষেত্রে অনেকে আবার ধ্বনিতাত্ত্বিক রীতি অনুসরণের পক্ষপাতী।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে তৎসম, তদ্ভব, দেশী-বিদেশী ইত্যাদি শব্দ থাকায় বানানে জটিলতা দেখা দেয়। তৎসম শব্দে যে নিয়ম পালিত হয় বিদেশী শব্দের বানানে সে রীতি অনুসৃত হয় না। তার ফলে বানান ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।

বাংলা বর্ণমালায় এমন অনেক বর্ণ আছে যেগুলো সমধ্বনি বিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন শব্দে ব্যবহৃত। এদের যে উচ্চারণগত পার্থক্য আছে তা নয়। তাহলে পৃথক বর্ণ বর্ণমালার মধ্যে রাখার সার্থকতা কোথায়? 'ন' ও 'ণ'—এ দুটির ব্যবহারিক পার্থক্য কোথায়? 'স' 'ষ' 'শ' এর পারস্পরিক তারতম্য সামান্যই মেনে চলা হয়। তৎসমের 'য' তদ্ভব শব্দে কেন এবং কিভাবে 'জ' এ পরিণত হয় তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই ও যথা কার্য্য—কাজ। এখানে প্রাকৃত ভাষার রূপান্তরের (কজ্জ) কথাটা মনে হলেও উচ্চারণে কোন ধ্বনিগত তারতম্য নেই। সন্ধি ও সমাসের নিয়মের জটিলতাও বাংলা বানানকে আরও কঠিন করে তুলেছে। খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নিয়মগুলো মনে রেখে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন।

## (৪) আঞ্চলিক প্রভাব

একই বাংলাভাষার অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন রূপ (Dialect) রয়েছে। শব্দের উচ্চারণ ও রূপবিপর্যয় দুইই আঞ্চলিকতার ফল। 'অপিনিহিতি' 'অভিশ্রুতি' 'বিপর্যয়' 'সমীভবন' ইত্যাদি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উচ্চারণগত বৈচিত্রের ফলেই সাধিত হয়। বাংলা শিক্ষকের উচ্চারণে যতদূর সম্ভব আদর্শ কথ্য বাংলার ধ্বনি-রূপের অনুসরণই কাম্য। শিক্ষক দেশের যে অঞ্চল থেকেই আসুন না কেন—তাঁকে শ্রেণীকক্ষে সর্বজন-গ্রাহ্য আদর্শ ভাষায় পড়াতে হবে।

## (৫) বিখ্যাত সাহিত্যিক, সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রভাব—

রবীন্দ্রনাথ যেসব বানান ব্যবহার করেছেন—অনেকেই সে সব বানান বা তার অনুরূপ বানান ব্যবহারে উৎসুক হন। এর ফলে একই শব্দের বিবিধ বানান প্রচলিত

হয়। সম্পাদকীয়তে 'যুগান্তর' পত্রিকা চলিত বাংলা এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সাধু বাংলা ব্যবহার করেন। এর ফলে বিভ্রান্তি আসে। আধুনিক পত্রপত্রিকা 'ফনেটিক' বানানের পক্ষপাতী। কিন্তু, তা কতদূর যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখতে হবে।

**বানান ভুল দূরীকরণে পালনীয় নীতিগুলি এখানে সূত্রাকারে উপস্থাপিত হ'ল :—**

(১) বাংলাভাষার প্রতি জাতীয় মমত্ববোধ সৃষ্টি করতে হলে তাব বিশুদ্ধি রক্ষা যে জাতীয় কর্তব্য—এ বোধের উন্মেষ ও প্রয়োগ আবশ্যক।

(২) ভাষা ব্যবহারে উদারনীতির স্থান থাকলেও স্থিতিশীল ঐতিহ্যের মূল্য সর্বাধিক। বানানে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রয়োগ না করে ভাষাভিত্তিক নির্দেশিত পথ অর্থাৎ ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হবে।

(৩) প্রয়োজন হলে, বাংলা ব্যাকরণ ও বর্ণমালার সংস্কারসাধন করতে হবে।

(৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের নিয়ম মেনে চললে খুবই ভাল ফল পাওয়া যাবে। বিদেশী শব্দের বানানে রাজশেখর বসুর নির্দেশ মেনে চলা যুক্তিযুক্ত।

(৫) একই ধরণের ভাষা ( চলিত ) সমন্বিত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে মনোবিজ্ঞানের সত্যের প্রয়োগ প্রয়োজন।

(৬) বাংলা শিক্ষকের আরও পরিশ্রমী হয়ে শ্রুতিলিখন এবং শব্দ ও বানান চর্চার জন্য সময় বেশী ব্যয় করতে হবে।

(৭) কোন শিক্ষকের ত্রুটি থাকলে অনুশীলনের সাহায্যে তার দূরীকরণ আবশ্যক।

(৮) ছাত্রগণের শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

(৯) অশুদ্ধ বানান শুদ্ধ করতে দেওয়ার পদ্ধতি অবশ্যই বর্জনীয়।

(১০) শব্দ তৈরীর খেলা ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তন করলে খুব ভাল ফল আশা করা যায়।

আধুনিক যুগে সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের বাস্তব জীবনে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার মানসিক পরিবর্তনও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে নব নব আবিষ্কারের সুফল মানুষ ভোগ করছে এবং সেই দিক থেকে দেখলে বলা যায় মানুষের অস্তিত্বের পটভূমি এই যে পৃথিবী তার আয়তনও আজ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনাকাঙ্খা ক্রমবর্ধমান এবং সভ্যতার বিষয়গুলির পারস্পরিক আদানপ্রদানও আজ অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। এক দেশের মানুষ কিভাবে চিন্তা করছে—তা জানার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকি। এই সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা এক দেশের মানুষকে অপর দেশের মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এক জাতির সাহিত্যের ধারা তাই অপর জাতির মানস-জীবনের খাতে স্বচ্ছন্দে প্রবহমান। আমরা যে নিজের দেশের সাহিত্য-পাঠের মধ্যেই আনন্দ পাই—তা নয়, বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদনে আমরা সমান আগ্রহী।

জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য যেমন বাস্তব জীবনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—তেমনি তার কর্মসাধনা ও জীবনপ্রস্তুতিও এর দ্বারা সমভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও ধারার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। আজকের দিনের জীবনের প্রসারতার স্বাভাবিকতায় তাই আমরা শিক্ষাব ধারাকেও বহুমুখী করে তুলতে চাইছি। কেবলমাত্র পরীক্ষা-সফলতাকেই তাই প্রধান বলে মনে না ক'রে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যসাধন ক'রে আমরা শিক্ষার্থীর সর্বতোমুখী বিকাশের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছি। বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর মধ্যে যে সাহিত্য ও ভাষা চর্চার সুযোগ আছে—তাকে ত আমরা আবশ্যিক বলে মনে করছি, পরন্তু এর সম্পূরক ব্যবস্থা হিসাবে সাহিত্য অনুশীলনকে ব্যাপকতর করে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলির সঙ্গে তার একটা যোগসাধনও করতে চাইছি। এইভাবে বিদ্যালয়ে সাহিত্যচর্চা আরও বিস্তৃত ও গভীর হয়ে উঠছে এবং উত্তরজীবনে শিক্ষার্থী যাতে আরও বেশী পরিমাণে সাহিত্য অনুরাগী হয়ে ওঠে, তার জন্যও একটি অনুকূল বাতাবরণের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আজকের দিনে পাঠ্যক্রমের বাইরে সাহিত্য-অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

বিদ্যালয়ে সাহিত্য অনুশীলন কয়েকটি বিষয়কে অবলম্বন করে হতে পারে। যথা—(১) পাঠ্যপুস্তক (২) দেওয়াল পত্রিকা (৩) বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা (৪) নাট্য রূপান্তর ও অভিনয় (৫) পাঠচক্র (৬) বিতর্ক সভা (৭) সাহিত্য-সভা (৮) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (৯) সাহিত্য প্রতিযোগিতা (১০) পাঠাগার-পত্রপত্রিকা। প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**(১) পাঠ্যপুস্তক** :—আমরা সাহিত্য অনুশীলন করি পরীক্ষার চাহিদার কথা ভেবেই। শিক্ষার চরম লক্ষ্যের চেয়ে পরীক্ষার চাহিদাই ছাত্রদের বেশী করে প্রভাবিত

করে থাকে। এই ব্যবস্থা মাতৃভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের বাধাস্বরূপ। মাতৃভাষার সমগ্র রূপটি প্রথম থেকেই শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা যদি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে তা এমনভাবে রচনা করতে হবে যে, সে তা পাঠের দ্বারা শিশুরা রসের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। শিশুদের মনের উপর পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত বিষয়ের প্রভাব আছে। সুতরাং খুব সতর্কতার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা উচিত। এমন কোন বিষয় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত করা উচিত নয় যা শিশুর মনের সাধারণ বিকাশের পরিপন্থী। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার একটি বিশেষ উপকরণ। এগুলি এমন হবে যাতে শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটতে পারে। মোটকথা বিষয়বস্তুর বর্ণনায় ও নির্বাচনে পাঠ্যপুস্তক যেন শিশুর মনোরঞ্জক হয়।

### (২) দেওয়াল পত্রিকা—

আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বহু পূর্ব থেকেই দেওয়াল পত্রিকাকে ভিত্তি করে কিশোর শিক্ষার্থীরা সাহিত্যচর্চা করে আসছে। তাই এটি তরুণ মনের সাংস্কৃতিক প্রকাশের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সমগ্রভাবে বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাত্র পত্রিকা থাকতে পারে—যদি শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী না হয়। তবে অধিক ছাত্র বিশিষ্ট বৃহদায়তন বিদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য পৃথক প্রাচীর পত্র থাকলে একই সময়ে অধিক সংখ্যক ছাত্র লেখায় অংশ নিতে পারে। প্রাচীর পত্র পরিচালনার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকসহ একটি পৃথক পরিচালকগোষ্ঠী থাকবে। এই পরিচালক দলের কাজ হবে রচনা আহ্বান, উপযুক্ত রচনা প্রকাশের জন্য নির্বাচন, পত্রিকার যথা সময়ে প্রকাশ ইত্যাদি। সাহিত্যের প্রতি প্রবল ঝোঁক আছে এবং সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতাও আছে এমন শিক্ষক ও ছাত্রই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। রচনা সংগ্রহের পর নির্বাচনে পক্ষপাত প্রদর্শন না করে, রচনার মানকেই অধিক মূল্য দিতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি উপযুক্ত দৃষ্টি রাখলে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে। প্রাচীরপত্রের লিখন ও অলঙ্করণে অবশ্যই সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দেওয়াল পত্রিকার জন্য রচনা নির্বাচনের সময় কয়েকটি নীতি মেনে চলা আবশ্যক। আমরা বর্তমানে যে শিক্ষানীতির অনুসরণ করি, তার মধ্যে একটা সার্বজনীনতা আছে অর্থাৎ আদর্শের দিক দিয়ে সকলের জীবনচারণের প্রতি একটা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মনোভাব বর্তমান। অতএব, কোন রচনার মধ্যে এমনভাব থাকা ঠিক নয় যা কোন ধর্মাদর্শ বা সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার মনোভাব প্রকাশক। রাজনৈতিক মতাদর্শ বিষয়েও সমভাব অবলম্বন করা উচিত অর্থাৎ কিছু লেখা অনিবার্য হলেও পক্ষপাতহীনভাবে মত প্রকাশ করতে হবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার আবিষ্কার ও বিকাশ সাধনে তৎপর হওয়াই হবে এই পত্রিকার প্রধান কাজ।

### (৩) বিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বিদ্যালয় পত্রিকার বার্ষিক প্রকাশ ছাত্রদের সারা বৎসরের সাহিত্য-চর্চার একটা সামগ্রীক সংহত ফল। সাধারণ প্রাচীরপত্র অমুদ্রিত, কিন্তু বার্ষিক পত্রিকা মুদ্রিত।

সাধারণ দেওয়াল পত্রিকা কেবলমাত্র একটি বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সাহিত্য-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, কিন্তু বার্ষিক পত্রিকা একটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য-চর্চার প্রতিফলন এবং সেই উদ্দেশ্যে অপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা অন্যত্র বিতরিত।

অধিকাংশ উচ্চমানের বিদ্যালয়েই এমন একটি পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য আছে এবং সেজন্য ছাত্রদের কাছ থেকে প্রকাশ-ব্যয়ও সংগ্রহ করা হয়। এই জাতীয় পত্রিকা বাইরেও প্রচারলাভ করে এবং বিদ্যালয়ের সম্মানের প্রশ্নটিও এব সঙ্গে জড়িত খুব সঙ্গত কারণেই। তাই বার্ষিক পত্রিকার রচনা নির্বাচন ও প্রকাশনার দায়িত্ব যথেষ্ট বেশী প্রভূত সতর্কতার সঙ্গে রচনা নির্বাচন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বেশ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখার আগ্রহ সব ছাত্র-ছাত্রীরই অপরিসীম। তাই পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে সম্পাদক-দপ্তরে রচনার প্রাচুর্য দেখা দিতেই পারে। অতএব সম্পাদকমণ্ডলীকে বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে সম্পাদনার কাজটি করতে হবে। তবে, সব দিক চিন্তা করে বলা যায়, প্রধানতঃ রচনার মানের দিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে মুদ্রণ ব্যয়-বহনের সামর্থ্য থাকলে, উৎসাহদানের জন্য কিছু সামান্য নিম্ন মানের রচনাও প্রকাশ করা যেতে পারে। তাছাড়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীর রচনা যে সর্বদা আশানুরূপ উন্নত মানের হবেই এমন আশা করা চলে না।

সারা বছর ধরে বিভিন্ন সংখ্যার দেওয়াল পত্রিকার মধ্যে যে সব রচনা প্রকাশিত হবে—সেগুলোর মধ্য থেকেই বার্ষিক সংখ্যার জন্য রচনা নির্বাচন শ্রেয়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ সংখ্যাগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ প্রয়োজন। সম্পাদকমণ্ডলী তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য পূর্ব হ'তেই ভাল রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করে রাখবেন বা করতে থাকবেন। অবশেষে চূড়ান্ত নির্বাচনের পর রচনাগুলি মুদ্রণের জন্য যথাস্থানে পাঠান যেতে পারে। আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেক সময়ে দেখা যায়—প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক-সম্পাদকের যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরোধ সত্ত্বেও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ পত্রিকায় লেখকরূপে অংশগ্রহণে ও আত্মপ্রকাশে উৎসাহবোধ করছেন না। ফলে সমস্ত বিষয়টি ছাত্রগণের কাছে বড়ই নিরুৎসাহজনক হয়ে পড়ে। এ কথা মনে রেখেই শিক্ষকগণ তাঁদের সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে বার্ষিক সংখ্যায় লেখা দেবেন বলে আশা করা যায়। তাঁদের সুচিন্তিত রচনা একদিকে যেমন বিদ্যালয় পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করে, অপরদিকে তেমনি ছাত্রদের কাছেও বিষয়টি উৎসাহজনক হয়ে ওঠে। অনেক বিষয় আছে, যেগুলি জ্ঞাতব্য, অথচ শ্রেণীকক্ষে নানাকারণে সেগুলির আলোচনা কাম্য নয় বা তার সুযোগ পাওয়া যায় না। এইরকম অবস্থায়, তাঁদের জ্ঞানের অতিরিক্ত অংশটুকু পত্রিকার জন্য লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে তাকে তাঁরা রূপায়িত করতে পারেন। প্রয়োজন ও সম্ভাবনা অনুসারে বার্ষিক পত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলা—দুইই শ্রেণীর রচনাই সংযোজন করা যেতে পারে।

**(৪) নাট্য-রূপান্তর ও অভিনয়—**

বিদ্যালয়ে সাহিত্য চর্চার নানা দিক ও পথ বিদ্যমান। আমাদের পক্ষে যা করণীয়—

তা হ'ল কিছু অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করে এই সব সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করা। আমরা জানি, ইতিহাস পাঠদানের একটি আধুনিক পদ্ধতি হ'ল, ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে নাটকে রূপান্তরিত করে ছাত্রদের সাহায্যেই তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা। এই অভিনয়ে ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করলেও প্রধান ভূমিকা থাকে ইতিহাস-শিক্ষকের। আমরা যে নাট্যরূপান্তরের কথা এখানে বলতে চাই, তার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক হবেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। বাংলা পাঠ্য-পুস্তকে এমন অনেক অংশ থাকে যাকে নাটকে রূপান্তরকরণ সম্ভব। নাট্যগুণান্বিত কোন ছোটগল্প বা উপন্যাসের অংশবিশেষ অথবা কোন কাহিনীমূলক কবিতা নির্বাচন ক'রে তাকে উপযুক্ত ছাত্রদের দ্বারা নাটকে পরিবর্তিত করাতে হবে। নাট্য রূপান্তর যথাযথ হচ্ছে কিনা তা দেখার ভার থাকবে বাংলা-শিক্ষকের উপর। প্রয়োজন হলে তিনি ছাত্রদের কাছে নাটকের অংশবিশেষ উপস্থাপিত করবেন এবং নাট্যরীতি বিষয়ে আলোচনা করবেন অথবা মূলরচনার কিছু অংশ নিজে রূপান্তরিত করে দেখাবেন। ঘটনার পারম্পর্য, চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের অক্ষুন্নতা, রুচিসম্পন্ন অথচ উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক সংলাপ, ক্রমপরিণতির স্বাভাবিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই মূল রচনার ভাবধর্মকে ক্ষুন্ন করলে চলবে না। এই কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজ যেমন নাটক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে, তেমনি অভিনয়ে ও নাটক পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে এবং একটি বিশেষ শিল্পানন্দ লাভ করবে। এটিও সাহিত্য-অনুশীলনের একটি বড় দিক।

### (৫) পাঠচক্র—

কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর করে থাকলেই বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনে আমরা সক্ষম হব না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সহপাঠ্য কর্মসূচীর ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এইসব সহপাঠ্য কর্মসূচী পাঠ্য-সূচীর বিরোধী ত নয়ই উপরন্তু তার পরিপূরক। শিক্ষাক্ষেত্রে এর অবদান পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাঠচক্রের এইসব কর্মসূচীর মধ্যে একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক একটি পাঠচক্র তৈরী করতে হবে। এখানে তারা যৌথভাবে সৎ সাহিত্য পাঠ করবে, এবং স্বাধীনভাবে তার আলোচনা করবে। একজন সরব পাঠ করবে এবং অন্যেরা শ্রোতা হিসাবে তার রস গ্রহণে চেষ্টা করবে। এতে তাদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাবে। ফলে বাংলা সাহিত্যের সাথে তাদের পরিচয় ঘটবে, তাদের উচ্চারণ ও বাচন ভঙ্গীর উন্নতি হবে এবং বাংলা ভাষার উপর দখল জন্মাবে।

### (৬) বিতর্ক সভা—

বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্কসভা জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যচর্চার এক বিশেষ সুযোগ এনে দেয়। বিতর্কসভা অনেক সময় প্রতিযোগিতার আকারে অনুষ্ঠিত হয় বলে ছাত্রদের

কাছে এর আকর্ষণ কম নয়। অধিকাংশ সময়েই পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত বিষয় বিতর্কের বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় জ্ঞানের পরিধি দ্রুত বেড়ে যাওয়ার এক দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিতর্কের বিষয়কে কেন্দ্র করে নানাধরণের বইপত্র পড়ার একটা প্রেরণা জাগে। তাছাড়া, বিতর্কে নিজের বক্তব্যকে বিশেষ যুক্তিসহকারে পরিবেশন করতে হয়। তার ফলে পরিশীলিত চিন্তা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং প্রকাশরীতিকেও দৃঢ়, ঋজু এবং স্বচ্ছন্দ করে তুলতে হয়। ভাবানুসারী প্রকাশভঙ্গী কেমন সে বিষয়ে শিক্ষানবিশী করায় অনুকূল অবস্থার সূচনা হয়—যার সদ্ব্যবহার করা এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

**(৭) সাহিত্য-সভা—**

নাগরিক পরিবেশে এবং জীবনে সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠানের নানা সুযোগ থাকে। সেখানে নানা সঙ্ঘ ও সমিতির প্রাচুর্যহেতু এবং অনেকেই সাহিত্য মনোভাবাপন্ন হওয়ায় সাহিত্য আলোচনার একটা আবহাওয়া গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকার কার্যালয়গুলি ত আধুনিক সাহিত্য চর্চার এক একটি কেন্দ্র। এসব ছাড়া বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জন্মদিন উপলক্ষ্য করে গুণগ্রাহী ব্যক্তিবৃন্দ তাঁর সাহিত্যকর্মের সহৃদয় মূল্যায়নে ব্যাপৃত হন। এইভাবে সাহিত্যের একটা সুস্থ বাতাবরণ দেখা দেয়। তুলনামূলকভাবে গ্রামে এই সুযোগ অনেক কম থাকে—উৎসাহও তত নিবিড় নয় এবং যোগ্য ব্যক্তিরও যথেষ্ট অভাব আছে।

যাই হোক আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে বিষয়টিকে কিভাবে রূপায়িত করা যায়—সে বিষয়ে আমরা ভেবে দেখতে পারি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে সপ্তাহে একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা আছে। সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে আবৃত্তির ও স্বরচিত রচনাপাঠের ব্যবস্থা থাকে। প্রয়োজনবিশেষে শিক্ষকগণ সহযোগিতা করেন। এর ফলে ছাত্রগণ যেমন অল্প বয়স থেকে সাহিত্য অনুশীলনে উৎসাহী হয়ে উঠে, তেমনি তাদের মনে সাহিত্যের প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগের সঞ্চার হয়। সাহিত্যভিত্তিক জ্ঞানের সীমাও অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। নানা শ্রেণীর সাহিত্যিক রচনার সঙ্গে তাদের পরিচয় বেশ নিবিড় হয়ে ওঠে। তাছাড়া সকলের মাঝে আত্মপ্রকাশের একটা সুযোগ থাকায় অহংবোধও চরিতার্থ হয় এবং অহেতুক ভয় ও সঙ্কোচ থেকেও মুক্তি ঘটে।

অনুরূপ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত আমরা সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতেও করতে পারি এবং এক্ষেত্রে আমরা সাহিত্য আলোচনায় উন্নতমানের প্রবর্তন করতে পারি। প্রথমতঃ মাঝে মাঝে অধিক খ্যাত বা অল্পখ্যাত সাহিত্যিকদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানান যায়। তাঁদের সাহিত্যজীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার বিবরণ শোনা যে কোন ছাত্র এমনকি শিক্ষকের পক্ষেও এক রসসঞ্চারী অভিজ্ঞতা। এর ফলে সাহিত্য পাঠে ও মূল্যায়ণে যোগ্যতাও বাড়ে। সাহিতিকগণের সহিত পরিচয়ও জীবনে এক মূল্যবান সঞ্চয়। দ্বিতীয়তঃ, বিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্মদিন বা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়। এতে একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার অবকাশ থাকে। তৃতীয়তঃ প্রতি শনিবার ক্লাসের পর সাহিত্য

বৈঠকের আয়োজন ক'রে, সেখানে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, গল্প পাঠ, বিখ্যাত সাহিত্যকের রচনা থেকে পাঠ, গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যায়। অনুষ্ঠানগুলি সুপরিচালিত হলে এবং শিক্ষকগণের সহানুভূতি থাকলে সাহিত্য বৈঠকের আবেদন সুদূর প্রসারী।

### (৮) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে অমরা সাধারণতঃ কণ্ঠসঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত অনুষ্ঠানের কথা বুঝি। ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সাহিত্য সংস্কৃতিকেও এর অঙ্গীভূত করে তুলতে পরি এবং কখনও বা মিশ্র অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে পারি। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এই জাতীয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যার ভিত্তি সাহিত্য। একাধিক বিদ্যালয় মিলে অথবা একই বিদ্যালয়ের পরিবেশকে এর অন্তর্ভুক্ত করে এমন অনুষ্ঠান পরিচালিত হতে পারে।

### (৯) সাহিত্য প্রতিযোগিতা

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মত কবিতা ও ছোটগল্প বা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা বেশ সহজেই করা যায়। একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। অথবা একটু বিস্তৃত পটভূমিকে এর অঙ্গীভূত করা যায়। পুরস্কার ঘোষিত হলে অতিরিক্ত আকর্ষণের সৃষ্টি হতে পারে এবং উত্তম রচনাগুলিকে যথারীতি নির্বাচনের পর কোনও একদিনের অনুষ্ঠানে তা পাঠ করার ব্যবস্থা করলে বিষয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। জীবনে এসবের একটি গঠনমূলক দিক আছে।

### (১০) পাঠাগার-পত্রপত্রিকা বিশেষ সংখ্যা

সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিশেষ স্থান অধিকারকারী পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাগুলি নিয়ে বিদ্যালয় পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। অথবা কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সাহিত্যের মূল্যায়ন ক'রে ও রচনা উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা গড়ে উঠতে পারে। কোন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা যথা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অথবা তারাশঙ্কর বা কুমুদরঞ্জন সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হলে সেগুলি বিদ্যালয় পাঠাগারে রাখতে হবে এবং তা আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। বলাবাহুল্য, এগুলি উচ্চতর শ্রেণীর জন্য।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমাজে যখন থেকে বিদ্যায়তন সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়েছে। বিদ্যালয় যদি জ্ঞানঅর্জনের কেন্দ্র হয় এবং সে দায়িত্ব যদি অর্পিত হয় শিক্ষক সমাজের উপর, তবে সেখানে কিভাবে কার্যধারা প্রবহমান রয়েছে তা জানার অধিকার সমাজের আছে। সমাজের দ্বারা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হওয়ায়, সেখানে যথার্থই উদ্দেশ্যসাধক অগ্রগতি হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে—যাকে আমরা পরীক্ষা বলে জানি। পরীক্ষার ফলাফল দ্বারাই লব্ধ শিক্ষার মান অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা, শিক্ষকের যোগ্যতা, শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা ইত্যাদির পরিমাপ করা যায়।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে অন্তস্থ ও বহিস্থ পরীক্ষার যে পদ্ধতি আছে তার দ্বারা আমরা প্রধানত ছাত্রছাত্রীর বৌদ্ধিক বিকাশ ও অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করতে আগ্রহী। শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হওয়ায় শিক্ষার্থীর অপর গুণাবলীর বিকাশ ঠিকমত হয়েছে কিনা—তা জানার কোন উপায় নেই অথবা থাকলেও সেই ফলের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু, সবগুলিই যে অপরিহার্য এবং বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে বিরাট দায়িত্ব আছে—সে সত্য অস্বীকারের উপায় নেই। ১৯৫২ সালের মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টের ভাষায়—

"The school of today concerns itself not only with intellectual pursuits but also with em tional & social adjustment and other equally important aspects of his life—in a world with an all round development of his porsonality. If examinations are of real value they must take into consideration the new facts and test in detail—the all round development of Pupils."

তাহলে আধুনিক যুগের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সাহায্যে আমরা যেমন বিষয়গত জ্ঞানের পরিমাপ করতে চাইব, তেমনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকের বিকাশ কিভাবে হয়েছে এবং তার ভাবগত ও মানসিক বিকাশ তার বৌদ্ধিক বিকাশের উপযোগী বা অনুসারী কিনা—তা দেখাও আমাদের উদ্দেশ্য। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ছাত্রের প্রবণতা ও যোগ্যতা কেবলমাত্র পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার নিয়ামকই নয়, পরন্তু, তার উত্তরজীবনের সার্থকতার সহায়ক কিনা—সে বিচারও আমরা করতে চাই বা সে বিষয়ে একটা ধারণা গড়ে তুলতে চাই।

সাধারণ পরীক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক আলোচনা না করে আমরা বিশেষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও তার বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। 'বাংলা'কে বিষয় হিসাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারা যায়—ভাষা ও সাহিত্য।

এ দুটির শিক্ষা পদ্ধতিও বিভিন্ন, কারণ শিক্ষার ধারা শিক্ষণীয় বিষয়ের আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করবে। ভাষার বৈজ্ঞানিক গঠনকৌশল থাকায় তার পাঠন ও পরীক্ষাব্যস্থাও একটা নির্দিষ্ট বিচার-ধারা অনুযায়ী চলবে। ভাষার আলোচনায় এবং ভাষাসংক্রান্ত পরীক্ষায় আমরা দেখতে চেষ্টা করব—ছাত্রদের বিশ্লেষণ শক্তির প্রাধর্য্য কতখানি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে কতখানি নির্ভরযোগ্য যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। অধিকন্তু, ভাষার চর্চায় একটা তুলনামূলক উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে কিনা। ভাষা যে জীবনধর্মী—পরীক্ষার্থী প্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে তার পরিচয় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। ব্যাকরণের মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে—যার আলোচনায় এই ধারাটির অনুসরণ করা যায়।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের পরীক্ষায় এমন একটি ব্যবস্থা থাকবে যার সাহায্যে আমরা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের যাথার্থ্য অর্থাৎ বিশুদ্ধতা, বিচারের মৌলিকতা, সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্যতা, প্রয়োগনৈপুণ্য, বিশ্লেষণ ও যৌক্তিকতার প্রাধান্য ইত্যাদি সম্পর্কে একটা মূল্যায়নে সমর্থ হব। ভাষা যেহেতু সৃষ্টিশীল, সৌন্দর্যপ্রধান ও ভাবপ্রকাশের আধার, সুতরাং ভাষার মূল্যনিরূপণেও আমরা শিক্ষার্থীর মৌলিকতার সন্ধান করব।

এবার সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। সাহিত্যের বিষয় যাই হোক—তার ভাষা সৃজনধর্মী ও ভাবপ্রধান। মানব-জীবন অভিজ্ঞতার রূপময়, ভাবগর্ভ, রসমধুর প্রকাশই সাহিত্য। অতএব, সাহিত্য পাঠনে তার মৌল ধর্মটি যেমন অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, তেমনি সাহিত্য-পরীক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থী তার মৌল হৃদয়ধর্মটির আবিষ্কার ও তার ভাবাত্মক মূল্যায়নে সক্ষম হয়েছে কিনা তা দেখা। এখানে বিশ্লেষণ গৌণ এবং ভাবানুভূতি নির্ভর। সাহিত্যের অন্তস্থ সত্যের উপলব্ধি ও তার সৌন্দর্যময় প্রকাশের ক্ষমতা অর্জনই সাহিত্য পরীক্ষার ও পাঠনার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভাষা এবং সাহিত্যে পাঠনা ও পরীক্ষার এই যদি লক্ষ্য হয়—তবে আমরা ঠিক কোন জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতিকে গ্রহণ করব? গঠনধর্ম অনুসারে পরীক্ষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) রচনা ধর্মী (Essay Type) (২) প্রবন্ধ রচনা (Assigment) (৩) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective Test) (৪) মৌখিক পরীক্ষা (Viva-Voce) (৫) কর্মকুশলতা বিচারের পরীক্ষা (Practical Examination)। এখন আমাদের দেখতে হবে এই পাঁচশ্রেণীর পরীক্ষাধারার মধ্যে কোনটি ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা জানি এই সব পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে রচনা-ধর্মী পরীক্ষাই প্রাচীন অর্থাৎ বহুকাল ধরে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং বিদ্যালয়ে পঠিত সকল বিষয়ের মূল্যায়নে এই পদ্ধতি দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে আসছে। অপরদিকে তেমনই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার করে দেখা গেছে যে, রচনাধর্মী পরীক্ষা সব বিষয়ের

ক্ষেত্রে ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়, উপরন্তু বিষয়-বিভিন্নতা অনুসারে বস্তুনিষ্ঠ বিবিধ পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশও করা হচ্ছে—

"The subjective element which is unavoidable in the present purely essay-type examination should be reduced as far as possible ......In order to reduce the element of the essay-type tests, objective tests of attainments should be widely introduced side by side."—*Mudaliar Com. Report.*

রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রধান অসুবিধা তার ভাবধর্মিতা ও ব্যক্তিমুখিতা। সেজন্য, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এর ব্যবহার ক্রমাগত হ্রাস করতে বলা হয়েছে। উক্ত দুটি ত্রুটি ব্যতীত এই পদ্ধতির আরও অনেক অসুবিধা আছে—(১) এটি ব্যক্তিগত রুচি ও মতামত নির্ভর (২) বিচারের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকায় মান নির্ণয় কঠিন (৩) সময়ের অভাবে অনেক সময় রচনা সম্পূর্ণ হয় না। এসব দোষ সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে রচনার্ধী পরীক্ষা অপরিহার্য বলে এখনও মনে করা হয়। ঐ একই রিপোর্টে তাই বলা হয়েছে—

"The essay-type examination has its own value. It tests certain capacities which cannot be otherwise tested."

রচনাধর্মী পরীক্ষায় পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ( Objective Type Test ) চিত্রটিও রাখতে হবে—অবশেষে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষায় কোন জাতীয় পরীক্ষা সবিশেষ উপযোগী হবে। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা নিম্নলিখিত প্রকারের হতে পারে—

(১) সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা—Completion Test ; (২) সত্যাসত্য পরীক্ষা—True-False Test ; (৩) সামঞ্জস্য বিধান—Similarity Test ; (৪) সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন—Multiple Choice Test ; (৫) সঠিক সজ্জিতকরণ—Matching Test ; (৬) ক্রমানুসারী সজ্জিতকরণ—Arrangement Test।

রচনাধর্মী পরীক্ষায় যেসব ত্রুটি আছে বস্তুনিষ্ঠ এইসব অভীক্ষার সেসব ত্রুটি নেই, যদিও এগুলি একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। এই অভীক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরদানে সময় লাগে খুবই সামান্য—উত্তরপত্রের মূল্যায়নও স্বল্প আয়াসসাধ্য ও স্বল্প সময়ভিত্তিক। প্রশ্নপত্র যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং মূল্যায়ন ব্যক্তিগত রুচির বা পছন্দের উপর নির্ভরশীল নয়। পরীক্ষার বিষয় যদি বস্তুমূলক ও তথ্যনিষ্ঠ হয় এবং বিষয়গত জ্ঞানের যাথার্থ্য নির্ণয় যদি পরীক্ষায় উদ্দেশ্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে এই জাতীয় অভীক্ষা খুবই কার্যকরী।

এখন দুই প্রধান স্থানীয় পরীক্ষা পদ্ধতির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধনের পর আমরা সাধারণভাবে মন্তব্য করতে পারি যে, সাহিত্যের পরীক্ষায় রচনাধর্মী অভীক্ষা এবং ব্যাকরণের মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োগ করতে পারি। ভাবগম্ভীর, রসমাধুর্যসম্পন্ন, ব্যক্তি-সৃষ্টিনৈপুণ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর, সৃজনধর্মী সাহিত্যের প্রাণধর্ম উপলব্ধির মূল্যায়নে রচনাধর্মী পরীক্ষা অধিক উপযোগী বলে মনে হয়। কারণ,

সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তার আলোকে দৃষ্ট জগত ও জীবন যখন তাঁর শিল্পী-মানসে প্রতিভাত হয় এবং অন্তররসে পুষ্ট হয়ে যখন তার সাহিত্যিক নবরূপায়ন হয়—তখন তার আবেদন সহৃদয় ব্যক্তিসত্তার গভীরে যেখানে আর একটি সমধর্মী মরমী হৃদয় অপেক্ষমান ও ভাবগ্রহণে উন্মুখ। সাহিত্যের সত্য যেমন করে পাঠক-ব্যক্তি মানসে প্রতিফলিত হয়ে চিরন্তন রসসৌন্দর্যলাভ করে তা যদি সাহিত্যের-আলোচনায় পুনঃপ্রকাশিত না হয় তবে তার আস্বাদনোত্তর কোন সার্থকতা নেই। অন্ততঃ বিদ্যায়তন কেন্দ্রিক সাহিত্য-স্বাদনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের এই পুনঃপ্রকাশ ক্ষমতার যাচাই না হলেই নয়। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যে রচনামূলক পরীক্ষা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'সন্দেহ নেই' একথা জোর-করে বললেও কোন কোন মহল থেকে মনে করা হচ্ছে ও বলা হচ্ছে যে, সাহিত্য পাঠনেরও বস্তুমূলক নৈর্বক্তিক অভীক্ষার প্রয়োগ সম্ভবপর। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ১৯৫৯ সালে সাহিত্য বিষয়ক নৈর্বক্তিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের নমুনা প্রকাশ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে অনুমিত যুক্তি এই যে, সাহিত্যের রসগ্রহণ যেখানে তার আঙ্গিকের বিচার ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ এবং যে কাজ বিদ্যালয়ে কিছু অধিক মাত্রাতেই করতে হয়—সেখানে পাঠন-রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে পরীক্ষা ব্যবস্থাই বা পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে না কেন? এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, মতবাদটির পশ্চাতে যতবেশী নতুনত্বের ও বৈচিত্র্যের মোহ আছে সেই পরিমানে যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা নেই। প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আত্যন্তিক বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ পরীপন্থী ছিলেন—এটি সর্বজন-পরিজ্ঞাত সত্য। তাঁদের মত অনুসরণে বলা যায়, সাহিত্যের পরীক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুব সীমিতভাবে এবং আরও কিছু সংস্কার সাধণের পর কেবলমাত্র নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ব্যবহৃত হতে পারে।

বরং বলা যেতে পারে, ভাষা ও ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিনির্ভর ও বিশ্লেষণ ও বিচারসাপেক্ষ হওয়ায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি যথার্থ ই উপযোগী। তবে, উল্লিখিত অভীক্ষাগুলির মধ্যে যেটি গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়—এটি হচ্ছে 'সত্য-মিথ্যা নিরূপণ' (True False Test)। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির একটি সাধারণ সূত্র এই যে, পরীক্ষার ছলেও কোন ছাত্রের কাছে ভুল বিষয়ের উপস্থাপনা অনুচিত। এটি পুরাতন পদ্ধতি হিসাবে একদা প্রচলিত থাকলেও বর্তমান শিক্ষাজগতে বর্জিত। Multiple Choice Test-এর ক্ষেত্রেও সত্যের সঙ্গে মিথ্যার উপস্থিতি অপ্রতিরোধ্য। তাই এটির বিষয়েও ভেবে দেখতে হবে।

এই আলোচনায় **প্রচলিত রীতি, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির অভীক্ষা** এবং **মিশ্ররীতি**—এই তিন ধরণের প্রশ্নপত্রের নমুনা দেখান হ'ল। যদিও রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সকলেই সুপরিচিত, তবুও পারস্পরিক তুলনায় সুবিধার জন্য সেটিও সন্নিবিষ্ট হ'ল।

## (ক) প্রচলিত রীতির প্রশ্নপত্র

……উচ্চ বিদ্যালয়

বার্ষিক পরীক্ষা—১৯৭৩

পঞ্চম শ্রেণী

বাংলা ( মাতৃভাষা )

সময়—২½ ঘণ্টা পূর্ণমান—১০০

১। "একাগ্রতার পরীক্ষা" অথবা "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী" কবিতাটি হইতে পর প
আট পংক্তি মুখস্থ লিখ। ।

২। যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর লিখ— ২

(ক) প্রাণিজগতের প্রধান দুইটি ভাগ কি কি? উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে
তাহা কিভাবে বোঝা যায়? উদ্ভিদ আর জন্তুতে তফাৎ কি?

(খ) "মানুষের যাতে চরিত্রের উন্নতি হয়, সবাই যাতে সুখে ও শান্তিতে
থাকতে পারে, সেই চিন্তায় ও কাজে তিনি মনে প্রাণে লেগে গেলেন।
—'তিনি' কে? মানুষের চরিত্রের উন্নতি এবং সুখ ও শান্তির জন্য তি
কি কি কাজ করেছিলেন?

(গ) "যেন রহস্যময় ঘুমন্ত পাতালপুরীতে রাজপুত্রের শয়নকক্ষ।"
—পাতালপুরীকে ঘুমন্ত বলা হয়েছে কেন? পাতালপুরীর কক্ষের মধ্যে
কি কি অদ্ভুত জিনিস দেখা গিয়েছিল?

(ঘ) "বুড়ীর কৌটো" গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

(ঘ) সন্ন্যাসী এসে রাজামশাই-এর অসুখ সারাবার কি উপায় বলেছিলেন
অজানা লোকের খোঁজে বের হয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের কার কার সঙ্গে দেখা
হয়েছিল?

৩। (ক) "সকল দেশের সেরা" কবিতায় মাতৃভূমির যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে ত
তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। ১

অথবা

সরলার্থ লিখ :—

"জননী দাঁড়ায়ে ছিল দূরে,
কাছে গেল শিশু ম্লান মুখে,
পুকুর বেচার ব্যথা আজি
প্রথম জাগিল মার বুকে।"

(খ) "রক্তে তার ধন্য হ'ল নকল বুঁদিগড় ।"
—নকলগড় কবিতাটি কার লেখা ? কবি একথা কেন বলেছেন ? নকলগড় কি করে কুম্ভের রক্তে ধন্য হল ?

৪। যে কোন আটটির অর্থ লিখ :— ৮
পিরামিড, পশলা, আমুদে, অনুশোচনা, তেপান্তরের মাঠ, চিত্রগ্রীব, চৌপর, হিমশৈল, লাইফ-বোট, পুণ্যফলে।

৫। ব্যাখ্যা লিখ :— ৭
"বন থেকে জানোয়ার তুলে ফেলা যায়, কিন্তু জানোয়ার মন থেকে তুলে ফেলা যায় না।"

অথবা

"ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কি যে,
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হল যেই,
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকিব মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।"

৬। নিম্নলিখিত যে কোন দুইটির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ— ৬
দাবানল, যুধিষ্ঠির, অনন্তের ভবন, পক্ষিরাজ।

৭। যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া একটি রচনা লিখ— ১৫
দার্জিলিং-এ বর্ষাকাল, কাগজ, সময়ের মূল্য।

৮। (ক) বর্ণ কাহাকে বলে ? কয় প্রকার এবং কি কি ? ৫
কণ্ঠ্য, দন্ত্য এবং ওষ্ঠ্য বর্ণের উদাহরণ দাও।
(খ) সন্ধি কাহাকে বলে ? এবং কয় প্রকার ও কি কি ? ৩
(গ) সূত্রসহ সন্ধি বিচ্ছেদ কর ( যে কোন ৩টি ) :— ৩
ক্ষিতীশ, সিংহাসন, দেবেশ, নায়ক, ভবন, নাবিক।
(ঘ) পদ কয় প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেকের সংজ্ঞা লিখ। ৫
(ঙ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ( যে কোন ৪টি ) ৪
বন, অগ্র, নিন্দা, উন্নতি, উপকার, নিঃশব্দ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য—২

**সাধারণ সমালোচনা :—**

পূর্বেই বলা হয়েছে—প্রশ্নপত্রটি পুরাণো নীতির অর্থাৎ রচনাধর্মী বা 'Essay Type'। দ্বিতীয় প্রশ্নের অন্তর্গত (ঘ) সংখ্যক প্রশ্নটি ('বুড়ীর কৌটা') এবং তৃতীয় প্রশ্নের ক) সংখ্যা প্রশ্নটি তার প্রমাণ। অন্য প্রশ্নগুলির মধ্যে সামান্য নতুনত্ব আছে। তবে, একটি বা একাধিক পংক্তিযুক্ত উদ্ধৃতির সাহায্যে ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন করার রীতিকেও

ঠিক আধুনিক বা নতুন বলা যায় না। কারণ, এ রীতিও দীর্ঘকাল যাবত অনুসৃত হয়ে আসছে। উদ্ধৃত প্রশ্নপত্রটির মধ্যে সামান্য কিছু ভুল আছে। সেগুলো দেখান হল।

(১) একই প্রশ্নপত্রে সাধু ও চলিতের ব্যবহার অসমীচীন। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে যেমন—প্রশ্ন ১—'কবিতাটি হইতে' এবং প্রশ্ন ২—(খ) 'কি কাজ করেছিলেন? আরও সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

(২) একই প্রশ্নে একটি কথা দুভাবে ব্যবহার করা সঙ্গত নয়—প্রশ্নপত্র ২—(ঙ) 'রাজামশাইয়ের' এবং 'মন্ত্রীমহাশয়ের'। এর ফলে ছাত্ররা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হবে।

(৩) প্রশ্ন ২—(গ) "যেন রহস্যময় ঘুমন্ত পাতালপুরীতে রাজপুত্রের শয়নকক্ষ"—এই উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে কৃত প্রশ্নাবলীর মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। বিষয়টির প্রধান ভাবদ্যোতনা আছে 'রহস্যময়'—এই বিশেষণটির মধ্যে-যার আবেদন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর কাছে অনিবার্য। সুতরাং 'রহস্যময়' কথাটি অবলম্বনে একটি ছোট প্রশ্ন থাকলে ভাল হত। দ্বিতীয়তঃ এই রহস্যময়তা বা ঘুমনিবিড়তা রূপকথার পাতালপুরী এবং রাজপুত্র ও রাজকন্যার অনুষঙ্গ সঞ্জাত। ঠিক সে কারণেই এ প্রসঙ্গটিও প্রশ্নের বাইরে রাখা অসঙ্গত। কথামধ্যস্থ দ্রব্যাদি সম্পর্কে একটা বস্তুমূলক প্রশ্ন প্রণীত হতে পারে।

(৪) প্রশ্নপত্রের চতুর্থ প্রশ্নে নির্বাচিত আটটি শব্দের অর্থ লিখতে বলা হয়েছে। শব্দের অর্থ-সার্থকতা নির্ভর করে তার প্রয়োগসামর্থ্য ও সম্ভাব্যতার ওপর। অতএব শব্দার্থ বিষয়ক যে কোন প্রশ্নে বাক্যগঠনের নির্দেশ থাকলে ভাল হয়। এই বিষয়ে একটি বস্তুমূলক প্রশ্নও প্রস্তুত করা যায়। পরে তার নমুনা দেওয়া হ'ল।

(৫) পঞ্চম প্রশ্নে গদ্যাংশ থেকে নির্বাচিত দুটি পংক্তির ব্যাখ্যা লিখতে বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার যে কোন অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কোন একটি শব্দেও অসতর্কতাজনিত ভুল থাকা অনুচিত। এখানে প্রথম 'তুলে ফেলা'র স্থানে হবে 'তুলে আনা' হবে।

(৬) ষষ্ঠ প্রশ্নের নির্দেশাত্মক বাক্যটির ভাষার আধুনিকীকরণ এইভাবে হতে পারে—"যে কোন দুটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও"—বস্তুতঃ 'যাহা জান লিখ' এখন আর ব্যবহার করা অসঙ্গত।

(৭) ব্যাকরণের প্রশ্নগুলির উপস্থাপনা পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যসম্পাদন করে আধুনিক করে তোলা যায়।

## (খ) মিশ্র রীতির প্রশ্নপত্র

উদ্ধৃত প্রশ্নপত্রটির সামান্য সংস্কারসাধন করে এবং কিছু নতুন ধরণের প্রশ্ন সংযোজন করে একে আধুনিক করে তোলা যায়। সাহিত্যের প্রশ্নপত্রে সব প্রশ্নই যে, নৈর্ব্যক্তিক ( objective ) হওয়া সমচীন নয়—এটাই সম্ভবতঃ যথার্থ গ্রহণযোগ্য মত। কিছুসংখ্যক প্রশ্নে রচনাধর্মিতা থাকা দরকার এই কারণে যে, সেগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীর ভাবাভিত্তিক প্রকাশক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সাহিত্য শিক্ষার এটি

একটি অপরিহার্য বিষয়। অপর কয়েকটি প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের মধ্যে নতুনত্বের ভাব আনা অসঙ্গত বা কঠিন নয়। এই জাতীয় মিশ্ররীতির প্রশ্নপত্রে একদিকে যেমন বৈচিত্র্যজনিত স্বাদও পাওয়া যাবে, অপরদিকে তেমনি দুই শ্রেণীর প্রশ্নপত্রের পৃথক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হবে। এই প্রশ্নপত্রকে অবলম্বন করেই কয়েকটি প্রশ্নকে নতুনভাবে রূপায়িত করা হ'ল।

(১) প্রশ্ন—৪

নীচের শব্দগুলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থানগুলিতে যথাযোগ্যভাবে বসাও—

অনুশোচনা, তেপান্তরের মাঠ, হিমশৈল, চৌপর, লাইফ-বোট, আমুদে।

(ক) রাজপুত্র রাতের ঘন অন্ধকারে — — পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। (খ) ডোরাকের বউ ছিল —। (গ) চিন্তা করে কাজ করলে পরে আর — করতে হয় না। (ঘ) শীতপ্রধান অঞ্চলের সমুদ্রে জাহাজগুলিকে — জন্য সতর্কভাবে চলতে হয়। (ঙ) সমুদ্রে জাহাজডুবী হলে — হয় একমাত্র অবলম্বন। (চ) " — দিনভোর দেয় দূর-পাল্লা।"

২। প্রশ্ন—৩। (খ)

"রক্তে তাহার ধন্য হল নকল বুঁদিগড়।"

এই পংক্তির অর্থ সম্পর্ক নীচে কতকগুলি বাক্য দেওয়া হ'ল। যেটি তোমার কাছে সঙ্গত মনে হবে, তার পাশে এই চিহ্ন √ দাও—

নকল বুঁদিগড় ধন্য হ'ল কারণ—

(ক) কুম্ভ সেখানে নিহত হয়েছিল।

(খ) নিহত কুম্ভের দেহ থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল।

(গ) কুম্ভ বীরের মত অগ্রসর হয়েছিল।

(ঘ) হারাবংশী রাজপুত কুম্ভের আত্মত্যাগে তার বংশগৌরব ও বুঁদির কেল্লার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল।

৩। প্রশ্ন—২ (ক)

উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে তা বোঝা যায় এই সব লক্ষণ দেখে—( সমর্থন যোগ্য মত প্রকাশক বাক্যের পাশে দাগ দাও √ )

(ক) যে কোন গাছের পাতাই সবুজ।

(খ) বাতাস বইলে গাছ মানুষের হাত পা নাড়ার মত শাখা প্রশাখা দোলাতে থাকে।

(গ) চারা গাছ ক্রমশঃ বড় হয়ে বড় গাছে রূপান্তরিত হয়।

(ঘ) বীজ থেকে গাছের জন্ম হয়।

(ঙ) কোন এক সময় গাছ মারাও যায়।

(চ) গাছের ডাল কাটলে গাছ কাঁদতে থাকে।

(ছ) কোন কোন গাছ মানুষের ছোঁয়ায় সাড়া দেয়।

৪। প্রশ্ন—১

উদ্ধৃত স্তবকগুলির শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর—

"নেই যে — —, তবে চাই বাহুবল
এবার খাটবে নাকো ——।
মারতে হবে আর — হবে
———— পাবে বাঁচলে তবে।
তবে আর কাজ নেই ——
ঘরের —— বলি ফিরতে ঘরে।
কুক্ কুক্ —— কুককুর কুর
ঘরে —— যা রে, রাজপুত্তুর"

৫। প্রশ্ন—৮ (ঘ)

নীচের বাক্যটি থেকে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ নির্বাচন কর এবং তোমার কাছে কেন সেগুলো নির্দিষ্ট পদ বলে মনে হচ্ছে তার কারণ দেখাও—

"কিন্তু মা-ভালুকটা সামনে পড়ে গিয়েছিল, সে একেবারে পাথর বনে গেল।"

## (গ) আধুনিক রীতির নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপত্র

( পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী )

বিষয়—দূরের পাল্লা ( কবিতা )—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

( কিশলয়—তৃতীয় ভাগ )

কবিতাটি সম্পর্কে তিনটি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া হ'ল। প্রত্যেকটির সঙ্গে পরিপূরক বাক্যাংশ দেওয়া আছে। সেগুলির মধ্য থেকে ঠিক সেই বাক্যাংশটি নির্বাচন কর এবং তার নীচে দাগ দাও যেটি শূন্য স্থানে বসালে বাক্যটি সম্পূর্ণ হবে। নমুনা—'দূরের পাল্লা' কবিতাটির রচয়িতা……। (১) কালিদাস রায় (২) কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৩) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(ক) ১। 'দূরের পাল্লা' একটি……(১) গল্প (২) প্রবন্ধ (৩) ভ্রমণ কাহিনী (৪) কবিতা।

২। তিনজন মাল্লা যে ছিপখানা চালাচ্ছিল সেটি…… (১) পাঁচ দাঁড় (২) তিন দাঁড় (৩) সাত দাঁড়।

৩। উন্মন কথাটির অর্থ……(১) সজাগ (২) বিভ্রান্ত (৩) উদাস।

(খ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একজোড়া করে শব্দের দ্বিতীয় অংশ এলোমেলো করে লেখা হ'ল। যার পাশে যেটি বসলে সঙ্গত, সেটি ঠিক সেখানেই বসাও।

| | | |
|---|---|---|
| নমুনা— | বাতাসের | বন্‌বন্ |
| | চাকার | শন্‌শন্ |
| ঠিক→ | বাতাসের | শন্‌শন্ |
| | চাকার | বন্‌বন্ |

(১) দেয় ডুব — বক্ বক্
কলসীর — ভন্ ভন্
মাছির — টুপ টুপ্

**গদ্যাংশ—'বনের ধারে'—লীলা মজুমদার।**

( দ্রষ্টব্য—কিশলয়—তৃতীয় ভাগ )

(ক) নীচের শব্দগুলো এই পাঠ্যাংশে বিশেষ একটি অর্থে ব্যবহৃত। নির্দিষ্ট সঠিক অর্থটি নীচে প্রদত্ত দুটি বাক্যের মধ্যে একটিতে পাওয়া যাবে। সঠিক অর্থযুক্ত বাক্যটির নীচে দাগ দাও।

নমুনা—'ন্যাড়া'—
(১) লোকটির মাথা ন্যাড়া করা হ'ল।
(২) <u>পাতাশূন্য গাছটিতে দুটি কুঁড়ি দেখা গেল।</u>

১। ছানা— (১) সাধনবাবু প্রতিদিন সকালে ছানা খান।
(২) পাখীর ছানাটা এতদিন উড়তে শিখবে।
২। শুদ্ধ— (১) পুরোহিত পবিত্র চিত্তে পূজায় বসলেন।
(২) টাকাসমেত ব্যাগটি হারিয়ে গেল।
৩। শুকনো— (১) গ্রীষ্মকালে জোরে বাতাস বয়।
(২) রসহীন আহার্য্য ভাল লাগে না।

(খ) নীচের কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্ধৃত হ'ল। পূর্ণ বাক্যটি বইতেই আছে। বই থেকে উপযুক্ত শব্দটি শূন্যস্থানে বসিয়ে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ কর।

নমুনা—খুব কাছে আসতে পারেনি……। উত্তর—খুব কাছে আসতে পারেনি আগুন।

(১) মাইলের পর মাইল পুড়ে……যেত। (২) ছানাটা অমনি……করে উঠল। (৩) বাড়িময় একটা……গন্ধ লেগে থাকত। (৪) রোদ……করছে। (৫) কালো মুরগীটাকে ধরে সকলের চোখের সামনে……করে খেয়ে ফেলল।

**একটি বিশেষ কবিতা—"ধুলামন্দির"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

কবিতাটিকে নবম শ্রেণীর উপযোগী বলে গণ্য করা যেতে পারে। কবিতাটির পূর্ণরূপ এখানে উপস্থাপিত হ'ল। কবিতাটি অবলম্বনে কিছুসংখ্যক আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক অভীক্ষার নমুনা দেখান হ'ল। রচনাধর্মী পরীক্ষায় বিকল্প হিসাবে এগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রশ্ন রচনার রীতি পূর্ব-প্রদর্শিত পদ্ধতির অনুরূপ।

## ধুলামন্দির

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে!

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে।
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে॥
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে॥
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

## ॥ কবিতাটি পাঠনের উদ্দেশ্যসমূহ ॥

(১) অতুলনীয় এক ভাবসম্পদ কবিতাটির প্রাণ। কবির বিশিষ্ট যে জীবনদর্শন এখানে প্রকাশিত—তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় সাধন।

(২) রবীন্দ্রনাথ যে শুধু সৌন্দর্যের সুরলোকে বিচরণ করতেন না—তার প্রমাণ স্বরূপ কবিতার ব্যাখ্যাকে উপস্থাপিত করা। এভাবে কবির জীবনদর্শনের সামগ্রীক রূপটি তাদের সামনে পরিস্ফুট হবে।

(৩) বিশিষ্ট এক রচনারীতির অনুধাবন।

(৪) কবির ঐশ্বরিক উপলব্ধির বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন।

## প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেকটি বিষয় অবলম্বনে তিনটি উত্তর প্রদত্ত হ'ল। এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটির পাশে দাগ দিতে হবে।

(ক) রবীন্দ্রনাথের 'ধূলামন্দির' কবিতার মূল ভাব—

(১) এক প্রশ্নাতীত আধ্যাত্মিকতা।

(২) মন্দির ও মসজিদ ভিত্তিক ঈশ্বরভাবনার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

(৩) মানুষের জন্য মানুষের যে নিয়ত কর্মসাধনা, তারই মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে কর্মের জন্য আত্মনিয়োগের আহ্বান।

(খ) কবিতাটির মধ্যে কবি 'দেখ,' 'থাক' 'লাগুক' 'ছিঁড়ুক' 'পড়ুক' 'খাটছে' 'লেগেছে' চলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, কারণ—

(১) কবিতার মধ্যে তিনি প্রকাশ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

(২) বিশেষ ছন্দ এমন শব্দ ব্যবহারে তাঁকে বাধ্য করেছে।

(৩) প্রবল ও আন্তরিক জীবনধর্মিতার ভাবটি প্রকাশ করতে গিয়ে এইসব বেগবান চলিত শব্দ অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে।

(গ) "নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে" এই পংক্তিটির তাৎপর্য—

(১) কবি ভক্তকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন।

(২) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বব্যাপী—তাই কেবলমাত্র মন্দির মধ্যস্থ দেব-মূর্তির মধ্যে তাঁর অনুসন্ধান ভ্রান্তিমাত্র—তাঁকে বহির্জগতেও প্রকাশিত দেখতে হবে।

(৩) কবি ছিলেন ব্রাহ্ম—তাই তিনি মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছেন।

(ঘ) "রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—"

এই দুটি পংক্তি রচনার উদ্দেশ্য—

(১) কর্মজীবনের জয়গান গাওয়া।

(২) কর্মী ও কর্মসাধনার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন।

(৩) মানুষের মধ্যে দেবত্বের আরোপ।

(ঙ) 'ধুলামন্দির' কবিতাটি সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য আছে এই কবিতার—

(১) 'এবার ফিরাও মোরে' ও 'ঐকতান'।

(২) 'ভারততীর্থ'।

(৩) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'

(২) উদ্ধৃত অসম্পূর্ণ বাক্যগুলির শূন্যস্থান পার্শ্বলিখিত বাক্যাংশগুচ্ছ থেকে নির্বাচিত বাক্যাংশের সাহায্যে পূর্ণ করে বাক্যের সম্পূর্ণতা সাধন কর—

| | |
|---|---|
| ১। কাহারে তুই পূজিস · · ? | করছে চাষা চাষ, |
| ২। কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে······ | সংগোপনে, |
| ৩। ······আছেন সবার সাথে | রৌদ্রে জলে, |
| ৪। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে······ | ঘর্ম পড়ুক ঝরে। |

(৩) "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—"

কবিরচিত এই দুটি পংক্তিতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে নীচের কোন উদ্ধৃতিতে অনুরূপ ভাব আছে?

(১) "তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ"

(২) "পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা"

(৩) "আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।"

শিক্ষাদানের উপযুক্ত পদ্ধতি ভিন্ন কখনও সার্থক পাঠ-পরিচালনা সম্ভবপর হয় না। বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় স্থাপনই শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কথাটির কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুরাগের অনুসারী করে পাঠের লক্ষ্য নির্ণয় করতে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে আমরা দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি যথা জ্ঞানমূলক অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি, আর অনুভূতিমূলক বিষয়ের প্রসঙ্গে সাহিত্যের কথাই এসে পড়ে। সাহিত্যে রসানুভূতি হচ্ছে প্রধান। সুতরাং সাহিত্য পাঠদানকালে এমনভাবে পাঠ পরিচালনা করতে হবে যাতে ব্যাকরণের নীরস ব্যাখ্যা তার মধ্যে থাকবে না। হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে জাগরিত করাই হবে এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাকরণ শেখানোর জন্য স্বতন্ত্র পাঠপদ্ধতি অনুকরণ করতে হবে। শিক্ষককে দেখতে হবে, কোন পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীর কি উপকার হবে, তার আচরণ, ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কি পরিবর্তন সাধন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে শিক্ষককে সম্যকরূপে অবহিত হতে হবে। মনোবিজ্ঞানের উপযুক্ত কার্যকরী জ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষার্থীর সুপ্ত আগ্রহকে মনোযোগে উন্নীত করে তাকে সক্রিয় ক'রে পাঠের উদ্দেশ্যর দিকে পরিচালিত করা পাঠদানের উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে এই পাঠ-পরিচালনা প্রক্রিয়ার দ্বারা ছাত্রের কতটুকু লাভ হল অর্থাৎ লক্ষ্যে কতটুকু পৌছান সম্ভব হল তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-কালে পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও ছাত্রের মানসিক ক্ষমতা ও স্তর অনুযায়ী শিক্ষক একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নেবেন। সমগ্র পাঠটিকে সাথক ও সুষ্ঠু করার জন্য এই জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্টের (Herbart) শিক্ষাদর্শনকেই ভিত্তি করেই বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিচালিত। তাঁর মতে শিশুর জ্ঞানভাণ্ডার বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। জন্মকালে শিশু কোন সংস্কার নিয়ে আসে না। শিশুর মন এক ও অভিন্ন। এই অভিন্ন মনে পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র অনুভূতি এসে ভীড় করে এবং তার একটা অস্পষ্ট ছাপ তাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। হার্বার্ট এই অস্পষ্ট ছাপের নাম দিয়াছেন এনগ্রাম্ (Engram)। এই অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর মনের মধ্যে গিয়ে পরস্পর সংস্পৃক্ত ও সংশ্লেষিত হয়ে নূতন একটা ভাব তৈরী করে। হাবার্ট এই নূতন ভাবগুলির নাম দিয়েছেন ভাবজট (Apperceptive mass)। তিনি বলতে চেয়েছেন শিশুকে নূতন কিছু অভিজ্ঞতা দিতে গেলে বা নূতন পাঠ দিতে গেলে তা তার পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা ভাবজটের সঙ্গে জড়িত করে দিতে হবে। শ্রেণীপাঠনার সুবিধার জন্য পাঠদান কার্যকে তিনি প্রথমে চারটি অংশে ভাগ করেন।

(১) স্পষ্টতা (Clearness)

**(২) সাদৃশ্য বা অনুবন্ধ ( Association )**
**(৩) পারম্পর্য ( System )**
**(৪) পদ্ধতি ( Method )**

জিলার ( Ziller ) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা হার্বার্টীয় শিক্ষণ পদ্ধতিকে আবার পাঁচটি ভাগে বা সোপানে বিভক্ত করেছেন যথা।

| | |
|---|---|
| স্পষ্টতা— | (১) আয়োজন ( Peparation ) |
| | (২) উপস্থাপন ( Presentation ) |
| সাদৃশ্য বা অনুবন্ধ— | (৩) তুলনাকরণ বা বিমূর্তকরণ ( Comparison or Association ) |
| পারম্পর্য— | (৪) সূত্র নির্ধারণ ( Generalizalion ) |
| পদ্ধতি— | (৫) অভিযোজন ( Application ) |

বর্তমানে পঞ্চসোপানকে আবার সংক্ষেপিত করে তিনটি সোপানে পাঠপরিচালনা করা হয়। যথা—**(১) আয়োজন (২) উপস্থাপন (৩) অভিযোজন**

এবার বাংলাভাষা ও সাহিত্যে পাঠ-টীকা প্রণয়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

পাঠ-টীকা প্রস্তুতকল্পে প্রথমেই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হয় যথা—

(১) বিদ্যালয়ের নাম, (২) শ্রেণী, (৩) ছাত্রসংখ্যা, (৪) ছাত্রদের গড় বয়স (৫) সময় (৬) শিক্ষকের নাম (৭) তারিখ।

এই বিষয়গুলি পাঠ-টীকার শীর্ষে বাঁদিকে সাজিয়ে লিখতে হবে। ডানদিকে লিখতে হবে বিষয়েব নাম, পাঠক্রম ও অদ্যকার পাঠেব বিষয়।

**উদ্দেশ্য ঃ**

কোন বিষয় পড়াতে গেলে তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে সাহিত্য একটি রসানুভূতিমূলক ( Apprcciation lesson ) বিষয়, সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে পাঠ-পরিচালনা করতে হবে। ছাত্র যাতে সাহিত্যের রসগ্রহণে সক্ষম হয় এবং তার চিন্তাশক্তি ও বিচারপ্রয়োগের ক্ষমতা এবং যুক্তি-নিষ্ঠতার ক্ষমতা জাগ্রত হয়। উদ্দেশ্য আবার দুবকমের হতে পারে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। উদ্দেশ্যটি জানা থাকলে পাঠদানের গতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পাঠেব উদ্দেশ্যকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ;

**পদ্য ঃ**—কবিতার রসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে কবিতাটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ করতে ছাত্র/ছাত্রীদিগকে সহায়তা করা।

**গদ্য ঃ**—গদ্যাংশ পাঠের লেখকের রচনাভঙ্গী এবং তার রসাস্বাদনে ছাত্রদের সহায়তা করা এবং পঠনশক্তি, ভাষাজ্ঞান ও ভাবপ্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ সাধনে ছাত্রদের সাহায্য করা।

**ব্যাকরণ-পাঠ :**—ব্যাকরণের সূত্র সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে এবং উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জনে ছাত্রদিগকে সহায়তা করা।

**রচনা পাঠ** :—(১) মুখ্য উদ্দেশ্য কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সুবিন্যস্ত ধারণা-গঠন ক'রে সরল ভাষায় স্বাধীনভাবে রচনা লিখতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

(২) গৌণ-উদ্দেশ্য—বাক্যরচনা ও ভাষাজ্ঞান, তথ্যসংগ্রহ ও তার প্রয়োগ, ভাবচিন্তার উন্মেষ, যুক্তিশীলতার অনুশীলন এবং স্বাধীন রচনাশক্তি বিকাশে ছাত্রদিগকে সহায়তা করা।

**উপকরণ :**—

পাঠদানের সহায়ক রূপে উপকরণ প্রয়োজন হলে সেগুলিকে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিশুর মনকে পাঠাভিমুখী করতে হলে অর্থাৎ বিমূর্ত বিষয়গুলিকে মূর্ত করে তুলতে হলে অনেক সময় ছবি, অনুকৃতি ( model ) প্রভৃতি ব্যবহার কর' যেতে পারে। উচ্চতর শ্রেণীতে উপকরণ বাহুল্য না করলেও চলে।

**আয়োজন :**

এই স্তরটিই হার্বার্টীয় শিক্ষাদর্শনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যে বিষয়ে পাঠদান করা হবে সেই বিষয়ে ছাত্রের কোন পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটা কৌশলে নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিয়ে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করতে হবে।

(১) লেখক ও পাঠ্য বিষয়টি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এবং তাদের পাঠস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে শিক্ষক উপযুক্ত প্রশ্নাবলী ও উদ্ধৃতির অবতারণা করবেন।

(২) পাঠ্য বিষয়টির বৈশিষ্ট্য ও পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সরল অথচ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে শিক্ষক **পাঠ-ঘোষণা** করবেন।

**উপস্থাপন**—

এর পর শিক্ষক সমগ্র পাঠটিকে একটি হৃদয়গ্রাহী পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপিত করবেন। এই পাঠ ছাত্রদের মনে কতটা রেখাপাত করেছে তা জানবার জন্য দু একটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন শিশুর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

(১) পাঠ্যবস্তুকে কয়েকটি অংশে ( unit ) ভাগ করে নিম্নরূপ পদ্ধতির সাহায্যে এর মর্মগ্রহণ ও উপভোগের সহায়ক বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

(২) অংশটি শিক্ষক কর্তৃক সরব পাঠ অথবা ছাত্র কর্তৃক প্রয়োজনানুযায়ী সরব কিংবা নীরব পাঠ দ্বারা বিষয়টির মর্মগ্রহণ এবং রসগ্রহণে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(৩) অংশটির শিল্পনৈপুণ্য এবং ভাষাপ্রয়োগ সন্ধানে প্রশ্নাবলী করা যেতে পারে।

(৪) প্রয়োজনস্থলে সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ ও প্রয়োগ-সম্বলিত অন্যান্য গদ্যাংশের ও পদ্যাংশের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৫) এই স্তরে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনানুগ বোর্ডের কাজ করা প্রয়োজন।

**অভিযোজন ঃ**

অদ্যকার পাঠ ছাত্ররা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে অর্থাৎ তার নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। নবলব্ধ শব্দ-সম্পদ এবং ভাষা প্রয়োগরীতি কিংবা ব্যাকরণের সূত্রাবলী অথবা রচনার বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলী নতুন ক্ষেত্রে ছাত্রেরা প্রয়োগ করতে পারছে কিনা তা অনুশীলনের ব্যবস্থা এই স্তরে করা প্রয়োজন। এই স্তরকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরের জ্ঞানলাভের প্রারম্ভিক সোপান বলা যেতে পারে। বৃহত্তর এককের ক্ষেত্রে অভিযোজন বলতে সমস্ত অংশটি সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞানের সূক্ষ্ম সমালোচনা বোঝায়, আর ক্ষুদ্রতর এককের ক্ষেত্রে অভিযোজন বলতে পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান ছাত্র আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তার পরীক্ষা করা এবং ঐ জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করাতে সাহায্য বোঝায়।

**বাড়ীর কাজ ঃ**

মনস্তাত্ত্বিক কারণে ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য এবং স্বয়ংশিক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য পাঠদান বিষয়ের উপর কিছু প্রশ্ন করে ছাত্রদের কাজ দেওয়া হবে, যাতে বুদ্ধির পরিচয়, আগ্রহ পরিচয়, রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কিছু সুনির্বাচিত হালকা কাজ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ছাত্রদের উপর খুব বেশী কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

নিম্নে কতকগুলি পাঠটীকা দেওয়া হল। বিষয়বস্তুর বিকাশ ( Develop ) করার প্রয়াস প্রতিটি পাঠটীকার মধ্যে লক্ষ্যণীয়।

## পাঠটীকা—গদ্যসাহিত্য

মূল রচনা— বাল্য-স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"জানালার নিচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে, আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলি ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘনঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত। কেহ—বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময় ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত, কেহ—বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই—ধীরেসুস্থে স্নান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিন বার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু—বা ফুল তুলিয়া মৃদুমন্দ দোদুল গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম, এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কিরকম আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম :—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! যে—পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই অন্তর্হিত বটগাছেরই ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানা প্রকারের ঝুড় নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

---

## ১নং পাঠটীকা

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—ষষ্ঠ
ছাত্রসংখ্যা—২৫
গড় বয়স—১১+
শিক্ষক, শিক্ষিকা—
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ

বিষয়—বাংলা সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—বাল্য-স্মৃতি
রচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আজকের পাঠ্য অংশ—
জানালার নীচেই ... ছায়া
রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

**উদ্দেশ্য** (১) রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কিভাবে অতিক্রান্ত হয়েছিল—সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ।
(২) তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কে সামান্য ধারণার সৃষ্টি।
(৩) কাব্য-রস মণ্ডিত গদ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভ।

**উপকরণ**—পাঠ্যপুস্তক, রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনামূলক গ্রন্থ (জীবনস্মৃতি ইত্যাদি), বালক বা কিশোর রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র, বিষয়বস্তু প্রকাশক একটি বৃহদায়তন অঙ্কিত চিত্র, ইত্যাদি।

**প্রস্তাব-** পাঠ্যের প্রথম অংশটি প্রথমদিন আলোচিত হয়েছে বলে মনে করলে, সে বিষয়ের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে :—

(১) রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় তাঁকে দেখাশুনার জন্য যে চাকরটি ছিল তার নাম কি?
(২) রবীন্দ্রনাথের উপর এর প্রভাব কেমন ছিল?
(৩) শিশু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে গিয়ে সে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করত?
(৪) গণ্ডী পার হওয়াকে শিশু রবীন্দ্রনাথ বিপজ্জনক বলে মনে করতেন কেন?
(৫) 'আধি দৈবিক' ও আধিভৌতিক শব্দদুটির অর্থ কি?

**পাঠঘোষণা**—"শৈশবে এই রকম বন্দীজীবন যাপন করার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে বাইরের জগৎ সম্পর্কে এক অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি এই কৌতূহল কিভাবে মিটিয়েছিলেন—এস আজ আমরা সে বিষয়েই জানতে চেষ্টা করি।" শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ছাত্রগণ পুস্তকের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলবে এবং শিক্ষকের আদর্শ পাঠ শোনার জন্য প্রস্তুত হবে। শিক্ষকের আদর্শ পাঠের পূর্বে সমস্ত পাঠ্য অংশটি কয়েকটি নির্দিষ্ট শীর্ষে বিভক্ত হবে :—

(ক) জানালার নীচেই……আমার জানা ছিল।

(খ) প্রত্যেকের স্নানের……পালক সাফ করিতে থাকে।

(গ) পুষ্করিণী নির্জন……গণনা করিতেছে।

**উপস্থাপনা**

| | পদ্ধতি |
|---|---|
| **প্রথম শীর্ষ**—<br>জানালার নীচেই……আমার জানা ছিল।<br>কঠিন শব্দের নমুনা—<br>প্রকাণ্ড—<br>বন্দী—<br>গণ্ডি-বন্ধন—<br>খড়খড়ি—<br>প্রতিবেশী—<br>ব্যাখ্যার জন্য নির্দিষ্ট অংশ—<br>প্রায় সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতাম।<br><br>গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী<br>ব্যাকরণ—<br>স্নান—স্নাত।<br>ঘাট-বাঁধানো।<br>স্মরণযোগ্য অংশ—<br>বন্দী জীবনের একাকীত্বের বেদনা ভুলতে গিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী পুকুরটার দিকেই সমস্ত সময় ধরে তাকিয়ে থাকতেন। | পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খোলা হলে এবং ছাত্রগণের অভিনিবেশ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলে শিক্ষক মহাশয় বিরাম, যতি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে রচনার ভাবের তারতম্য অনুসারে স্বরযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে বিষয়টির আদর্শ পাঠ দেবেন। প্রয়োজন হলে তিনি একই বিষয় দুবার পাঠ করবেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে তিনি পাঠ্যবিষয়টি ছাত্রদের পাঠ করতে নির্দেশ দেবেন। ছাত্রদের পাঠভঙ্গীতে কোন ভুল থাকলে তিনি সংশোধন করে দেবেন। বিষয়বস্তু ও ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য তিনি উপযুক্ত পূর্বোক্ত শিক্ষোপকরণের সাহায্য নেবেন। তার ফলে বিষয়টি সম্যকরূপে পরিস্ফুট হবে।<br>আলোচনার সময় কঠিন শব্দের অর্থ নিয়েও ব্যাপৃত থাকবেন। ছাত্রগণ শব্দের অর্থ না জানলে বোর্ডে সেগুলো লিখে দিতে হবে। ছাত্রগণ শব্দার্থ নিজেদের খাতায় লিখে নেবে।<br>আলোচনার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন করবেন—<br>(১) রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বন্দী বলেছেন কেন? |

**বিষয়বস্তু**

**দ্বিতীয় শীর্ষ**

প্রত্যেকের স্নানের ······সাফ করিতে থাকে।

কঠিন শব্দাবলী—
দ্রুতবেগে—
ঘন ঘন—
বিনা ভূমিকায়—
সশব্দে—
আত্মসমর্পণ—
শ্লোক—
মৃদুমন্দ দোদুল গতিতে—
স্নান-স্নিগ্ধ -
বিকীর্ণ—
চঞ্চু—

ব্যাকরণ—
(ক) মলিনতা—মলিন
ঔৎসুক্য—উৎসুক
ব্যস্ততা—ব্যস্ত
(খ) ক্রিয়া বিশেষণ—
ধীরে সুস্থে—
সশব্দে—
ধাঁ করিয়া—

ব্যাখ্যার অংশ—
কাহারো বা······বাড়ীর দিকে তাহার যাত্রা।

স্মরণযোগ্য অংশ—
স্নানার্থীদের বিবিধ ভঙ্গীতে স্নান করা ও চলে যাওয়ায় মনোজ্ঞ বর্ণনা।

**পদ্ধতি**

(২) পুকুরটীকে একটি ছবির মত মনে হওয়ার কারণ কি?

(৩) সারাদিন তিনি কিভাবে কাটাতেন?

(৪) তোমাদের নিজেদের জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে থাকলে সেটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

পূর্ব-বর্ণিত পদ্ধতি এখানেও একইভাবে অনুসৃত হবে। প্রয়োজন বিশেষে শিক্ষক উপকরণ-স্থানীয় পুস্তক থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করে ছাত্রদের শোনাবেন।

ব্যাকরণের বিষয়গুলি নানা উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করবেন। কারণ শব্দের যে শুধু অর্থই আলোচনা করা হবে তা নয়। সে সঙ্গে যথাসম্ভব নতুন বাক্যে সেগুলিকে প্রয়োগ করবেন। নির্দিষ্ট পংক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ছাত্রগণই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রয়োজন বিশেষে শিক্ষক উপযুক্ত ভাষায় উদ্ধৃত অংশের আন্তর্নিহিত ভাবটি প্রকাশ করবেন।

অনুচ্ছেদের ভাব গ্রহণের জন্য নিম্নপ্রকার প্রশ্ন করা হবে—

(১) কোন ব্যক্তি সহসা জলে ডুব দিত কেন?

(২) "কেহ বা ·····আত্মসমর্পণ করিত।" কেন? কার কাছে?

(৩) কোন্ লক্ষণ দেখে বোঝা যেত যে কোন্ স্নানার্থী শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মভীরু?

(৪) কোন্ ব্যক্তি তাঁর কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল এবং কেন?

(৫) দীর্ঘ সময় ঘরের মধ্যে থাকলেও কেন তাঁর খুব খারাপ লাগত না?

(৬) তিনি কি দেখে বুঝতেন যে ক্রমে বিকেল হয়ে আসছে?

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| **তৃতীয় শীর্ষ** | পদ্ধতি পূর্ববৎ। |
| পুষ্করিণী নির্জন……গণনা করিতেছে। | আলোচনার প্রশ্ন— |
| কঠিন শব্দ :— | (১) স্নানের পরবর্তী সময়ের নির্জনতার মধ্যেও তিনি একাকীত্ব অনুভব করতেন না কেন? |
| দৈবাৎ— | |
| স্বপ্নযুগ— | |
| ক্রিয়াকলাপ— | (২) মনের চোখে তিনি কাদের দেখতেন? |
| বনস্পতি— | |
| অধিষ্ঠাত্রী— | (৩) বটকে উদ্দেশ্য করে তিনি কি লিখেছিলেন? কেন লিখেছিলেন? |
| অন্তর্হিত— | |
| ব্যাখ্যার অংশ— | (৪) শেষ বাক্যটি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা কর। |
| (ক) দৈবাৎ সেখানে……রহিয়া গিয়াছে। | |
| (খ) আর সেই বালক……গণনা করিতেছে। | |

**অভিযোজন** :- সমগ্র বিষয়টির উপর সামগ্রীক আলোচনা এবং রচনাটির অভ্যন্তরস্থ সত্য সম্পর্কে এক অখণ্ড ভাবচেতনায় উপনীত হওয়া।

আজকের সমগ্র পাঠের আলোচনার সফলতার বিচারেব জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্ন করবেন :—

(১) বালক রবীন্দ্রনাথের ছবিটি দেখে তিনি কেমন ছিলেন বলে মনে হয়? (২) তাঁর শৈশবের অধিকাংশ দিন কিভাবে কাটত? (৩) তিনি একা থাকলেও একাকী বোধ করতেন না কেন? (৪) তিনি প্রকৃতিকেও মানুষের মত দেখে তার সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতেন—ব্যাখ্যা কর।

## ২নং পাঠটীকা—ছড়া

বিষয়—ছড়া শ্রেণী—শিশু শ্রেণী

অদ্যকার পাঠ—(ক) খোকা যাবে নায়ে (খ) হীরামন তোতারে

**মূল রচনা—**

(ক) খোকা যাবে নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে
পাঁচশো টাকার মলমলি থান
সোনার চাদর গায়ে॥
তোমরা কে বলিবে কালো।
পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করে দিব আলো॥

(খ) হীরামন তোতারে।
বাস তোর কোথা রে॥
আয় পাখী ছুটিয়া।
ধান খারে খুটিয়া॥
খেয়ে দেয়ে এ বাড়ি।
দূর দেশে দে পাড়ি॥
নেড়ে তোর ডানা রে।
ভিন দেশে যানা রে॥
উড়ে যারে হাঁকিয়ে।
খোকা রবে তাকিয়ে॥

খোকা এল ঘোড়ায় চড়ে।
সোঁদর বনের ধারে॥
মারল একা সাতশো বাঘে।
একটি তলোয়ারে॥

**উদ্দেশ্য :**

(১) ছড়ার সঙ্গে শিশুর সাধারণ পরিচয় সাধন। (২) ছড়ায় সঙ্গীতধর্মিতার উপলব্ধি। (৩) শিশুর আত্মবিস্তারের কামনার পরিতৃপ্তি সাধন। (৪) ছড়া আবৃত্তির মাধ্যমে আনন্দলাভ। (৫) ছড়া বলতে শেখা।

**প্রস্তুতি :**

শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পর শিক্ষক প্রথমেই শ্রেণী সন্নিবেশের দিকে মনোযোগ দেবেন। ছড়া শেখানর সময় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সাধারণ আসবাব একপাশে সরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাবলীল বিচরণ ও অঙ্গভঙ্গীর উপযোগী স্থান সৃষ্টি করবেন। ছড়া আবৃত্তির সময় সকলকে যে অংশ নিতে হবে—সে কথা পূর্বেই শিক্ষককে জানিয়ে দিতে হবে। ছড়ার পাঠদানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষক ছড়াগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করবেন। আবৃত্তির ভঙ্গী অবশ্যই বলবৃত্ত ছন্দের অনুসারী হবে। ছড়ার বিষয়বস্তুও ভালভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন রঙ এর সাহায্যে এঁকে নিয়ে যেতে হবে। ছবির পাশে থাকবে ছড়ার চার্ট—যেখানে ছড়াটি বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে।

**উপকরণ :**

(১) ছড়ার লিখিত রূপ। (২) ছড়ার বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র। (৩) রঙীন চক (শিক্ষক নিজে শ্রেণীকক্ষে ছবি আঁকার সময় ব্যবহার করতে পারেন।)

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| **প্রথম সোপান—**<br>**প্রস্তুতি :** শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শ্রেণী সন্নিবেশ :<br>প্রারম্ভিক ছড়া—<br>পাঠভঙ্গী—<br>"খোকা এল/ঘোড়ায় চড়ে<br>সোঁদরবনের/ধারে।<br>মারল একা/সাতশো বাঘে<br>একটি তলোয়ারে ॥ | পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজন মত শ্রেণীসন্নিবেশ করবেন। তাদের মনকে পাঠাভিমুখী করার জন্য সামান্য অঙ্গভঙ্গী—সহকারে প্রস্তুতি পর্যায়ের ছড়াটি সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করবেন। আবৃত্তির ভঙ্গী বিষয়বস্তু অংশে দেখান হল। শিশুরা পাঠে আকৃষ্ট হলে তিনি আজকের পাঠঘোষণা করবেন এইভাবে—"এস, আমরা আরও দুটো নতুন ছড়া শিখি।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি নতুন দুটি ছড়ার ছবি ও চার্ট দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবেন। |
| **দ্বিতীয় সোপান—**<br>**উপস্থাপন**<br>প্রথম ছড়া—<br>খোকা যাবে/নায়ে।<br>লাল জুতুয়া/পায়ে<br>পাঁচশো টাকার/মলমলি থান/<br>সোনার চাদর/গায়ে ॥<br>তোমরা কে ব/লিবে কালো।<br>পাটনা থেকে/হলুদ এনে<br>গা/করে দিব/আলো ॥<br>দ্বিতীয় ছড়া—<br>হীরামন/তোতা রে।<br>বাস তোর/কোথা রে ॥<br>আয় পাখী/ছুটিয়া।<br>ধান খারে/খুটিয়া<br>খেয়ে দেয়ে/এ বাড়ি।<br>দূর দেশে/দে পাড়ি ॥ | প্রথমে তিনি পূর্বপদ্ধতি অনুসারে ছড়াটি একাধিকবার আবৃত্তি করবেন এবং শিশুরা তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখবে ও আবৃত্তি শুনবে। পরে শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে শিক্ষকের ভঙ্গী অনুসারে দুটো ছড়াই আবৃত্তি করবে। আবৃত্তির কাজ শেষ হ'লে ছবিটি দেখিয়ে খুব সহজ ভাষায় সংক্ষেপে ছড়ার বিষয়বস্তু আলোচনা করতে হবে। শিশুরা লিখতে শিখলে ছড়াদুটি লিখে নিতে বলা যেতে পারে। অভিযোজন স্তরে এক একজন ছাত্রকে ছড়া আবৃত্তি করতে বলা যায়। |
| **তৃতীয় সোপান—**<br>**অভিযোজন** | আলোচনার প্রশ্নের নমুনা—<br>(১) খোকা কিসে করে যাবে?<br>(২) খোকা কেমন জুতো পরবে?<br>(৩) খোকার মলমলি থানের দাম কত?<br>(৪) হীরামন তোতাকে কি খেতে দেওয়া হবে? ইত্যাদি। |

## পাঠটীকা—কবিতা

**মূল কবিতা—** দেশের মাটি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
　　সে এই আমার দেশের মাটি
আমার দেশের পথের ধুলা
　　খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি। ॥ ১ ॥
চন্দনেরি গন্ধে ভরা—
　　শীতল করা—ক্লান্তি হরা—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
　　সেখানটিতেই শীতল পাটি। ॥ ২ ॥
শিয়রে তার সূর্য্য এসে
　　সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
　　বুলায় পায়ে রূপার কাঠি। ॥ ৩ ॥
নাগের বাঘের পাহারাতে
　　হচ্ছে বদল দিনে রাতে
পাহাড় তাকে আড়াল করে
　　সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি। ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি—**

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৯ সালে এঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত এবং রবীন্দ্র স্নেহলালনে বর্ধিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অজস্র কাব্য ও কবিতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে আছেন। অসংখ্য বিদেশী কবিতার তিনি সার্থক অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অপর কোন কবি সত্যেন্দ্রনাথের মত এত বেশীরকমের ছন্দ প্রয়োগে কবিতা রচনা করেন নি। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা অনেক—এখানে কয়েকখানির নাম দেওয়া হল—'বেণু ও বীণা' 'তীর্থরেণু' 'তীর্থসলিল' 'কুহু ও কেকা' 'অভ্র আবীর' ও 'বিদায় আরতি' 'বেলা শেষের গান' ইত্যাদি।

**প্রাসঙ্গিক তুলনীয় উদ্ধৃতিসমূহ—**

(১) "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
　　সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(২) "ভারত আমার, ভারত আমার
　　　যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
　　মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
　　　এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।" —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(৩) "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিলে মলয় সদা বহমান।" —কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(৪) "জননি গো জন্মভূমি তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে!
সুন্দর শশাঙ্ক মুখ, উজ্জ্বল তপন
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।" —গোবিন্দ চন্দ্র দাস

(৫) "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥" —রবীন্দ্রনাথ

(৬) "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে॥" —রবীন্দ্রনাথ

(৭) "England, with all thy faults, I love thee still
My Country! and, while yet a nook is left
Where English minds and manners may be
found,
Shall be Constrain'd to love thee.
—*William Cowper*

## ৩নং পাঠটীকা

বিষয়—বাংলা কবিতা আজকের পাঠ—"দেশের মাটি" কবিতার প্রথম চারটি স্তবক।

**উদ্দেশ্য :** (১) কবিতাটির মর্ম উপলব্ধি। (২) দেশাত্মবোধের জাগরণ। (৩) ছন্দের ধ্বনি মাধুর্য ও ভাব-সৌন্দর্যের উপভোগ। (৪) তুলনা-মূলক উদ্ধৃতিগুলির সাহায্যে কবিগণের স্বদেশচেতনার সাদৃশ্য ও গভীরতা বোধে সাহায্য করা। (৫) সত্যেন্দ্রনাথের সম-সাময়িক যুগের স্বদেশভাবনার সহিত পরিচয় স্থাপন।

**উপকরণ :** পাঠ্যপুস্তক, উদ্ধৃতিসমূহের অনুলিপি অথবা মূল উৎসগ্রন্থ, কবির অঙ্কিত বা মুদ্রিত প্রতিলিপি।

**আয়োজন ও পাঠ ঘোষণা—**

যথোপযুক্ত শ্রেণীবিন্যাসের পর শৃঙ্খলাবিধান সমাপ্ত হলে শিক্ষক কয়েকটি নির্বাচিত উদ্ধৃতি মনোজ্ঞ ভঙ্গীসহকারে পাঠ বা আবৃত্তি করবেন। এর ফলে সহজেই ছাত্রদের দৃষ্টি পাঠে আকৃষ্ট হবে। ছাত্রদের মন সমভাবনায় উদ্দীপ্ত হলে শিক্ষক ছাত্রদের

সামনে এই প্রস্তাব রাখবেন—"এই জাতীয় কোন কবিতা তোদাদের জানা থাকলে, স্মৃতি থেকে একটুখানি বল।" ছাত্রগণ সক্ষম না হলে নিম্নলিখিতরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করবেন—

(১) স্বদেশ ভাবনামূলক কবিতা লিখেছেন এমন কয়েকজন কবির নাম কর।
(২) 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি কার রচিত ?
(৩) "হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"

—এই কবিতাংশটি কোন কবির কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত ? তাঁর অনুরূপ ভাবের কোন কবিতা জানা থাকলে বল।

অতঃপর পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক দেশ, কাল-নিরপেক্ষ সকল মানুষের গভীর স্বদেশপ্রাণতার প্রসঙ্গটির অবতারণা করবেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সাহায্যে প্রতিপন্ন করবেন যে,—"সকল মানুষের কাছেই তার নিজের দেশ অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নেই। দেশ বিদেশের কবি সাহিত্যিকরা ও শিল্পীগণ তাই স্বদেশকে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে রূপায়িত করেছেন। আমাদের দেশের এমনি একজন কবিও অনুরূপ একটি কবিতা লিখেছেন—আজ আমারা তাঁর কবিতাটি পাঠ করব।"—এই বলে তিনি কবির ছবিটি যথাস্থানে স্থাপন করবেন এবং পাঠ্য কবিতাটির নাম ঘোষণা করবেন। অতঃপর সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ( পূর্বেই দেওয়া হয়েছে ) দানের পর মূল কবিতা পাঠের সূচনা করবেন।

## উপস্থাপন

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| **শীর্ষ-বিভাগ**<br>প্রথম—মধুর চেয়েও… …<br>চাইতে খাঁটি।<br>দ্বিতীয়—চন্দনেরি… …<br>শীতল পাটি।<br>তৃতীয়—শিয়রে তার<br>……রূপোর কাঠি।<br>চতুর্থ—নাগের বাঘের<br>……ধোয়ায় পা'টি।<br>**প্রথম স্তবক**<br>পাঠ—নির্দেশ<br>"মধুর চেয়েও/আছে মধুর—<br>সে এই আমার/দেশের মাটি | প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্তির পর শিক্ষক কবিতার আদর্শ পাঠের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন। ছাত্রগণ তাদের পাঠ্য-পুস্তকের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করলে শিক্ষক চারটি স্তবকের ছন্দ ও যতি অনুসারী আদর্শ পাঠ দেবেন। পাঠভঙ্গী পার্শ্ববর্তী স্তম্ভে প্রদর্শিত হল। প্রয়োজন হলে তিনি সমস্ত অংশটি একাধিকবার পাঠ করবেন। শিক্ষকের পাঠ শেষ হলে ছাত্রগণের কিছু অংশ একে একে সরব পাঠে নিযুক্ত হবে। তারপর সামান্য সময় নীরব পাঠে ব্যয়িত হবার পর শিক্ষক |

ল,
প্রশ্ন

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| আমার দেশের/পথের ধূলা<br>খাঁটি সোনার/চাইতে খাঁটি"।<br>কঠিন শব্দাবলী—<br>মধুর—<br>খাঁটি—<br>চাইতে—<br>টীকা—<br>'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি'<br>শব্দের আলোচনা—'চাইতে,<br>বাক্য—(১) সে তোমার চাইতে বয়সে বড়।<br>(২) মেঘ না চাইতে জল।<br>(৩) ধোঁয়ার জন্য চোখ চাইতে পারছি না। | প্রথম স্তবকের মর্ম উদ্ঘাটনের উপযুক্ত প্রশ্নাদি করবেন—<br>(১) কবি দেশের মাটিকে মধুর চেয়েও মধুর বলেছেন কেন? (২) 'মধুর' শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থ দুটি কি কি? (৩) পথের ধূলা সোনা অপেক্ষা খাঁটি—কোন অর্থে?<br>তুলনীয়—<br>"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি<br>রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান'<br>অতঃপর শিক্ষক অপর জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির অবতারণা করবেন এবং আলোচনার সাহায্যে প্রতিপন্ন বিষয়সমূহ বোর্ড লিখে দেবেন এবং ছাত্ররা তা খাতায় লিখে নেবে। |
| **দ্বিতীয় স্তবক**<br>চন্দনেরি গন্ধে ভরা······<br>শীতল পাটি।<br>কঠিন শব্দার্থ—<br>ক্লান্তি হরা—<br>অঙ্গ—<br>শীতল পাটি—<br>**শব্দের আলোচনা—**<br>ক্লান্তি—ক্লান্ত<br>অঙ্গ—আঙ্গিক<br>শীতল—শীতলতা<br>ব্যাখ্যা—<br>যেখানে তার অঙ্গ······<br>শীতল পাটি। | **পদ্ধতি পূর্ববৎ**<br>আলোচনার প্রশ্ন—<br>(১) বাতাসকে 'ক্লান্ত হরা' কেন বলা হয়েছে? (২) বাতাসের প্রসঙ্গে কবির চন্দনের কথা মনে হয়েছে কেন? (৩) কবি দেশের মাটিকে শীতল পাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?<br>তুলনীয়—<br>(ক) যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে<br>অনিলে মলয় সদা বহমান।"<br>(খ) "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।<br>চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস<br>আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"<br>—রবীন্দ্রনাথ |
| **তৃতীয় স্তবক—**<br>শিয়রে তার······রূপোর কাঠি।<br>কঠিন শব্দার্থ —<br>শিয়রে— | **পদ্ধতি পূর্ববৎ**<br>আলোচনার প্রশ্ন—<br>(১) সোনার কাঠি ছোঁয়ানর সময় সূর্যের মুখে হাসি থাকে কেন? (২) শিয়রে |

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| নিদমহলে— | শব্দটির অর্থ কি ? এটি দিয়ে একটি বাক্য রচনা কর। (৩) জ্যোৎস্না কার পায়ে রূপার কাঠি বোলায় ? |
| নিতি— | |
| শব্দ অনুশীলন— | |
| শিয়রে ও শিহরে | তুলনীয় :— |
| ব্যাখ্যার অংশ— | "সুন্দর শশাঙ্ক মুখ উজ্জ্বল তপন |
| নিদমহলে……রূপোর কাঠি। | হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।" |
| **চতুর্থ স্তবক—** | **পদ্ধতি পূর্ব্ববৎ** |
| নাগের বাঘের……ধোয়ায় পা'টি | আলোচনার প্রশ্ন— |
| কঠিন শব্দার্থ— | (১) কারা সর্বদা পাহারা দেয় ? |
| নাগের— | (২) সাগর কেন পা ধুইয়ে দেয় ? |
| আড়াল— | তুলনীয়— |
| শব্দ-অনুশীলন— | (ক) "তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে |
| শীতলপাটি/ধোয়ায় পা'টি। | প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।" |
| | —অক্ষয় কুমার বড়াল |

**প্রয়োগ ঃ** -

পাঠের সমগ্র আলোচনা

**প্রশ্নাবলী—**

(১) 'দেশের মাটি' কবিতার রচয়িতা কে ? (২) স্বদেশ বিষয়ে কবিতা লিখেছেন এখন কয়েকজন কবির নাম কর। (৩) কবি দেশকে কোন দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। (৪) আমাদের দেশের কোন কোন বিষয় তোমার ভাল লাগে এবং কেন ?

## ॥ ৪নং পাঠটীকা—ব্যাকরণ ॥

বিষয়—বাংলা ব্যাকরণ বিশেষ পাঠ—বর্তমান কাল

(১) কালভেদে ও পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের বাহ্যিক রূপে যে পরিবর্তন সাধিত হয়—তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া (২) বর্তমান কালের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন। (৩) যুক্তি ও বিচারশক্তির প্রয়োগক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন। (৪) মাতৃভাষায় শুদ্ধরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। (৫) ভাষার তুলনামূলক জ্ঞান অর্জন।

**উপকরণ ঃ**

সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী ব্যাকরণ, তুলনামূলক ইংরেজী বাক্যাবলীর চার্ট ইত্যাদি।

## ইংরেজী বাক্য সমন্বিত চার্ট

| | |
|---|---|
| চার্ট—(১) | 1. Rana goes to school everyday. |
| Present | 2. Sita does not go to market. |
| Indefinite | 3. You do not take tea. |
| চার্ট—(২) | 1. Tapan is taking tea. |
| Present | 2. The servant is sleeping now. |
| Continuous | 3. The students are going back to hostel. |
| চার্ট—(৩) | 1. I have gone to Delhi twice. |
| Present | 2. He has stood first in the examination. |
| Perfect | 3. They have gone to Calcutta. |

**আয়োজন :**

ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা এবং আজকের পাঠের প্রতি তাদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করবেন।

(১) ক্রিয়া পদ কাকে বলে ? (২) দুটি উদাহরণ দাও। (৩) "দুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণ-দণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে।"—এই বাক্যে ক্রিয়া পদ চিহ্নিত কর। (৪) "দেবী সিংহাসনে আসীন হইলেন"—এই বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে পূর্ববর্তী বাক্যের ক্রিয়াপদের পার্থক্য কোথায় ? (৫) "আগামী মাসে আমরা পুরী যাব"—এই বাক্যে কোন সময়ের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে ? কাজটি কি যথার্থই শেষ হয়েছে, অথবা হবে।

**পাঠঘোষণা : শিক্ষকের বক্তব্য :—**

"তাহলে দেখা যাচ্ছে—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অনুসারে ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তন হয়। আর কোন কাজের অনুষ্ঠানের সময়কেই 'কাল', বলে। পূর্ববর্তী তিনটি উদাহরণে আমরা ক্রিয়ার তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানকালের পরিচয় পেয়েছি—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। আজ আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য—বর্তমান কাল।

**উপস্থাপন :**

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| সাধারণ বা নিত্য বর্তমান<br>( Simple Present )<br>উদাহরণ—<br>(১) আমরা প্রত্যহ ভাত ও রুটি খাই। (২) রবিবার বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। (৩) তুমি বাদাম খেতে ভালবাস। | শিক্ষক পার্শ্বলিখিত বাক্যাবলী বোর্ডে লিখে দেবেন। ইংরেজী বাক্য সমন্বিত চার্টটিও তার পাশেই থাকবে। প্রতি তিনি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং বাক্যগুলি ভালভাবে পড়তে বলবেন। |

| **বিষয়বস্তু** | **পদ্ধতি** |
|---|---|
| সংজ্ঞা—কোন কাজ স্বভাবতঃ বা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হলে ক্রিয়ায় সাধারণ বর্তমান কালের রূপ হয়। ইংরেজীতে একে Present Indefinite বলে। "Indefinite—which denotes in its simplest form." —*J. C. Nesfield* | ইংরেজী বাক্যগুলির সঙ্গে কালধর্মগত সাদৃশ্য শিক্ষার্থীরাই আবিষ্কার করবে। আলোচনায় জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন— (১) প্রথম বাক্যটিতে যাওয়ায় ঘটনাটিতে কোন কালের ইঙ্গিত আছে? (২) প্রথম ইংরেজী বাক্যের কাজের কালের সঙ্গে বাংলা বাক্যটির সাদৃশ্য কোথায়? (৩) একই ধরণের কাল বোঝাতে উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের কোন রূপ ব্যবহৃত। অতঃপর শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় সাধারণ বর্তমানের সংজ্ঞা গঠন করবেন। |
| **ঘটমান বর্তমান** Present Progressive or Continuous Tense. উদাহরণ— (১) আমি একটা চিঠি লিখছি। (২) ঢঙ্ ঢঙ্ করে ছুটির ঘণ্টা বাজছে। (৩) ট্রেনটি প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে। ইংরেজী বাক্য— 1. Tapan is Taking Tea. 2. The students are making noise. সংজ্ঞা— কোন কাজ চলছে এখনও শেষ হয়নি, এমন বোঝালে ঘটমান বর্তমান হয়। "Continuous; which denotes that the event is still continuing or not yet completed." —*J. C. Nesfield* | পদ্ধতি পূর্ববৎ। আলোচনার প্রশ্ন— (১) প্রথম বাক্যে চিঠি লেখার কাজটি কি শেষ হয়েছে? (২) ইংরেজী বাক্যের অন্তর্গত কাজের ধরণটি বিচার কর। (৩) উভয় বাক্যের ক্রিয়ায় স্বধর্ম কি সাদৃশ্য বিশিষ্ট। অতঃপর ছাত্রদের সাহায্যে সংজ্ঞা গঠিত হবে এবং শিক্ষক ইংরেজী সংজ্ঞাটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন। |
| **পুরাঘটিত বর্তমান** (Present Perfect) **উদাহরণ—** (১) 'দেশ' পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।' | পদ্ধতি পূর্ববৎ আলোচনার প্রশ্ন— (১) প্রথম বাক্যে পত্রিকা প্রকাশের কাজ কি সমাপ্ত? (২) দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রথম ক্রিয়াপদের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। (৩) ইংরেজী বাক্যে ক্রিয়াপদে কোন জাতীয় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? |

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| **ইংরেজী বাক্য—**<br>1. Your Friend has gone to Calcutta.<br>2. He has done his duty.<br>**সংজ্ঞা**—কাজ শেষ হয়েছে অথচ কাজের ফল বর্তমান আছে এরূপ বোঝালে পুরাঘটিত বর্তমান হয়।<br>"Perfect ; which denotes that the event is in a completed or perfect state."<br>—*J. C. Nesfield* | (৪) বাংলা ক্রিয়াপদে পুরাঘটিত বর্তমান বোঝাতে কি ধরণের পরিবর্তন হচ্ছে ?<br>অতঃপর ছাত্রদের সহযোগিতায় সংজ্ঞা নির্ণয় এবং ইংরেজী সংজ্ঞায় সঙ্গে তার তুলনা। বাংলা 'পুরাঘটিত' কথাটির তাৎপর্য বিচারও করতে হবে। |
| **অভিযোজন**<br>(১) অসুস্থতায় জন্য রহিম স্কুলে আসে না। (২) আমাদের শ্রেণীতে এখন ব্যাকরণের আলোচনা চলছে। (৩) তোমাদের লেখা শেষ হয়েছে। | আজকের পাঠ কতখানি সার্থক হ'ল তা জানার জন্য শিক্ষক অনুরূপ কতগুলি বাক্যের সাহায্যে নেবেন এবং সিদ্ধান্তে আসবেন। |

## ৩নং পাঠটীকা—সাহিত্যের ইতিহাস

| | |
|---|---|
| বিদ্যালয়— | বিষয়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস |
| শ্রেণী—দশম | সাধারণ পাঠ—বাংলা গদ্যের ইতিহাস |
| সময়—৪৫ মিনিট | বিশেষ পাঠ—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠী ও বাংলা গদ্য। |
| শিক্ষক— | |
| তারিখ— | *সুনির্দিষ্ট পাঠ—উইলিয়ম কেরী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রচিত গদ্য। |

**উদ্দেশ্য :—**

(১) প্রারম্ভিক পর্যায়ের বাংলা গদ্যের পরিচয়লাভ।

(২) বাংলা গদ্যের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য বিচারের ক্ষমতা অর্জন।

(৩) সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি ঔৎসুক্য-সৃষ্টি।

(৪) বিদেশী ভারত-প্রেমিকের কাছে অকুণ্ঠচিত্তে ঋণ স্বীকার।

**উপকরণ :—**

(১) উইলিয়ম কেরীর প্রতিকৃতি।

(২) কেরী ও রামরাম বসু রচিত একাধিক মূলগ্রন্থ।

(৩) ( মূল গ্রন্থের অভাবে ) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে নির্বাচিত উদ্ধৃতি নিচয়।

**প্রস্তুতি ঃ** ছাত্র কর্তৃক নিম্নোদ্ধৃত রচনা তিনটি পাঠ :—

(১) "হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ শহরে দুই গালিম পুরুষ শত্রু আছিল : বিস্তর দিন তাহারা এক জনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল, লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তারোয়াল খসিয়া, মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজবন্ত সে আরো এক চোট দিল, সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া শত্রুরে মাফ চাহিয়া কহিল। ঠাকুর, পরাজয় হইয়াছি আমারে জিনিলা, আর কি চাহ?"

—মনোএল-দা—আসসুম্পসাঁও (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—প্রকাশকাল—১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)

(২) "স দিনে যেশু ঘর হইতে যাইয়া বসিলেন সমুদ্রের তিরে। এবং হেন বড় মানব একত্তর হইল তাহার স্থানে তাহাতে তিনি জাহাজে যাইয়া বসিলেন ও সকল মানবা কটের উপর ডাণ্ডাইল। এবং তিনি হিৎ উপদেশ কহিলেন অনেক বিষয় তাহার দিগের বলিয়া দেখ এক বীজবুনক বীজ বুনিতে গিয়াছে বুনিতে ২ কিছু পড়িল পন্থের পাশে ও পক্ষেরা আসিয়া তাহা গ্রাস করিল।"

— মঙ্গল সমাচার মাত্তিযুর রচিত (প্রকাশকাল—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)

(৩) "এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।'

- অক্ষয়কুমার দত্ত। ('ভূগোল' গ্রন্থের ভূমিকা— ৮৪১)

**আলোচনার প্রশ্ন** :—( পদ্ধতি )

রচনা তিনটি ছাত্রকর্তৃক পাঠের পর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করবেন—

(১) প্রথম রচনাটি কোন সময়ের বলে মনে হয়? (২) কি কি কারণে রচনাটিকে বিশিষ্ট বলা যায়? (৩) যে সব শব্দ বা বাক্যাংশ অপ্রচলিত বা অপরিচিত বলে মনে হয়—সেগুলি উল্লেখ কর। (৪) প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে কি কি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে? (৫) কেন তৃতীয় রচনাটি অপেক্ষাকৃত পরিচিত বলে মনে হয়? (৬) দ্বিতীয় ও তৃতীয় রচনার মধ্যে পার্থক্য কতখানি?

## সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত ঃ

( শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে গঠিত )

**অনুকূল বিষয়** ( ১ম ও ২য় ) উদ্ধৃতি

(১) যতি চিহ্নের চমকপ্রদ ব্যবহার
(২) কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিন্যাস অনেকাংশেই যথাযথ
(৩) ফার্সী প্রভাব লক্ষ্যণীয়—এটি শব্দসম্পদের পুষ্টির বিষয়
(৪) প্রকাশভঙ্গী সরল ও লৌকিক রীতির অনুগামী
(৫) পর্তুগীজ রচিত গদ্য প্রাচীন হলেও ভঙ্গীতে আধুনিকতা আছে।

**প্রতিকূল বিষয়** ( ১ম ও ২য় ) উদ্ধৃতি

(১) অন্যবিধ বানানের ব্যবহার ( ডাণ্ডাইল )
(২) শব্দের রূপভেদ ( তারোয়াল )
(৩) কয়েকটি শব্দের আঞ্চলিক রূপ ( আছিল )
(৪) পদবিন্যাসে ভিন্ন রীতি
(৫) বিভক্তির বিশিষ্ট প্রয়োগরীতি ( "জনেরে", "তাহার দিগের" )

ইত্যাদি

**তৃতীয় উদ্ধৃতি ঃ**—অক্ষয়কুমারের রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিনের গদ্যের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

**পাঠঘোষণা ঃ—**

প্রথম রচনাটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের এবং দ্বিতীয় রচনা উনবিংশ শতকের সূচনা কালের। দুটির মধ্যে কাল ব্যবধান থাকলেও অধিকতর সাদৃশ্য রয়েছে। এই দুটি রচনায় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তৃতীয় রচনার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। কিভাবে গদ্যের এই রূপান্তর সাধিত হল তা জানতে গেলে আমাদের ঠিক মধ্যবর্তী কালের অর্থাৎ ১৮০০-১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা গদ্যের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। তাই আজ আমরা উইলিয়ম কেরী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব।

**বিষয়বস্তু**

**উপস্থাপন ঃ—**

(১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—

এই কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। উদ্দেশ্য ছিল এদেশে কর্মরত ইংরেজ রাজকর্মচারীবৃন্দের দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচয়সাধন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিভাগের সূচনা হয়॥

(২) উইলিয়ম কেরী—

এই বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হলেন উঃ কেরী। ইনি ভারতে আসেন ১৭৯৩ খ্রীঃ। প্রথম কয়েক বৎসর বাস করেন মালদহে ও শ্রীরামপুরে।

(৩) সহযোগী পণ্ডিতবৃন্দ

(ক) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (খ) রামনাথ বাচস্পতি (গ) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (ঘ) চণ্ডীচরণ মুন্সী ইত্যাদি

(৪ কেরী-রচিত বা সম্পাদিত গ্রন্থ—

(ক) কথোপকথন (১৮০১) (খ) ইতিহাস মালা (১৮১২) (গ) বাংলা ব্যাকরণ (ঘ) বাংলা-ইংরেজী অভিধান (ঙ) রামায়ণের অনুবাদ (চ) মহাভারতের অংশবিশেষের অনুবাদ (ছ) হিতোপদেশের অনুবাদ

(৫) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থ—

(ক) প্রবোধচন্দ্রিকা (খ) হিতোপদেশ (গ) রাজাবলী (ঘ) বত্রিশ সিংহাসন

**পদ্ধতি**

প্রস্তুতি স্তরে আলোচনার সূত্রে ভাষাগত যে সিদ্ধান্তে ছাত্রগণ ও শিক্ষক উপনীত হবেন—তারই ক্রম অনুসরণ করে শিক্ষক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন এবং কেরী বা রামরাম বসুর কিছু রচনা পড়ে শোনাবেন। প্রশ্ন ও আলোচনার সাহায্যে শিক্ষক এই সব গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিচার করবেন এবং সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বোর্ডে লিখবেন। তারপর তথ্যগুলি শিক্ষক কর্তৃক আলোচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা তাদের তা খাতায় লিখে নেবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও উইলিয়ম কেরীর ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিষয়টি উত্তমরূপে আলোচনা করা প্রয়োজন। এঁদের আবির্ভাব ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত না হলে বাংলা গদ্য যে অনেক পিছিয়ে পড়ত—সে সত্য নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস যে তাঁদের বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল—সে সত্যটিকে শিক্ষক আলোচনা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে গ্রহণ-যোগ্য করে তুলবেন।

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| (৬) রামরাম বসু—<br>(ক) প্রতাপাদিত্য চরিত্র<br>(খ) লিপিমালা<br>(৭) লিপিমালার ভাষার নমুনা—<br>(ক) "একি তুমি কোন মানুষ যে কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা কোথা শুনিয়াছ শুনি আহারে শার্দ্দুল স্থকিত হও।"<br>(খ) "মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা। মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে। তাহার নাম সতী। দক্ষ মহাব্যক্তি।"<br>(৮) গদ্যের বৈশিষ্ট্য :—<br>(ক) ছেদচিহ্নের স্বল্পতা। (খ) বাক্য-গঠনে হ্রস্বতা। (গ) সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার। (ঘ) জীবনধর্মী বাচনভঙ্গীর প্রয়োগ (ঙ) ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য। (চ) তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত বাক্য গঠন রীতির সূচনা। | (১) অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী খ্যাতকীর্তি গদ্য রচনাকার কে? (রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম ও কেরী)<br>(২) উইলিয়ম কেরী কে? তিনি কবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন?<br>(৩) এই কলেজে বাংলা শিক্ষা কেন প্রবর্তিত হয়েছিল?<br>(৪) কেরীর কয়েকজন সহকারী পণ্ডিতের নাম কর।<br>(৫) অন্য পুস্তকের সঙ্গে কি কারণে ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হ'ল?<br>(৬) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।<br>(৭) রামরাম ও মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কতখানি?<br>(৮) এঁদের কাছে কেন আমরা ঋণ স্বীকার করব? |

## প্রয়োগ

| সমগ্র পাঠের অনুশীলন | প্রশ্নসমূহ — |
|---|---|
| | (১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে আমরা কোন অর্থে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক বিকাশক্ষেত্র বলতে পারি?<br>(২) 'গঠনযুগের বাংলা গদ্য বিদেশীদের দান'—আলোচনা কর।<br>(৩) সরল ও সহজবোধ্য বাংলা গদ্য যে অনেক আগেই লেখা হয়েছিল তা কিভাবে প্রকাশ করবে? |

**গৃহকাজ—**

প্রয়োগ স্তরের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছাত্রদের গৃহকাজ হিসাবে নির্দিষ্ট হবে

## ৩নং পাঠটীকা

### ॥ পাঠ-পরিকল্পনা—কবিতা ॥

### রানার—সুকান্ত ভট্টাচার্য

( দ্বিতীয় অর্ধাংশ )

রানার ! রানার !
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরেতে অভাব , পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া ।
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া ।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে ।
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও ।
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে ।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার ! রানার ! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে ?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ?
রানার ! রানার ! ভোর তো হয়েছে— আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?

রানার ! গ্রামের রানার !
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার ;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার ॥

**উদ্দেশ্য :**—(১) রানার কবিতায় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা। (২) কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবের উপলব্ধি। (৩) কবির বিশিষ্ট জীবনদর্শনের পরিচয় লাভ। (৪) অপর সমধর্মী চিন্তার সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য স্থাপন। (৫) হৃদয়ের ভাবাত্মক সম্প্রসারণ।

**উপকরণ :**—কবির প্রতিকৃতি, মূল কাব্যগ্রন্থ, অপর কবির সমধর্মী রচনার সংগ্রহ, রানারের বৃহৎ অঙ্কিত চিত্র।

**প্রস্তুতি :**—(১) রাত্রির পথে যার পদযাত্রা, সেই দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটা রানার কোন নতুন খবর আনার দায়িত্ব নিয়েছে? (২) "তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন"—রানারের জীবন-স্বপ্ন কি? কেনই বা সেগুলি বাস্তবায়িত হয় না? রানারের স্বপ্নকে পলায়নপর গাছের মত মনে করার সার্থকতা কি? (৩) 'আরো পথ, আরো পথ',—এ যদি জীবনের পথ হয়—তবে তার স্বরূপ কেমন? এ কি পথিকের প্রতি কবির উৎসাহবাণী? 'বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ'—এ কি আশ্বাসবাণী যা রূপায়ণপর লক্ষ্যের প্রতি অভিনিবেশ কামনা করে? না কি কোন সংশয়? (৪) 'পৃথিবীর বোঝা' কি? রানারকে ক্ষুধিত বলা হয়েছে কেন? রানারকে সমগ্র পৃথিবীর ক্ষুধিত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে প্রতিপন্ন করাই কি কবির অভিপ্রেত? কেন? (৫) "জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্পদামে"—'ওরা' বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন? অল্প দামে কেনার তাৎপর্যই বা কি?

**পাঠঘোষণা :**—( রানারের চিত্রের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ) এই সেই রানার, যে পৃথিবীর আর সকলের বোঝার ভারে, দায়িত্বের ভারে কম্পিত ; সে উচুতলার মানুষের সেবক অথচ অপরের সেবা লাভে যার কোন অধিকার নেই। যে বিক্রীত এবং বিকৃতিপ্রাপ্ত, জীবনের বঞ্চনা যাকে গ্রাস করেছে রাতের ঘন অন্ধকারের মতই। কবি তাই তারই সহমর্মী—তার যন্ত্রণার অংশীদার হয়ে তাঁর সহানুভূতির হাতটি বাড়িয়ে দেন তারই দিকে, নরম ছোঁয়ায় তারা যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে স্নিগ্ধতার সঞ্চারণের জন্য। কবি তাঁর বাষ্পার্দ্র চোখ দুটি তুলে রানারের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা উচ্চারণ করেন :—

"রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে!"

"রাত শেষ হয়ে/সূর্য উঠবে/কবে ?
ঘরেতে অভাব ;/পৃথিবীটা তাই/মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার/বোঝা, তবু এই/টাকাকে যাবে না/ছোঁয়া
রাত নির্জন/পথে কত ভয়/তবুও রানার/ছোটে
দস্যুর ভয়/তারো চেয়ে ভয়/কখনসূর্য/ওঠে।"

শিক্ষক কবিতাটির মর্যাদা, মহিমা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রদর্শিত পাঠরীতি অনুসারে নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করবেন। পাঠের দ্বারা একটি ভাবগম্ভীর

আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য কবিতাটির অংশ বিশেষ একাধিকবার পাঠ করতে পারেন। শিক্ষকের পাঠভঙ্গী ছাত্রগণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করবে এবং তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র কবিতাটির সরব পাঠের সময় শিক্ষকের অবলম্বিত রীতির অনুসরণ করবে। অতঃপর কবিতাটি ছাত্রগণ কর্তৃক নীরবে পাঠের জন্য নির্দিষ্ট হবে। শিক্ষক পঠিতব্য কবিতাংশটিকে মোট চারটি শীর্ষে বিভক্ত করে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। শীর্ষচারটি এখানে দেখান হল—

(ক) "রানার! রানার!……… কখন সূর্য ওঠে"

(খ) "কত চিঠি লেখে………সহানুভূতির চিঠি"

(গ) "রানার! রানার!………এই দুঃখের কাল"

(ঘ) "রানার! রানার!………দুর্দম, হে রানার"

**বিষয়বস্তু**

**'ক' শীর্ষ—**

"রানার! রানার ·····
কখন সূর্য্য ওঠে"

টীকা ও ব্যাখ্যা

রাত শেষ হয়ে—এখানে রাত কথাটির তাৎপর্য —সংগ্রামী মানুষের মুক্তি—সাধনার কাল। অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতাই সাধনার মূলধন - ভোগের আনন্দ নয়—ত্যাগের দুঃখবরণই একমাত্র ব্রত। রাত যেমন শেষ হয়, তেমনি একদিন দুঃখবরণের কালের অবসান সূচিত হয়।

সূর্য—মুক্তির প্রতীক, অর্জিত স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা। শোষণের কাল কবে শেষ হবে—কবির এই জিজ্ঞাসা।

ব্যাখ্যার অংশ :—

"রাত নির্জন···কখন সূর্য ওঠে।

**পদ্ধতি**

আলোচনার প্রশ্ন —

(১) "এ বোঝা টানার··· ··?" কবির একি শুধুই একটি প্রশ্ন না কি রানারের প্রতি তাঁর দরদী মনোভাবের প্রকাশ?

(২) পৃথিবীকে রানারের চোখে 'কালো ধোঁয়ার' মত মনে হয় কেন?

(৩) "রাত নির্জন ·····কখন সূর্য ওঠে"
—এই অংশটি ব্যাখ্যা কর।

(৪) এই পংক্তির সূর্য এবং তৃতীয় পংক্তির সূর্য ওঠার পার্থক্যের বিষয় বুঝিয়ে বল।

তুলনীয় : (ক) "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"
(প্রসঙ্গ—ঘরেতে অভাব ··)

(খ) লা মিজারেবল—ভিকটর হিউগো।
(প্রসঙ্গ —"পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া"।)

আংশিক ব্যাখ্যা : –

রানারের জীবন আন্তরিক কর্তব্য-পরায়ণতা ও ত্যাগের দ্বারা চিহ্নিত। রানার সেই সব মানুষের দলে, যারা যুগ যুগ ধরে জীবনের সার্বিক বঞ্চনাকে মুখ বুজে সহ্য করে আসছে, তথাপি কর্তব্যচ্যুতির দ্বারা নিজেকে কলঙ্কিত করছেনা। অথচ, তার স্বাভাবিক

**বিষয়বস্তু**

**'খ' শীর্ষ**

"কত চিঠি লেখে……

সহানুভূতির চিঠি।"

অলঙ্কার—

(১) রাত্রির খামে—রূপক অলঙ্কার—
( রাত্রির ও খামের মধ্যে অভেদ কল্পনা )

(২) এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে
পথের তৃণ—সমাসোক্তি অলঙ্কার

(৩) দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি—
উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার

(৪) ভোরের আকাশ পাঠাবে
সহানুভূতির চিঠি—সমাসোক্তি।

ব্যাখ্যার অংশ—

"এর দুঃখের চিঠি……

কালো রাত্রির খামে।"

**পদ্ধতি**

বাঁচার অধিকারকে এই ক্ষয়িষ্ণু, শোষক সমাজ কখনও স্বীকার করে নিচ্ছে না। তার জীবন তাই ক্রমশঃ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে রানারের পথযাত্রা—পথে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে "গুপ্ত সর্প, গূঢ় ফণা"—রাত্রির সহস্রাধিক বিপদ. সেসব মাথায় করেই তাকে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। সে সূর্য ওঠার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত, কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে তাকে গন্তব্য-স্থলে উপস্থিত হতেই হবে। অতএব, তার কাছে জীবন ও তার নিরাপত্তা নিতান্তই গৌণ।

যে রানার তার স্বাভাবিক নৈশ জীবনকে অস্বীকার করে সমাজের জন্যই দায়িত্বপালনে তৎপর—তার পরিবর্তে সমাজ তার বাঁচার অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে কি? এটাই কবির জিজ্ঞাসা।

**॥ 'খ' শীর্ষ ॥**

প্রসঙ্গ—"কত চিঠি লেখে
লোকে……কেউ কোনও দিনও"

তুলনীয়—

"আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে
বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার
বাতি জ্বালার সামর্থ্য;
নিজের ঘরেই জমে থাকে
দুঃসহ অন্ধকার॥"

—সুকান্ত ( প্রিয়তমাসু )

আলোচনার সূত্র—

(১) সমাজের সাধারণ মানুষের নিশ্চেষ্টতা রাত্রির অন্ধকারের মতই। অবস্থার দুর্যোগ-মুক্তির প্রচেষ্টা—আলোক

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| পাঠভঙ্গী—<br>এর দুঃখের কথা/জানবে না কেউ/<br>শহরে ও গ্রামে,<br>এর কথা ঢাকা/পড়ে থাকবেই/<br>কালো রাত্রির/খামে। | যতক্ষণ না দেখা দেয়, ততক্ষণ এই অবস্থার কোন প্রতিকার নেই।<br>(২) রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথা বাদ দিয়ে দেখলে এই অংশটির কাব্য-সৌন্দর্য্য অনুপম বলে মনে হয়। কবির আন্তরিক সহানুভূতি এখানে কয়েকটি অলংকারের সাহায্যে শোষিত জনগণের প্রতীক রানারের উদ্দেশে বর্ষিত হয়েছে। ভাবময়তার প্রকাশ এখানে সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়ায় রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধে উঠে এটি শেষ পর্য্যন্ত কবিতায় বিশুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। |
| **'গ' শীর্ষ**<br>"রানার! রানার!<br>এই দুঃখের কাল"<br>ব্যাখ্যার অংশ—<br>"রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে<br>এই দুঃখের কাল।"<br>টীকা—<br>(ক) আকাশ হয়েছে লাল—<br>মুক্তি-সূর্য উদিত হওয়ার কাল সমাগত। তার পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে জনগণের মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে। কবি সেই কথা বলতে গিয়েই ভোরের রক্তিমাভ আকাশের রূপকটি ব্যবহার করেছেন।<br>(খ) কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিত<br>ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে?....<br>সর্বযুগে বিশ্বের নিপীড়িত সমাজের পরিবর্তনের জন্য কবি-সাহিত্যিকগণ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, শোষকের প্রতি তাই কবির এই জিজ্ঞাসা—তিনি আশা করেন—বঞ্চিতদের মানসিক উজ্জীবন | **'গ' শীর্ষ**<br>আলোচনার প্রশ্ন—<br>(১) "ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি"—এ সহানুভূতি প্রকৃত-পক্ষে কার? (২) "কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে?"—এ প্রশ্ন কবি কেন করেছেন? (৩) "ভোর তো হয়েছে ..." —একি সংগ্রামী মানুষের প্রতি কবির আশ্বাসবাণী, না নব সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির আহ্বানের ইঙ্গিত? (৪) "আলোর স্পর্শে" কথাটার তাৎপর্য কি? |

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| ঘটবে এবং বর্তমান জীবনের অসার্থকতা থেকে তারা আগামী দিনের উজ্জ্বলতার দিকে এগিয়ে যাবে। | |
| **'ঘ' শীর্ষ** | **'ঘ' শীর্ষ** |
| রানার! গ্রামের রানার। <br> ·· ··· দুর্দম হে রানার। <br> টীকা— <br> (ক) শপথের চিঠি—বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গীন সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তারও পূর্বে আবশ্যক আত্মপ্রস্তুতির। বিনষ্টির সম্ভাবনা ব্যক্তিমানুষকে দুর্বল করে দেয়। তাই তাকে কোন বৃহৎ কাজে অংশ গ্রহণের পূর্বে কাজের গুরুত্ব ও কাঠিন্য বিবেচনা করে শপথ নিতে হয়। কবি রানারকে এই শপথের বাণী গৃহ থেকে গৃহান্তরে পৌঁছে দেওয়ার মহৎ দায়িত্ব দিতে চান। <br> (খ) অগ্রগতির 'মেল'— <br> নব জাগরণের আহ্বান বাণী রানার স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে দেবে। যেমন করে সে চিঠির থলে 'মেল ভ্যান' এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে আসে। <br> (গ) দেরি নেই আর— <br> সংগ্রামের কাল সমাগত-মুক্তির কালও। <br> ব্যাখ্যা— <br> "দেখা দেবে ··· ··· ·· <br> দুর্দম হে রানার।" | প্রসঙ্গ— <br> (১) "ভীরুতা পিছনে ফেলে।" <br> তুলনীয়— <br> মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোট এবং অপমানিত করে রাখে সেখানে তার কোন দাবি স্বভাবত কারও মনে গিয়ে পৌঁছায় না।" —রবীন্দ্রনাথ <br> (২) প্রসঙ্গ— <br> 'শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ' <br> অথবা 'আরো বেগে দুর্দম, হে রানার <br> তুলনীয়—"চির অবনত তুলিয়াছে আজ <br> গগনে উচ্চশির। <br> বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি <br> ভেঙেছে কারা প্রাচীর <br> ··· ·· জয় নব উত্থান!" <br> —নজরুল ইসলাম। (ফরিয়াদ) <br> আলোচনার প্রশ্ন— <br> (১) 'শপথের চিঠি'—কিসের শপথ এবং কেন? কাদের কাছেই বা এই চিঠি পৌঁছে দেবে? (২) 'অগ্রগতি' কথাটি এখানে কোন অর্থে প্রযুক্ত? (৩) কবি কেন 'ভীরুতাকে পিছনে ফেলে যেতে বলছেন? (৪) কবি রানারকে 'দুর্দম' বলতে চান কেন? |

## ॥ প্রয়োগ ॥

কবিতাটির ভাব ঐশ্বর্যের সার্বিক উপলব্ধির বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করতে পারেন, —

(১) কবির নাম কি? তাঁর রচিত দু'একটি কাব্য গ্রন্থের নাম কর। (২) সুকান্তের মৌল কবি-ধর্ম দুটি মাত্র সূত্রে ব্যক্ত কর। (৩) এই দুটি ভাব-সূত্রের মধ্যে 'রানার'

কবিতার ক্ষেত্রে কোনটি প্রযুক্ত হতে পারে? (৪) তোমরা কি মনে কর 'রানার' কবিতাটি পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন। (৫) কবিতাটি যে সর্বাঙ্গীন মানবিক দৃষ্টি-সমৃদ্ধ তা কোন কোন লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি? (৬) সুকান্তের সঙ্গে অপর কোন কোন কবির ভাবগত সাদৃশ্য আছে? (৭) পাঠ্য অংশ থেকে তোমার ভাল লাগা চারটি পংক্তি মুখস্থ বল।

।। গৃহকাজ ।।

সমগ্র কবিতাটির একটি রসগ্রাহী সমালোচনা লিখে আনার জন্য ছাত্রগণ শিক্ষক কর্তৃক আদিষ্ট হবে।

## ৭নং পাঠটীকা-কবিতা

কবিতা—"এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে·····"
কাব্যগ্রন্থ—রূপসী বাংলা।
কবি—জীবনানন্দ দাস।
শ্রেণী—দশম।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে-সব চেয়ে সুন্দর করুণ ;
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল ;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গা সঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ ;
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল ;
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর,
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ী লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো বিশালাক্ষী দিয়েছিলো বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

### পাঠ-নির্দেশ

সেখানে লেবুর শাখা/নুয়ে থাকে অন্ধকারে/ঘাসের উপর ;
সুদর্শন উড়ে যায়/ঘরে তার অন্ধকার/সন্ধ্যায় বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ী/লেগে থাকে রূপসীর/শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার/এ বিশাল পৃথিবীর/কোন নদী ঘাসে।
ছন্দ—অক্ষরবৃত্ত। মাত্রা—৮/৮/৬
পাঠভঙ্গী—বিলম্বিত লয়।

**উপকরণ** :—(১) রূপসী বাংলা—মূল কাব্যগ্রন্থ। (২) কবির ছবি। (৩) কবির অপর কাব্যগ্রন্থ। (৪) বাংলা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ক একটি বহুবর্ণ চিত্র। (৫) অন্যান্য সমধর্মী উদ্ধৃতি।

**উদ্দেশ্য** :—(১) মূল কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবের উপলব্ধি। (২) কবির কবি-ধর্মের পরিচয় লাভ। (৩) অপর সমকালীন কবির সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার। (৪) কবির ভৌগোলিক চেতনা-কেন্দ্রিক প্রকৃতি-প্রেম পরিচিতি।

কবি-পরিচিতি ॥ ভূমিকা ॥ প্রারম্ভিক আয়োজন ॥

জীবনানন্দ দাস রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য সাহিত্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল নাম। ইনি বুদ্ধদেব বসুর সম-সাময়িক। ১৩৩৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ঝরা পালক" প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'সাতটি তারার তিমির' 'বনলতা সেন', মহাপৃথিবী', 'বেলা, অবেলা, কালবেলা' এবং 'রূপসী বাংলা'।

১৩৬১ সালে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন জীবনানন্দ। তাঁর জীবন-কালের শেষ কবিতাটি পূর্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু, মানসিকতা—সমস্ত দিক থেকেই তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অনন্য। কি ব্যবহারিক ব্যক্তি-জীবনে কি কবি-সত্তায় তিনি ছিলেন আতুলীন। এক ধূসর অথচ স্বপ্নময় তন্ময়তা তাঁর সমগ্র কবিজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আধুনিক জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্যই তাঁর কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আধুনিক যুগের বিশ্বাসহীনতা, হতাশা, ইতিহাস চেতনা, মৃত্যুচেতনা তাঁর বিবিধ কাব্যের অসংখ্য কবিতায় রূপায়িত। আবার কখনও বা এক অসীম রূপ তৃষ্ণা তাঁকে আকুল করেছে এবং জীবনাতীত ব্যাকুলতা তাঁব মনে এক চিরন্তন পার্থিব পিপাসার উদ্ভব ঘটিয়েছে। সেখানে তিনি স্বপ্নদর্শী, রোমান্টিক। বাংলায় অনন্ত রূপময়তা তাঁকে যেন জীবনান্তর— অস্তিত্ব থেকেও এই পটভূমিতেই আহ্বান জানায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের ধূসরতার জগত থেকে তিনি যেন এক আশ্চর্য্য রূপময় জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং শাশ্বত শান্তির নীড় রূপে বাংলায় এই সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটির বুকে আরবার ফিরে আসতে চেয়েছেন। এক অখণ্ড সময়-চেতনার অধিকারী জীবনানন্দ গভীর অনুভবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাংলায় রহস্যময় রূপলোকে পৌঁছেছেন। তাঁর বিশেষ এই সৌন্দর্যদৃষ্টি অপর সকল কবির প্রকৃতি-প্রেম থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ, তাঁর অন্তরের গভীরে মিশে আছে, ইতিহাসের সীমারেখার বাইরের এক অখণ্ড ও অমলিন জীবনচেতনা।

'রূপসী বাংলা'র সকল কবিতাই এই রূপানুভব ও অনন্ত জীবনাশ্রয়ী সৌন্দর্য স্বাদনার বাণীরূপ। জীবনানন্দ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর কাব্যের অনন্যসাধারণ চিত্রময়তা—যা শুধু দৃশ্যের নয়, স্পর্শ ও গন্ধেরও বটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জীবনানন্দের কবিতা 'চিত্ররূপময়'। আমাদের আলোচ্য কবিতায় এই ধর্মেরই বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাব সন্তোষজনক রূপে।

প্রসঙ্গত জানা প্রয়োজন—'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতাই কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত। কবিতাগুলি সম্পর্কে একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হ'ল—"পঁচিশ বছর আগে (১৯৩২) খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল।"

**॥ সমধর্মী একটি কবিতা ও পাঠঘোষণা ॥**

জীবনানন্দের একটি সুপরিচিত কবিতা পাঠের ভিতর দিয়ে আজকের পাঠ আরম্ভ হ'ক—( শিক্ষক কর্তৃক কবিতা পাঠ ):

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাইনা আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে!
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল;"

**॥ প্রশ্নাদি ॥**

(১) কবিতাটি কেমন লাগল বল। (২) বাংলার প্রকৃতি এর বিষয়বস্তু বলেই কি কবিতাটি ভাল লাগল? (৩) কবির দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ কি? (৪) কবির কাছে পৃথিবীর অন্যরূপ তুচ্ছ কেন?

**॥ পাঠঘোষণা ॥**

"তাহ'লে এস—যে রোমান্টিক দৃষ্টি ও রূপমুগ্ধতা এবং ভৌগোলিক চেতনা থেকে এই কবিতার জন্ম—তার আরও পরিচয় নিই। কবিতাটি হ'ল—

"এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে"

**উপস্থাপন :—**

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| **প্রথম শীর্ষ—**<br>"এই পৃথিবীতে এক স্থান……গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ<br>টীকা—<br>(১) সব চেয়ে সুন্দর করুণ—কবির প্রকৃতি-রূপানুরাগের মধ্যে এক তুলনামূলক | শিক্ষক কর্তৃক সমগ্র কবিতাটির আদর্শ পাঠদান। প্রয়োজন হলে পাঠের পুনরাবৃত্তি। ছাত্রগণ কর্তৃক নীরবে শ্রবণ। শিক্ষককে পূর্ব—নির্দেশিত পাঠরীতি অনুসরণ করতে হবে এবং সুগম্ভীর ধ্বনিতে কবিতাটির ভাব-সৌন্দর্যকে রূপ দিতে |

**বিষয়বস্তু**

পরিচয় আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর মধ্যে তিনি তাঁর শৈশব ও কৈশোরে দেখা প্রকৃতির দৃশ্যকেই শ্রেয় বলে মনে করছেন।

সকল বস্তুর মধ্যে কারুণ্যের অনুভব কবির নিজস্ব মানস-বৈশিষ্ট্য। এক বিশুদ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই তিনি অন্যত্র বলেছেন—

(ক) "মানুষের হৃদয়ের পুরানো নীরব বেদনার গন্ধ ভাসে"

(খ) "অনেক নিবিড় পুরানো প্রাণের কথা কয়ে যায়—হৃদয়ের বেদনার কথা"

(২) সবুজ ডাঙা—

লক্ষ্যণীয় যে, কবি 'জমি' শব্দটি ব্যবহার না করে 'ডাঙা' শব্দটি নির্বাচন করেছেন। এর তাৎপর্য কি? 'ডাঙা' শব্দটিকে আমরা জলের বিপরীতধর্মী শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। তাহলে, কবি অবশ্যই ডাঙা শব্দটিকে জলের অসহায়তায় বিপরীত সত্য অর্থাৎ ডাঙার স্থিতিশীলতার নির্ভরতাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং ডাঙা শুধু আশ্রয়ই নয়—এক সৌন্দর্য-ঋদ্ধ আবাসভূমি।

বারুণী—বরুণ কন্যা/বরুণের স্ত্রী।

বরুণ—জল-দেবতা।

কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী ইত্যাদি—

এই সব নদীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। মানচিত্র ব্যবহার করা না হলেও বর্ণনার দ্বারা তাদের বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে।

**পদ্ধতি**

হবে। কবির আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এব ভাবের বিহ্বলতাকে প্রকাশ করতে হবে। "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে"—যা কথা কবি সগৌরবে বিবৃত করতে চেয়েছে অনুসারী পংক্তিগুলির মধ্যে—ব্যবহা করেছেন অসংখ্য "সেখানে"। কবির এই বিশেষ মনোভঙ্গীটির মূল্য দিতে হবে পুরোপুরি। পাঠের মধ্যেই বুঝিয়ে দিতে হবে—কবি কেন এই বাংলার সৌন্দর্যকেই সমগ্র পৃথিবীতে অনন্য মনে করেছে। তিনি বলেছেন—

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর।"

এবার ছাত্রগণ কর্তৃক নীরব পাঠ তারপর আলোচনার প্রশ্ন—

(১) 'এই পৃথিবীতে'—বলতে কবি কোন পৃথিবীর কথা বলেছেন?

(২) স্থানটি সুন্দর অথচ করুণ কেন

(৩) কবির চিত্তধর্মের সঙ্গে কবিতাটি প্রথম পংক্তির সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

(৪) 'সেখানে গাছের নাম'—পাই ওক, বার্চ নয় কেন?

(৫) "নাটার রঙের মতো" এ উপমান ব্যবহারের সার্থকতা কোথায়?

প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ প্রসঙ্গে শিক্ষ কবিতা মধ্যস্থ বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি উপর আলোকপাত করবেন। কবি মনে ভূগোল ও ইতিহাস-নিষ্ঠা ছিল প্রবল অসংখ্য কবিতায় যেমন তিনি একদিকে বিশ্বপরিক্রমায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে (দ্রষ্টব্য—'বনলতা সেন') 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে তেমনি বাংলার প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতা আমরা লক্ষ

| বিষয়বস্তু | পদ্ধতি |
|---|---|
| (ক) প্রসঙ্গ—নদী<br>১) "এ নদীও ধলেশ্বরী নয় কেন"<br>(২) "এ নদী কি কালীদহ নয় ?"<br>(খ) প্রসঙ্গ—মধুকূপী ঘাস<br>(১) "মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পাবে গৌরী বাংলার"<br>(গ) প্রসঙ্গ—লক্ষ্মীপেঁচা<br>'লক্ষ্মীপেঁচা শ্যামা আর<br>শালিখের গানে তাব<br>জাগিতেছে প্রাণ"<br>ব্যাখ্যা—<br>(১) "এই পৃথিবীতে এক · ···<br>......ঘাসে অবিরল"<br>(২) সেইখানে শঙ্খ চিল......<br>···· অস্ফুট তরুণ ।"<br>টীকা—<br>অস্ফুট--যা তীব্র নয় অর্থাৎ মৃদু—এমন গন্ধের কথা বলতে গিয়েই তিনি তিনি 'অস্ফুট' শব্দটিকে ব্যবহার করছেন।<br>তরুণ—তরুণের তারুণ্য কোমলতা ও সজীবতা। | করি। শ্যামল ও স্নিগ্ধরূপময় প্রকৃতি তাই তাঁর প্রতিটি অনুষঙ্গের উপকরণ হয়ে উঠেছে সার্থকভাবে।<br>কবিতাটির অন্তর্ভুক্ত পৌরাণিক প্রসঙ্গও দেশজ সংস্কৃতি-ইতিহাস সঞ্জাত। যথা—বারুণী, বরুণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদি।<br>পূর্ববঙ্গেব সজল প্রকৃতি কবিব মনোভূমিকে সরস করেছে। উত্তব জীবনেও কবির কর্মজীবনের ধূসরতা তিনি দূর করতে চেয়েছেন—এই কোমল স্মৃতির প্রলেপে।<br>কবির কাছে শঙ্খচিল, পানের বন—উভয়ই প্রিয়; আর গতি চাঞ্চল্যই এই দুই বিপরীতধর্মী অস্তিত্বের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। স্থির পানের বন দেখা কবির উদ্দিষ্ট নয়---তিনি বায়ু—হিল্লোলিত পানের বনই দেখতে চান এবং শঙ্খচিলের পাখার আন্দোলনেও সেই মর্মব-ধ্বনিটি যেন ধরা পড়ে।<br>লক্ষ্মীপেঁচা ও ধানেব অনুষঙ্গটি বড়ই স্বাভাবিক বলে মনে হয়-যাব ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে। |

"সেখানে লেবুর শাখা ···ঘাস আর ধানের ভিতর।

| | |
|---|---|
| টীকা—<br>হলুদ শাড়ী—এমন হতে পারে যে কবি-মনের বৈরাগ্য-চেতনা ও নিরাশক্তি তাঁর চিত্তের রূপমুগ্ধতার উপরেও হলুদ রঙের রূপে ভাসমান। অন্যত্র তিনি কুমারীর শাড়ীর রঙ ধূসর বলেছেন—<br>"ধূসর শাড়ীর গন্ধে আসে তারা অনেক নিবিড়।" | এই অংশটিও শিক্ষক উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে পাঠ করবেন এবং ছাত্রদের কিছু সময় নীরব পাঠের সুযোগ দেবেন। অতঃপর আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন—যা হবে রসগ্রাহী।<br>সমগ্র কবিতাটির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতার সঙ্গে লক্ষ্যণীয় :— |

**বিষয়বস্তু**

তুলনীয়—

(ক) প্রসঙ্গ—সুদর্শন

"হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে।"

(খ) প্রসঙ্গ—হলুদ শাড়ী—

"নক্সাপেড়ে শাড়ীখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর/হলুদ পাতার মতো সরে যায়।"

(গ) প্রসঙ্গ—"এ বিশাল পৃথিবীব" ( ভাবগত )—

"পুরানো প্রাণের কথা কয়ে যায়—হৃদয়েব বেদনার কথা।"

বিশালাক্ষী—দুর্গা।

**পদ্ধতি**

(১) বেদনাময় স্মৃতি চিত্রণ-যার মূলে আছে স্বাদেশিক ভৌগোলিক জীবন-সত্য।

(২) প্রায় সমজাতীয় অনুষঙ্গ ও রূপকল্পের সাহায্যে তিনি বারবার এক বিষণ্ণ মধুব চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী।

"এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে তাবে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো"—অংশটিতে অপব কবির "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"—অপেক্ষা মধুবতর ও বেদনাময় এক অনুভব মিশে আছে।

**প্রয়োগ ঃ—**

পাঠেব পরিপূর্ণ আলোচনা

প্রশ্ন সমূহ—

(ক) কবিব দুএকটি কাব্যের নাম কব।

(খ) অপব সমসাময়িক কবির তুলনায় তাঁব কবিতাব বিশিষ্ট সুরগুলি কি কি?

(গ) কবিতাটি কি করিয়া প্রকৃতি-প্রেম—স্বদেশচেতনা অথবা সূক্ষ্ম কবিমনেব বেদনার প্রকাশ?

**গৃহকাজ**

কবিতাটির একটি রসগ্রাহী সমালোচনা ছাত্রগণ লিখে আনবে।

# বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি

## বিষয় ( Contents ) অংশ

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

### (Group-A)

(1) A brief history of Bengali language and literature. (2) Advanced Bengali Grammar—its characteristics. (3) Rhetoric and Prosody. (4) The Bengali script. (5) Bengali spelling—old and new forms. (6) Study of the prescribed Courses in Bengali in the High and Higher Secondary Schools of West Bengal.

## বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা গড়ে তুলতে গেলে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, বিশেষতঃ তার জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাগত সংস্কৃতির বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। কারণ, অপর ভাষার মতই আমাদের মাতৃভাষাও ইতিহাসের জটিল পথ অনুসরণ করে নানা পরিবর্তনের বর্ণালীরঞ্জিত হয়ে ক্রমে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, ভাষার মৌল বৈশিষ্ট্য অনুসারে আধুনিক বাংলা ভাষাও বহতা নদীর মত ক্রমে নতুনতর অবয়বসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য আমরা গৌরব বোধ করি—তা প্রধানতঃ আর্য-জাতি গোষ্ঠীর জীবনধারা সম্ভূত এবং বৈদিক সংস্কৃতি-চেতনা কেন্দ্রিক। আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে এই দেশ প্রধানতঃ দ্রাবিড, অষ্ট্রোলয়েড ও মঙ্গোলীয় জাতিগণ অধ্যুষিত ছিল। সহজ ভাবে বলতে গেলে, প্রাচীন ভারতে বসবাসকারী জাতিগুলি মোটামুটিভাবে দু'টি ধারায় বিভক্ত ছিল—একটি আর্য্য এবং অপরটি অনার্য্য। তথ্যের দিক থেকে একথা সত্য যে, আর্য্যসভ্যতা তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বলতর হলেও প্রাচীন ভারতীয় অনার্য্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্যও ছিল বিস্ময়াবহ। অনার্য্যগণের উপর আর্য্য সভ্যতার পরিমাণগত আধিক্যকে স্বীকার করে নিলেও বস্তুতঃ সংস্কৃতিগত প্রভাব এবং ঋণ ছিল পারস্পরিক। আর্য্য ও অনার্য্য ভাষাগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেই সে সত্যটি প্রমাণিত হয়।

এখানে সামান্য ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করা প্রয়োজন। ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী হিসাবে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, খাসী, কুকী, লেপচা ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষদের চিহ্নিত করা যায়। এদের আবার কিছু অংশ ভারতের বহিস্থ দেশগুলি থেকে আগত। ঐতিহাসিকদের মতে এদের কিছু অংশ, বিশেষতঃ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থ গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে এসেছিল। এদেরই 'ভোট-চীনা' গোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে ধরা হয়। গারো, চাকমা প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল স্বতন্ত্রতার দ্বারা চিহ্নিত।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে অনার্য্যদের যে উন্নত মানের সভ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রধানতঃ দ্রাবিড় গোষ্ঠী সঞ্জাত। পূর্ব ভারতের জাতি গোষ্ঠীর তুলনায় এদের সভ্যতা ছিল অত্যন্ত উচ্চ মানের। উৎপত্তির দিক থেকে এরাও ভারতের মৃত্তিকা-সম্ভূত ছিল না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—এরা পশ্চিম এশিয়া থেকে বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এদের

সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে ডঃ মজুমদার বলেছেন—"They possessed civilization of very high order. They built forts and navigated rivers & seas for trade & commerce Their laugugage, literature & religion were also in a fairly developed condition" এই সব মন্তব্য থেকে এ সত্যই পরিস্ফুট যে, অপরকে প্রভাবিত করা এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করার মত সভ্যতাগত উঁচু আদর্শ ও মান সৃষ্টিতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

ঐতিহ্যের সূত্রে আমরা আর্য্যগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও, আমাদের ভাষা গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ আর্য্য সভ্যতা-উদ্ভূত ভাষা ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারকে অবলম্বন করেই। তাই তদ্‌সংক্রান্ত তথ্যসূত্রই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। কিন্তু, তার পূর্বে বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তার বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন বিশেষতঃ ভাষা যখন জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়-মাধ্যম।

স্বভাবতঃই প্রাচীন বঙ্গদেশ, তার জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে এখনকার বাংলা দেশ থেকে অনেক পরিমাণেই স্বতন্ত্র ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে ভোট-চীনা গোষ্ঠীর মানুষেরা পূর্ব-ভারতের নানা স্থানে বসবাস স্থাপন করেছিল। এদেশে বসবাসকারী নানা উপজাতির ভাষাও ছিল বিভিন্ন। আঞ্চলিক আদি অধিবাসী, নবাগত এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষদের কালানুক্রমিক মিশ্রণের ফলে শেষ পর্যন্ত জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হ'ল। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও একথা সত্য যে, নবাগত মঙ্গোলজাতীয় লোকেরা বাংলা ভাষী হয়ে বাঙ্গালী জাতির অঙ্গীভূত হবার পূর্বে অন্ততঃ বেশীর ভাগ যে ভোট-চীনা গোষ্ঠীয় ভাষা বলত, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই।'

'গৌড়' ও 'বঙ্গ' এই দুটি শব্দ সুপ্রাচীন এবং পাণিনির গ্রন্থের মত প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দগুলি প্রাচীনকালের বঙ্গদেশে বসবাসকারী অধিবাসীদের উপজাতিমূলক পরিচিতিবাচক ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বঙ্গদেশের সীমা ও অন্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রাচীন বাংলাদেশের আয়তন ও অপর বৈচিত্র্যের বিশেষ মিল ছিল না। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশ তখন ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হত। বর্তমান দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীন নাম হিসাবে সুহ্ম, মধ্য পশ্চিম বঙ্গের নাম রাঢ়, উত্তরবঙ্গের নাম বরেন্দ্রভূমি বা পুণ্ড্রবর্ধন ইত্যাদি আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে পাচ্ছি। অতীতের বাংলার ভৌগোলিক বিস্তার বর্তমান বাংলার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। বর্তমান বাংলার রূপময় অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসের ফল।

ঐতিহাসিক ঘটনার জটিল পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে বঙ্গদেশ বর্তমানে যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন, অতীত বাংলায় ভাষা-সংস্কৃতি ছিল অনার্য্য সভ্যতা

কেন্দ্রিক। আধুনিক কালে এদেশের ভাষা সেই সুপ্রাচীন উৎস থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে এসে আর্য্য ভাষা গোষ্ঠীর নূতন প্রবাহ-পথের গভীর খাতে সবেগে প্রবাহিত হয়ে এক নব তাৎপর্য্য গ্রহণ করেছে। আধুনিক বাঙ্গালীর ভাষা যেমন দ্রাবিড় উৎস সঞ্জাত নয়,— তেমনি অনার্য্য মূল জাতও নয়। এর প্রকৃত উৎস হ'ল বৈদিক এবং সংস্কৃত। অথচ, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উত্তর পূর্ব ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা ছিল অনার্য্য উপজাতিয়। এবিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থানীয় ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য - "বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি থেকেই হোক, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে তা থেকে তারা ( উত্তর ভারত থেকে আর্য্য ভাষার আগমনের পূর্বে ) অনার্য্য ভাষা ছিল বলেই অনুমান হয়।"

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা যে আর্য্য-ভাষা সংস্কৃতির উৎস মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। বাংলা ভাষায় একালের উৎস মাগধী প্রাকৃত বা পূর্বী প্রাকৃতের আলোচনায় আসার পূর্বে তাই খুব সংক্ষেপে আর্য্য-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়টি উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতে আর্য্যগণের আগমন ঘটে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে। তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মধ্য ইউরোপ থেকে উত্তর পশ্চিম ভারতের পার্বত্য অংশ দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেন। এদের সম্পর্কে ডঃ মজুমদার বলেন— "The Aryans belonged to a very ancient stock of human race and lived for long in a far-off region, along with the forefathers of the Greeks, the Romans, the Germans, the English and many other European nations".

এঁরা ছিলেন সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অধিকারী। এঁদের রচিত সাহিত্যই ভারতের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় প্রাচীনতম আর্য্য ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে 'ঋক্‌বেদ'। এর ভাষাকেই বলা হয় 'বৈদিক' বা 'ছান্দস'। কালের ব্যাপ্তি অনুসারে বৈদিক সাহিত্যকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—(ক) বেদ বা সংহিতা (খ) ব্রাহ্মণ (গ) আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক ভাষা ব্যাকরণের অনুশাসনের দিক থেকে অত্যন্ত জটিল। তাছাড়া এই লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষায় পাশাপাশি বর্তমান ছিল লোক-প্রবর্তিত আখ্যানের ভাষা। একদিকে ভাষাগত আত্যন্তিক নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং অপর দিকে লোক প্রভাবজনিত ঔদার্য্য ও শৈথিল্য ভাষা সংস্কারের প্রয়োজনকে ত্বরান্বিত করেছিল। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে বৈয়াকরণ পাণিনির বৈদিক ভাষা সংস্কার তারই ফলশ্রুতি। পরিমার্জনার ফলে নবরূপপ্রাপ্ত বৈদিক ভাষার নামই তাই 'সংস্কৃত'।

জীবনের নিতান্ত স্বাভাবিক বিস্তার-প্রবণতার বশবর্তী হয়েই আর্য্যগণ ভারতের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়লেন। উত্তর ভারতের সভ্য দ্রাবিড়গণ গেলেন নতুন

বাসস্থান গঠনের তাগিদে দক্ষিণ ভারতে। আর্য্যগণ ক্রমে পূর্ব ভারতের দিকেও অগ্রসর হলেন এবং বসবাস স্থাপন করলেন। তাঁদের প্রভাব যে অনার্য্যদের উপরেই পড়ল—তাই নয়, আর্য্যরাও অনার্য্যদের ভাষা ও ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। পারস্পরিক এই প্রভাবের ফলেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ক্রমে তার মার্জিত রূপ পরিহার করে ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিবর্তিত রূপটিকেই আমরা 'প্রাকৃত' বলে জানি। আবার 'পালি' 'প্রাকৃতের' সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। জার্মাণ পণ্ডিতগণের মতে 'পালি' অবন্তী অঞ্চলের কথ্য অপভ্রংশ। আবার আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন পালি শৌরসেনী প্রাকৃতেরই পরিবর্তিত রূপ। প্রাকৃত ভাষার ব্যাপ্তিকাল এইভাবে দেখান যেতে পারে :—(ক) আদিযুগ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০ -২০০ খ্রীষ্টাব্দ (খ) মধ্যযুগ—২০০ খ্রীঃ ৬০০ খ্রীঃ এবং (গ) অন্ত্যযুগ—খ্রীঃ ৬০০—১০০০ খ্রীঃ।

পূর্ব ভারতে প্রচলিত প্রাকৃতকে বলা হয় 'পূর্বী প্রাকৃত' এবং মগধ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের নাম 'মাগধী প্রাকৃত'। এর তিনটি শাখা –
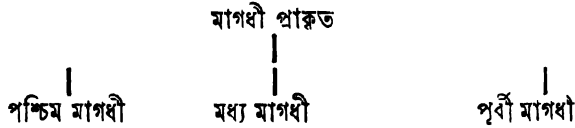
ডঃ সুকুমার সেনেব মতে দশম শতকে এই পূর্বী মাগধীর পবির্বর্তিত রূপ থেকেই বাংলার উৎপত্তি।

প্রাচীন বঙ্গে নবাগত মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীব নিজেদের ভাষা এবং আঞ্চলিক অধিবাসীগণের অনার্য্য ভাষা—এই দুই ভাষাও তাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে খৃষ্টীয় দশম শতকে পূর্বী মাগধী প্রাকৃতকে স্বীকৃতি দানের বিষয়টির মূলীভূত কারণগুলিকে আচার্য্য সুনীতিকুমাব এইভাবে ব্যাখ্যা কবেছেন :—

"বাংলার অনার্য্য, সংঘ শক্তির অভাবে, ঐক্যের অভাবে, আব উত্তর ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের ইতিমধ্যে আর্য্যভাষা গ্রহণেব দৃষ্টান্তে, সহজভাবেই আর্য্যভাষা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা নিয়েছিল।"

## ॥ বাংলা ভাষার যুগবিভাগ ও পরিবর্তনগত বৈশিষ্ট্য ॥

এবার আমরা বাংলা ভাষা ও তার যুগবিভাগ এবং পরিবর্তনগত বৈশিষ্ট্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। বাংলা নব্য-ভারতীয় আর্য্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও যে ভাষাতাত্ত্বিক কারণে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করল সেগুলি এরূপ :—

(ক) অতীত কাল নির্দেশক 'ইল' এর ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংযুক্তি এবং ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশক 'ইব' এর ব্যবহারের সূচনা।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়া পদ—'ইয়া' 'ইতে' যোগে গঠন।

(গ) কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' যোগে শব্দ গঠন।

(ঘ) 'কে' 'রে' সহযোগে গৌণকর্মবাচক শব্দ গঠন এবং

(ঙ) অধিকরণ কারকে 'তে' এর ব্যবহার ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত আমরা মোট তিনটি বিভাগ লক্ষ্য করি :–

(ক) আদি যুগ—৯৫০ খ্রী:—১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ—চর্য্যাগীতিপদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, সেক শুভোদয়া, প্রভৃতির ভাষার মধ্যে এই যুগের ভাষাগত নিদর্শন প্রাপ্তব্য।

(খ) মধ্য যুগ—খ্রী: ১৩৫০—১৭৫০ খ্রী: পর্য্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ও চৈতন্য পূর্ববর্তী ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের ধর্মভিত্তিক বিবিধ শ্রেণীর সাহিত্যের ভাষা।

(গ) আধুনিক যুগ—১৭৫০ খ্রী:—১৯৫০ খ্রী: ভারতচন্দ্র থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত গদ্য ও কবিতার ভাষা।

ত্রিবিধ স্তরে বিভক্ত বাংলা ভাষায় ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বিচারের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মধ্যে রূপান্তরিত ও গৃহীত বাংলা শব্দের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে —

| সংস্কৃত | | প্রাকৃত | | বাংলা |
|---|---|---|---|---|
| উপাধ্যায় | > | উবজ্ঝাঅ | > | ওঝা |
| অবিধবা | | অবিহবা | | এয়ো |
| ইষ্টক | | ইট্‌ঠঅ | | ইট / ইঁট |
| খাদ্য | | খজ্জ | | খাজা |
| ক্ষার | | খার | | খার |
| শেফালিকা | | সেহালিআ | | শিউলী |

এই তালিকাটির অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলির পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে কিভাবে এগুলি শেষ পর্য্যন্ত বাংলা শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে আদি যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন আমরা প্রধানতঃ **চর্য্যাপদ** ও **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন**—এই বিশিষ্ট দুটি সাহিত্যিক রচনায় মধ্যে আছে। তবে তুলনামূলকভাবে এবং কাল-বিচারে চর্য্যাপদের ভাষাই প্রাচীনতম এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্যও সুপ্রচুর। এই দুই গ্রন্থের ভাষায় ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি বিষয়ক আলোচনাটি শেষ হবে।

**চর্য্যাপদ** // একটি উদাহরণ

রাগ—পটমঞ্জরী—বীণা পদ

সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতি॥

বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি-ধনি বিলসই রুণা॥
আলি-কালি বেণি সারি মুণি আ।
গঅবব সমবস সান্ধি গুণি আ॥
জবে করহা করহ কলে চাপিউ।
বতিশ তান্তি ধনি সঅল বিআপিউ॥
নাচন্তি বাজিল গা অস্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥

উদ্ধৃত পদটি আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত হ'ল :—

সূর্য্যকে লাউ হিসাবে গ্রহণ করে, চন্দ্রকে তন্ত্রীর মত সংযোজন করা হ'ল। সেই বীণাব ধারক অনাহত। চাকি (চাকতি) করা হ'ল অবধূতীকে। ওগো সই, হেরুক বীণা বাজছে—শূন্যতারূপ তন্ত্রীধ্বনি করুণার মধ্যে ব্যাপ্ত হচ্ছে। আলি কালি হ'ল দুই স্বর। আর গজবর সমরস হ'ল সন্ধি। দুই হাতেব চাপ দিয়ে যখন বীণায় সুব তোলা হয় তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনিতে সব পরিব্যাপ্ত হয়। বজ্রধব নৃত্যবত হন, দেবী গান সঙ্গীত, বুদ্ধনাটক এরূপই বিংসম হয়।

এটি হ'ল উদ্ধৃত পদটির আক্ষরিক অর্থ। আমরা সহজেই বুঝতে পাবি— কেবল-মাত্র সাধাবণ অর্থ পেলেই পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। কারণ পদটির গভীরে যে রহস্য নিহিত বয়েছে তাই তার গূঢ়ার্থ এবং সাধকের কাছে সেই অর্থই প্রকৃত তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সেজন্য ইপ্সিত। যাইহোক এবাব চর্য্যাপদের ভাষায় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে—

(১) অতীত কাল নির্দেশক 'ইল' এবং ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশক 'ইব' এর প্রয়োগ। উদাহরণ—'গড়িল' 'বাজিল' 'ভাইব' 'দিবি'।

(২) কারক অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে ব্যবহার—
উদাহরণ—'তঁই বিনু' — তোমা বিনা
'অধরাতি ভর' — অর্ধরাত্রি ধ'রে।

(৩) সংস্কৃতে বহুবচনজাত পদ 'আহ্মে' ও তুহ্মে' একবচন হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত — উদাহরণ—আহ্মে দেহুঁ — আমি দিই।

(৪) অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার প্রধানতঃ 'ই' 'ইআ' বিভক্তি যোগ করে গঠিত হ'ত—'সাঙ্কমত চড়িলে' —সাঁকোতে চড়িলে।

(৫) সংস্কৃত 'এন' বিভক্তি থেকে আগত 'এঁ' বিভক্তি— শব্দেন>সাদেঁ। বোধেন >বোহেঁ।

(৬) 'হি' 'এ' 'ত'—ছিল সপ্তমীর বিভক্তি— নিয়ড্ডী=নিঅড়ি। হৃদয়ধি> হিঅহি। সংক্রম+অন্ত>সাঙ্কমত।

(৭) 'কৃত' শব্দ থেকে উৎপন্ন 'ক' বিভক্তির কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকে ব্যবহার —নাশক—নাশের জন্য। ঠাকুরক—ঠাকুরকে।

(৮) 'য়'-শ্রুতি এবং 'ব'-শ্রুতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল—নাবেন>নাবেঁ। নিকটে>নিয়ড্ডী।

(৯) সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হিসাবে 'র' 'এর' ব্যবহার—'রুখের তেন্তুলি' ( গাছের তেঁতুল ), ডোম্বীএর ( ডোমনীর )।

(১০) যুক্ত ব্যঞ্জন সরল হ'ল এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘায়িত হল -- ধর্ম>ধাম। জন্ম>জাম। বৃক্ষ>রুখ ( রূখ ) ইত্যাদি

প্রাচীন-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার উল্লেখ্য নিদর্শন দেখা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে**। এই ভাষা আনুমানিক ত্রয়োদশ / চতুর্দশ শতকের। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় অন্তর্গত শব্দসমূহে প্রাকৃত বা প্রাকৃতজ শব্দের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। কিছু সংখ্যক শব্দে আবার শৌরসেনী ভাষার প্রভাব আছে। সে সব শব্দে 'ণ' কার এবং 'স' কারের আধিক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দসমূহের বানানগুলি এখনকার শব্দের বানান থেকে অধিকমাত্রায় পৃথক। এই বিশিষ্ট বানানের জন্যই যেন এদের দেহে একটা প্রাচীনতার ছাপ পড়েছে। শব্দসমূহের জাতিবিশ্লেষণে যেমন বিবিধ প্রাকৃত শব্দের প্রাচুর্য আমাদের চোখে পড়ে, তেমনি বেশ কিছু সংখ্যক অনার্য্য শব্দও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া নাসিক্য ধ্বনির উচ্চারণ প্রাচুর্য প্রাকৃতজ ভাষাগুলির একটা বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব দেখা যায় ঁ চন্দ্রবিন্দুর অজস্র প্রয়োগে। আরবী ফারসীর মত কিছু বিদেশী শব্দও দেখা যায়—যথা কামান, মজুরী ইত্যাদি। ভাষাগত বিচারের পূর্বে সহজ অনুধাবনের জন্য এবং নমুনা হিসাবে গ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন থেকে একটি পদ এখানে উদ্ধৃত হ'ল :—

> "কে না বাঁশি বাএ বড়াই কালিনী নঈ কূলে।
> কে না বাঁশি বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে ॥
> কে না বাঁশি বাএ বড়াই চিত্তের হরিষে।
> তার পাএ বড়াই মেঁ। কৈলোঁ। কোণ দোষে ॥
> কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
> দাসী হআঁ। তার পাএ নিশিবোঁ। আপনা ॥

সহজেই বুঝতে পারা যায় এটি এমন একটি স্তরের বাংলা ভাষার নিদর্শন—যখন চর্য্যাপদের দুরূহতা ধীরে ধীরে পরিহার করে ভাষার অপেক্ষাকৃত প্রকাশগত সহজতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ব্যাকরণের দিক থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করার একটা সচেতন প্রয়াসও এর মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। তাছাড়া একই শব্দের বানানগত বিভিন্নতার মধ্যেও একটা পরিবর্তনগত এবং স্থিতাবস্থার অভাবের ভাব আমরা লক্ষ্য করি। এটি যে ভাষার মধ্যবর্তী পরিবর্তনের স্তর—তা বুঝতে কষ্ট হয়

-না। যাইহোক, আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় নিদর্শন হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে অমূল্য—তা বলা বাহুল্য মাত্র।

এবার **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা-বৈশিষ্ট্য** সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলীয় ভাষার মধ্যস্থ অধিকাংশ শব্দের অনুরূপ অন্ত্য স্বরধ্বনি সহজেই লক্ষ্যণীয়—

| মূল শব্দ | উচ্চারণ |
|---|---|
| বিকল | বিকল+অ |
| চঞ্চল নয়ন | চঞ্চল+অ নয়ন+অ |

(২) 'রা' বিভক্তি যোগে বহুবচন-পদ গঠন।

আহ্মারা, তোহ্মারা।

(৩) 'ইল' যোগে অতীতবাচক শব্দ এবং 'ইব' যোগে ভবিষ্যৎ বাচক শব্দের ব্যবহার—'শুনিলোঁ', 'করিবোঁ'।

(৪) মহাপ্রাণ নাসিক্য-ধ্বনির মহাপ্রাণতার লোপ—

কাহ্ন>কান। আহ্মি>আমি।

(৫) প্রাকৃত ভাষার অনুসরণে বিসর্গের লোপপ্রবণতা। যথা—বক্ষস্থল।

(৬) পদের প্রথম অংশে অবস্থিত 'অ' কারের 'আ' কারে রূপান্তর।

আতিশয়>অতিশয়। আনন্ত>অনন্ত।

(৭) নাসিক্য মহাপ্রাণের উচ্চারণে মহাপ্রাণতার লোপ অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ থেকে লক্ষ্য করা যায় –

"কপটে কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে।
তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে॥

(৮) যুগ্ম স্বরধ্বনি যুক্ত শব্দের বহুল ব্যবহার : অই—অঈ—আউ আইঞাঁ।

(৯) স্ত্রী প্রত্যয় 'ঈ' খুব বেশী সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে—

(ক) 'কোঁঅলী পাতলী বালী'। (খ) বড়ায়ি চলিলী।

(১০) তৃতীয়ায় 'এ' এবং 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ—'পুরুষের নেহাত্রঁ'। হাথত ধরিআঁ।

(১১) বানানে 'য়' স্থলে 'এ' 'আ' এর ব্যবহার—হএ=হয়। রাখোআল= রাখোয়াল।

(১২) 'শতৃ' প্রত্যয়ান্ত নিত্যবৃত্ত অতীতবাচক শব্দের উদ্ভব হ'ল—ভবন্ত>হৈত।

(১৩) প্রচীন ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক ছন্দ থেকে চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের উৎপত্তি।

(১৪) দ্বিবচনের অভাব এবং 'গণ', 'সব', 'সকল', 'যত' প্রভৃতি শব্দ যোগ ও কোন কোন স্থানে 'রা' যোগে বহুবচন পদ গঠন—যেমন "অহ্মারা মরিব শুনিল কাণে" কিংবা বিকল দেখিআ তথা রাখোআল গণে। পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মনে॥

প্রায় সমকালীন এবং পরবর্তী সময়ের এমনকি চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবকাব্য ও জীবনী সাহিত্যেও এই জাতীয় বানান ও ব্যাকরণগত অন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এতে বোঝা যায় এই জাতীয় ভাষাগত রূপায়ণের ধারা বেশ কয়েকশত বৎসর ধরে চলেছিল। এখানে সামান্য দু একটির উদাহরণ দেওয়া হ'ল—বৈষ্ণব সাহিত্যে 'হৈছে', 'যৈছে', 'কৈল', মুঞি, গোঁসাঞি ইত্যাদি বানান, ষষ্ঠী বিভক্তিবাচক 'ক' এর ব্যবহার—'হাথক দরপণ', 'মাথক ফুল', ক্রিয়াপদে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার—'পেখলুঁ' ইত্যাদি সহজেই প্রাপ্তব্য। একই শব্দের বিবিধ বানান অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চলেছিল।

# বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

॥ সূচনা ॥

বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনার ইতিহাস খ্রীষ্টীয় দশম শতক থেকে সূচিত হলেও সুদূর অতীতকাল থেকেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তার সারস্বত সাধনা শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘকালের এই সাহিত্য প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাঁরা যে একটি উন্নতমানের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন বাংলাদেশের মাটি থেকেই তার আনুকূল্য-সূচক ঐতিহাসিক নিদের্শনা লাভ করেছি আমরাই। বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পূর্বী প্রাকৃতে রচিত লিপি এবং বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ মহারাজ চন্দ্রবর্মার লিপি দুটি প্রাচীন ভাষাচর্চার প্রশ্নাতীত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আমরা শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতে ও প্রাকৃত চর্চায় এমন একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলাম যে এই সাহিত্য কর্মের বিশেষ রীতিটি 'গৌড়ী রীতি' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রাচীনকালের বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনার দু একটি নিদর্শন প্রসঙ্গক্রমে দেখান যেতে পারে। পাল রাজবংশের সময়ে, সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীতে অভিনন্দ 'রামচরিত' নামে রামায়ণকাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। অষ্টম শতকে রচিত ভট্ট নারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটক এবং মুরারি মিশ্র রচিত 'অনর্ঘরাঘব' নাটক বাংলাদেশের সংস্কৃত নাটক হিসাবে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের চর্চা সার্থকভাবে করেছিলেন প্রাচীনযুগের অসংখ্য বাঙ্গালী ধর্মাচার্য। তাঁরা ছোট ছোট কবিতা ও শ্লোক রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তার নিদর্শন পাই 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' নামক দুখানি সঙ্কলন গ্রন্থ থেকে। এই দু'খানি গ্রন্থে তৎকালীন সমাজ-জীবন ভাবনার সম্যক চিত্র প্রাপ্তব্য। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যে ভাষায় "শ্রীশ্রীগীত গোবিন্দম্" রচনা করেছিলেন তার ভাষা সংস্কৃত হলেও মুখ্যত তিনি তার মধ্যে বাঙ্গালী জীবনসুলভ এক নূতন পেলব রীতির প্রকাশ ও প্রয়োগ করেছিলেন।

॥ চর্যাপদ ॥

দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এদেশে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় সাধারণ প্রকাশ মাধ্যম অবহট্‌ঠ ভাষা হলেও উক্ত সময়কালের মধ্যে— প্রাচীনতম বাংলায় তাঁরা যে ধর্মীয় তথা সাহিত্যিক রচনার নিদর্শন রেখে গেছেন তারই নাম চর্য্যাগীতি।

নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই চর্যাপদগুলি ১৩২৩ সালে উদ্ধার করেন। এগুলি পরে তাঁহারই প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রহে মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আছে। কারণ শেষেরটি খণ্ডিত। একই গ্রন্থের মধ্যে চর্য্যাগীতি ছাড়া 'কাহ্নপাদের দোহা' এবং 'ডাকার্ণব' ও সঙ্কলিত হয়েছিল। কিন্তু, বিশেষজ্ঞের মতানুসারে চর্য্যাপদের ভাষাই বাংলা, আর দোহা ও ডাকার্ণবে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার ভাষা অপভ্রংশ।

বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এই পদগুলির রচয়িতা। আমাদের দৃষ্টিতে এগুলিকে সাহিত্য-গুণান্বিত বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এগুলি ধর্মীয় সাধনার অবলম্বনরূপেই রচিত ও নির্দিষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া রচনাগুলিকে কবিতা বলে মনে হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে গীত হওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। সেজন্য যে সব রাগরাগিণী সহ এগুলি গীত হওয়ার কথা সেগুলির পরিচয় প্রত্যেকটি রচনায় প্রারম্ভে উল্লেখিত হয়েছে ) যেমন—রাগ পটমঞ্জরী ( চর্যা ৬, ৭, ৯ ইত্যাদি ), রাগ ভৈরবী ( চর্যা ১২, ১৬, ১৯ ) রাগ কামোদ ( চর্য্যা ১৩, ২৭, ৩৭ ) ইত্যাদি।

ভনিতা থেকে মোট চব্বিশ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে আদি হলেন লুইপাদ। অপর কয়েক জনের নাম এখানে দেওয়া হল— কুক্কুরীপাদ, চাটিলপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, ডোম্বীপাদ, জয়নন্দীপাদ, ধামপাদ প্রভৃতি।

চর্য্যাগীতিগুলি পাঠ করলেই এর ভাষাগত দুরূহতায় প্রতি পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। ভাষা দুর্বোধ্য ও জটিল এবং এগুলির আভিধানিক অর্থ উদ্ধার করায় পরেও এর অর্থগত জটিলতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। তার কারণ এই যে প্রথমতঃ, এগুলি প্রাচীনতম বাংলায় রচিত—যে বাংলা আমরা হাজার বছর আগেকার ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে রেখে এসেছি এবং দ্বিতীয়ত, এগুলির আপাত গ্রাহ্য অর্থসমূহ সিদ্ধাচার্য কবিগণের উদ্দিষ্ট নয়। বরং ঠিক বিপরীত কথাই এখানে সত্য। অর্থাৎ প্রকাশ ভঙ্গীর ইচ্ছাকৃত জটিলতার অন্তরালে সাধন তত্ত্বের গূঢ় রহস্যটি আবৃত রাখাই ছিল তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। রচয়িতাদের শেষ লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন-পদ্ধতি। দুর্বোধ্যতাই তাই এ ভাষার সাধারণ চারিত্রিক গঠন। সম্ভবতঃ একারণেই এই ভাষা 'সান্ধ্যভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সন্ধ্যার ধূসর পট ভূমিকায় আলো-ছায়ার রহস্যময়তাই যেন এর দেহে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এখানে চারটি মাত্র পংক্তি একটি পদের প্রথম অংশ থেকে উদ্ধৃত হল—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তো হৌরি।
নি অ ঘরিণী ণামে সহজসুন্দারী॥"

প্রাথমিক বাংলার নিদর্শনগত বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মগত তাৎপর্যের নিদর্শনের কথা প্রধান হিসাবে গণ্য না করলেও চর্যাপদগুলিকে আমরা গীতি কবিতার সার্থক রূপায়ণ হিসাবে গণ্য করতে পারি। সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির অন্তর্ভুক্তির

সবচেয়ে বড় তাৎপর্য্য সেটাই। যে বাংলা গীতিকবিতা তার অনুপম প্রকাশ সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্যে সীমাহীন ভাবলাবণ্যময় এবং যার ক্রমোন্নতির ধারাটি অব্যাহত ও বিশ্ব সাহিত্যে একটি সুমহান গৌরবময় সত্তায় অধিষ্ঠিত—তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্যই এই সুপ্রাচীন পদাবলীর মধ্যে প্রাপ্তব্য। আর সে কারণেই সম্ভবতঃ এগুলি কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। বাঙ্গালীর ভাব জীবনের সঙ্গে তাই এগুলি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এর ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দার্শনিকতা এবং আদিম বাংলা সাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় একখানি স্মরণীয় সঙ্কলন। এই প্রসঙ্গে আমি দু'জন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

(ক) '-যে গীতিকাব্য প্রবণতা বাঙ্গালির সাহিত্য জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বড়ু চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত গীতি কবিতায় যে অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত—চর্য্যাগীতিগুলিতে বাঙ্গালীর সেই গীতি প্রবণতার প্রথম আভাস পাওয়া যায়।

—মদন মোহন কুমার।

(খ) "বাংলা ভাষায় জন্ম মুহূর্ত্তেই যে তাহার সাহিত্য নিজের মূল ধারা বা মূল স্বর অর্থাৎ গীতি কাব্য খুঁজিয়া পাইয়াছিল, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; তাহা না হইলে আজ বাংলা সাহিত্য জগতের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।" —ডঃ সুকুমার সেন।

## ॥ তুর্কী আক্রমণ ও বাংলা সাহিত্য ॥

ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বন্ধ্যা কাল বলে অভিহিত হতে পারে। কারণ তুর্কী আক্রমণজনিত রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের ফলে জনজীবনে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সামাজিক স্থিতাবস্থা ও জীবনের নিরাপত্তা ব্যতীত সাহিত্যচর্চা সম্ভব নয়।

মহম্মদ বিন বখতিয়ারের নেতৃত্বে তুর্কী সৈন্য বাংলা দেশ আক্রমণ করে এবং দীর্ঘকাল ধরে এই দেশের উপর দিয়ে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হয়। সেকালের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার যুগে এই অত্যাচারের রূপ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আঘাত করে তাকে ধ্বংস করাই ছিল এই আক্রমণের লক্ষ্য। পরবর্তীকালে রচিত 'শূন্যপুরাণে' আমরা এই আক্রমণের বর্ণনা ও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি। এই আক্রমণের কিছু অনুকূল প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল, যার ফলে এসেছিল নতুন এক জাতীয় ভাবসংহতি। সাহিত্যিক প্রেরণার উদ্ভাসের ফলে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির নব রূপায়ণ সম্ভবপর হয় এবং রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ এবং প্রচার সম্ভবতঃ এই নব জাগৃতির ফলশ্রুতি। অবশ্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং চেতনার নব-উদ্বোধনের বিষয়টিও বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি গড়ে উঠেছিল আর্য-অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রনের ফলে। প্রতিকূল শক্তির আবির্ভাবে এই সমন্বয়ের প্রয়োজন আরও বেশী করে দেখা গেল। তাই পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে আমরা যেমন সংস্কৃত ভাষা-ভিত্তিক সাহিত্যের পুনঃপ্রচার লক্ষ্য করি, তেমনি অপর দিকে দীর্ঘ ও গভীর মঙ্গল-কাব্যের বিপুল দেহ গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ লোক ধর্ম সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য প্রেরণায়। পরিস্থিতির বৈপরীত্যের পটভূমিতেই এই আত্ম বিস্তারের প্রেরণার বীজটি অঙ্কুরিত হয়েছিল।

## ॥ প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য ও বিদ্যাপতি ॥

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে যে দু'জন মহাকবির অতুলনীয় কাব্য সাধনায় বাংলা বৈষ্ণব-গীতি কবিতা সর্বাধিক পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁরা হলেন মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার কবি চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হলেও ভাব সাদৃশ্যে, প্রকাশ মহিমায় এবং লোক খ্যাতিতে বাংলার অন্য বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তাঁর নামটি সমশ্রদ্ধায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উচ্চারিত।

বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিদ্যাপতির নামটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এর সম্ভবতঃ দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি ছিল সর্বভারতীয় এবং সেই সূত্রে তিনি বাংলা দেশের ভক্ত সমাজে সমান মর্যাদায় সমাদৃত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এদেশে বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে দৃঢমূল করেছিলেন চৈতন্যদেব স্বয়ং। কারণ তাঁর জীবনীপাঠে জানা যায় যে মহাপ্রভু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই দুই মহাকবির রচনা গান হিসাবে শুনতে খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁর ভক্তরা এই কাজে ব্রতী হতেন।

কবি বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা কবি ছিলেন এবং মৈথিলী ভাষায় তিনি তাঁর বিখ্যাত পদগুলি রচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক পণ্ডিতের বংশে। তাঁর গ্রামের নাম নাম ছিল বিসফী (দারভাঙ্গার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত) এবং পিতার নাম ছিল গণপতি ঠাকুর। পঞ্চগৌড়েশ্বর শিবসিং তাঁকে সভাকবির দুর্লভ সম্মান দান করেছিলেন। বিদ্যাপতির রচিত মৈথিলী ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব এত বেশী ছিল যে, বাংলা ও মৈথিলী ভাষা উভয়ের সংমিশ্রণে 'ব্রজবুলি' নামে এক মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়েছিল এবং এটি শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবগণের আনুকূল্যলাভে ধন্য হয়েছিল। মৈথিলী ব্যতীত বিদ্যাপতি আরও দুটি প্রাচীন ও নবীন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেদুটি ভাষা হল সংস্কৃত এবং অবহট্‌ঠ। অবহট্‌ঠে রচিত বই দুটির নাম হ'ল "কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তি

পতাকা'। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন কিছু সংখ্যক স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থ। এগুলির মধ্যে 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' এবং 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। অনুবিধ গ্রন্থ রচনা করলেও বিদ্যাপতির সর্বভারতীয় সাহিত্যিক খ্যাতি গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণব পদাবলীকে কেন্দ্র করেই। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলে. তাঁর রচিত পদাবলীর মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রভাব দেখা যায় তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—

"বর্ণনা সংযত ও বর্ণাঢ্য হওয়ায় বিদ্যাপতির অঙ্কিত কিশোরী এবং চির-যুবতী রাধার চিত্র যেমন সুপরিস্ফুট হইয়াছে এমন আর কোন পদকর্তার কাব্যে দেখা যায় না। মৈথিল ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘবহুল ধ্বনি এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বিদ্যাপতির পদ-গুলিকে বিচিত্র ভাবে ঝঙ্কৃত করিয়াছে"

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমুগ্ধ নয়নে প্রতিভাত রূপলাবণ্যময়ী স্নানসিক্ত শ্রীরাধার বর্ণনা করেছেন কবি এইভাবে :—

"জাইতে পেখল নহাইলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গারইত বহ জল ধারা।
চামর গলয় জনি মোতিম হারা॥
অলকহি তীতল তঁহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেরল মধু-লোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর পয়োধর সীমা।
কনক বেল জনি পড়ি গেও হীমা॥"

## ॥ পদাবলীর চণ্ডীদাস ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "চণ্ডীদাস সমস্যা' বহুকাল ধরে প্রায় সর্বজন পরিচিত এক সাহিত্যিক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এযাবৎ বহু গবেষক ও পণ্ডিত এই সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। এঁরা হলেন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার, অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু, তবুও যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য সমাধানে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি তা নয়। বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি

একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব, তাঁদের জন্মকাল ও জন্মভূমি, পরস্পরের মধ্যে ভাবগত ও শৈলীগত পার্থক্য, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুঁথির আবিষ্কার, পণ্ডিতগণের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য প্রভৃতি এই সমস্যায় অবয়ব গঠন করেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ একই বিষয়কে অবলম্বন করে বহুবিধ আলোচনাও সঠিক ও ইতিহাসসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি। সেজন্য আমরা চৈতন্য পূর্বযুগের চণ্ডীদাসের বর্তমানতা, বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সমকক্ষতা এবং চৈতন্যদেবের পদাবলীর আস্বাদন-ঐতিহ্য-কেন্দ্রিক মতকে গ্রহণ করেই ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদারের 'চণ্ডিদাসের পদাবলীর' অনুসৃত মতকে আপেক্ষিক প্রাধান্য দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

বিদ্যাপতি-সমকক্ষ পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস বাংলা বৈষ্ণব গীতিকবিতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নাম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে তাঁর পদাবলীও আস্বাদন করতেন—এমন একটা কথা কোন কোন চৈতন্যজীবনীকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। চণ্ডীদাসের জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন ঐতিহাসিক বিবরণী না পাওয়াতেই তাঁর জীবন কাহিনী অনেকাংশে কিংবদন্তী নির্ভর। কেউ বলেন তাঁর জন্মভূমি বাঁকুড়ায় 'ছাতনা' গ্রামে এবং অন্য মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বীরভূমের 'নান্নুর' গ্রামে। তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি হিসাবে গৃহীত হলে তাঁর জন্ম শতক হিসাবে পঞ্চদশ শতক বা চতুর্দশ শতক বলে মেনে নিতেই হয়। আর একটি কাহিনী অনুসারে চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যাই হোক আলোচ্য চণ্ডীদাস যে একজন সহজিয়া সাধক ছিলেন—সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। ডঃ মজুমদার তাঁর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে অন্যূন ১২০টি পদ এই প্রথম শ্রেণীর কবি-রচিত বলে মনে করেছেন।

এখন সংক্ষেপে চণ্ডীদাসের বহু খ্যাত পদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য বিষয়ে একটি আলোচনা লিপিবদ্ধ করা যাক। চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর সাধন-সঙ্গিনী রজকিনী রামীর নামটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এইসব পদে সহজিয়া মরমিয়া সাধনার গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু নির্দেশের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও এগুলির প্রকাশভঙ্গী সহজ, গভীর ও মাধুর্য্যময়। সমগ্রভাবে এগুলিকেই চণ্ডীদাসের পদাবলীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যায়। রামী বিষয়ক একটি পদে সাধক বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধনার মর্মকথা ব্যক্ত করতে প্রয়াসী করেছেন :

"শুন রজকিনী রামী।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥"

বৈষ্ণব-রস-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে চণ্ডীদাস তার সঙ্গে মিশ্রিত করেছেন আপন সাধনলব্ধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য। এভাবেই তাঁর ব্যক্তি-চৈতন্যের আলোক-প্রেরণায় রাধা-মাধবের শাশ্বত প্রেম-ভাবনার অনন্ত মাধুর্য ও গভীরতাকে তাঁর অসংখ্য পদাবলীর মধ্যে রূপায়িত করেছেন। পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং ভাবসম্মিলনের পদগুলিতে চণ্ডীদাস এক তুলনাবিরহিত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জীবনের গভীরতা সঞ্জাত দিব্য কবি-স্বভাব ব্যতীত এমন উন্নত মানের রচনা কখনও সম্ভব নয়।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদগুলিতে চণ্ডীদাস অসীম নৈপুণ্যে এক দুঃখ-দহন-শুদ্ধ প্রেমময় চিত্ত এবং একটি অন্তর্গূঢ় দুর্নিরীক্ষ্য প্রেমগভীরতার বাণীচিত্র এঁকেছেন। এক বিশ্বগ্রাসী তন্ময়তার ভাবমূর্তিরূপে শ্রীরাধার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত "সদাই ধেয়ানে/চাহে মেঘপানে/না চলে নয়নতারা।" এবং "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার/তিলে তিলে আইসে যায়। /মন উচাটন নিশাস যখন কদম্ব কাননে চায়।" একজন মরমী সমালোচকের উক্তিতে চণ্ডীদাসের কাব্য-মূল্য এভাবে নির্ণীত হয়েছে :–

> "চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে দুঃখ আছে—বিরহ বেদনায় বিকশিত চিত্তের আক্ষেপ আছে। কিন্তু এ দুঃখ রাধার চিত্তকে পীড়িত করে নাই, অভিভূত করিয়াছে। রাধার হৃদয়কে বিরূপ করে নাই, বরং দ্রবীভূত করিয়াছে। রাধার দুঃখের মধ্যে বিক্ষোভ নাই, শান্তি আছে। এখানে সমস্ত মত্ততা স্তব্ধ হইয়া আত্মসমর্পণের পরিতৃপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

বস্তুতঃ, এমন মর্মস্পর্শী হৃদয়গভীরতা, যা কবি প্রকাশ করেছেন শ্রীরাধার প্রেম-মণ্ডিতাকে কেন্দ্র করে, তা যেন চিরবিরহী ভক্তহৃদয়ের আকুলতায় মর্মবাণী। চণ্ডীদাসের রাধা সমগ্র ভারতীয় চিরন্তন সাহিত্যে এমন এক সৃষ্টি যা তুলনাবিরহিত এবং সেকারণেই অনবদ্য। রজকিনী রামীর মর্মাশ্রয়ী প্রেমচেতনার কাব্যময় ও শাস্ত্রানুসারী প্রকাশ হিসাবে আমরা যেমন শ্রীরাধাকে পাই, তেমনি মিলনের মাঝেও বিরহকাতরতার মধ্যেই ভক্ত-কবির শাশ্বত ঈশ্বরপ্রেমই যেন হৃদয়দ্রবকারী এই প্রেমভাবনার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে, তা লক্ষ্য করি। তাই রাধার হৃদয় শেষ পর্য্যন্ত সেই রূপান্তরিত কবিহৃদয় যা অনন্তের তৃষ্ণায় নিরন্তর কাতর। তাই চণ্ডীদাসের মিলনের আপাতনিরীক্ষ্য আলোক-উজ্জ্বলতার মধ্যে বিষন্নতার ছায়াময় বলয় ক্রমশঃ ঘনীভূত রূপলাভ করে আমাদের মনকে এক অনির্দেশ্য বেদনায় কাতর করে তোলে :

> "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
> আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥"

## ॥ বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যা যতই সংশয়-ঘন হ'ক না কেন এবিষয়ে কোন
ন্দেহ নেই যে, কবি হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও
কমাত্র তাঁরই রচনা অর্থাৎ একক কাব্য প্রচেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য
তিহাসিক তথ্যসমূহ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হ'ল। একই সঙ্গে আমার মন্তব্যের
থার্থ্যও উদ্ধৃত তথ্যসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হবে।

১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় একটি গ্রাম
কে নিতান্ত আকস্মিকভাবে এই প্রাচীন পুঁথিটি খণ্ডিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন।
র ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।
াদের দেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা-
ত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর এর ভাষাগত প্রাচীনতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হন এবং এটির
নাকাল হিসাবে ১২০০--১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর এই মত
ণযোগ্য বলেই আমি মনে করি। চৈতন্য পূর্ববর্ত্তী রচনার প্রমাণ হিসাবে এই
তকে সহজেই দাখিল করা যায়। তা ছাড়া একথাও সত্য যে, একমাত্র চর্যাপদ
তীত বাংলা ভাষায় এত প্রাচীন নমুনা আর কখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পদাবলীর
ণ্ডীদাসের ভাষা থেকে এই ভাষা এত বেশী ভিন্নধর্মী যে বড়ু চণ্ডীদাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন
ক্তি হিসাবে গ্রহণকরাই যুক্তিসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে উভয়ের রুচিগত ভিন্নতার কথা ত
শেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

তথ্য হিসাবে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রাপ্ত পুঁথিতে গ্রন্থনাম না পাওয়া গেলেও
াবিষ্কৃত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এটির নাম প্রকাশকালে রাখা হয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।
ত্তরকালে এই নামই প্রসিদ্ধি লাভ করে। রচয়িতার নামও অভ্যন্তরস্থ ভণিতা
কে প্রাপ্ত। কবি প্রাচীন বাংলায় কাব্যনাট্যখানি রচনা করলেও জয়দেব এবং
াগবত থেকে প্রায়শঃ উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ
রেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নানা খণ্ডে বিভক্ত। যেমন—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, ভারখণ্ড
ত্যাদি। ভিন্ন নামীয় খণ্ডগুলিতে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনার ভঙ্গী
াটকীয় অর্থাৎ উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক এবং সেগুলির মধ্য দিয়ে এর সামগ্রিক নাট্য-
মিতায় বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। সেকারণ, এই রচনাকে কাব্য না বলে কাব্যনাট্য
লাই সঙ্গত। কোন কোন সমালোচক এটিকে নাট্যগীতি বলেছেন। এজাতীয়
বশিষ্ট্য নিরূপণও অযৌক্তিক নয়। কারণ, অধিকাংশ পদে গেয় সুরটি সম্পর্কে
র্দেশ দেওয়া আছে। সেজন্য সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এটি নাট্যগীতি হিসেবেই
চিত ও প্রচারিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত চরিত্রের সংখ্যা মাত্র তিনটি—
, রাধা এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারিণী দূতী বড়ায়ি। এই তিন

জনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাট্যরস ঘনীভূত হয়েছে। পারস্পরিক বক্রোক্তির ব্যবহার এই ক্রিয়ায় আরও সহায়ক হয়েছে।

রাধা ও কৃষ্ণের লীলাবৃত্তান্ত পৌরাণিক রীতিতে যেভাবে অন্যত্র বর্ণিত, এক্ষে সে রীতি অনুসৃত হয়নি, বরং কবি গ্রাম বাংলায় নিজস্ব লৌকিক রীতিটিই যেন অবলম্বন করেছেন। ফলস্বরূপ, রুচির দিক থেকে যেন এক উগ্র যৌনময়তা এে প্রায়ই স্পর্শ করেছে। এটি চৈতন্যপূর্ব যুগেব জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতিফলন কি কে বলবে? এ তথ্য মনে রাখলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে লোক-কাব্য-নাট্য হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত। শেষে একটুখানি রচনা-উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :—

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্নে গেলা কোন দিশে

অথবা

"তান ভুবনজন মোহিনী।
বতিবস কাম দোহনী॥
শিবীষ কুসুম কোঁ আলী।
অদ্ভুত কনক পুতুলী॥

## ॥ মধ্যযুগীয় অনুবাদ-সাহিত্য ॥

পঞ্চদশ শতকে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে এলে সাহিত্য সৃষ্টিব ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়। মৌলিক রচনার পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্য তাব সমগ্রতা ও বিশালতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যিক সমৃদ্ধি সম্ভব হয় মৌলিক রচনা ও অনুবাদের সুষম সমন্বয়ের ফলেই এবং অনুবাদের মধ্য দিয়ে অন্য দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং এইভাবে সাহিত্য জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও ভাবের ঐশ্বর্য আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলে। মধ্যযুগের বাংলা দেশে একদিকে যেমন মৌলিক রচনা দেখা দিয়েছিল—বৈষ্ণব পদাবলী, বিবিধ মঙ্গল-কাব্য এবং চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যকে অবলম্বন করে—অপরদিকে তেমনি নবযুগ সৃষ্টিকারী প্রতিভাশালী অনুবাদকগণের আবির্ভাবের ফলে কয়েকখানি চিরায়ত সাহিত্য সম্পূর্ণ নূতনরূপে আমাদের সংস্কৃতি-সংসারে আবির্ভূত হয়ে আমাদের রস পিপাসাকে চরিতার্থ করেছিল। এঁরা যে শুধু অনুবাদক ছিলেন—তা নয়। কারণ, নামতঃ এগুলি অনুবাদ হলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল জাতীয়-জীবন রসধারাপুষ্ট নতুন-সৃষ্টি। অনুবাদ সাহিত্যে এযুগে যারা কালজয়ী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন **কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসু।** এঁরা যথাক্রমে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুবাদ করেছিলেন।

**॥ কৃত্তিবাস ॥**

কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সেই কোন সুদূর অতীতকাল থেকে। গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হলেও ভৌগোলিক ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না বিশ্বের তাবৎ সমৃদ্ধ ভাষার এই দুই মহাগ্রন্থ অনুদিত হয়ে আজ সমগ্র বিশ্বের হয়ে উঠেছে। একই কারণে প্রধানস্থানীয় ভারতীয় ভাষায় এই দুটি মহাকাব্য দিত হয়ে জনগণের ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য-তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করেছে। যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলাতে অনুদিত হয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে এবং জাতির তার চিরন্তন বাণীটি প্রবেশ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে তার ধ্যে আদিকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ প্রধান এবং কৃত্তিবাস সেই কবি যিনি জাতীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মূল রামায়ণকে অনুবাদ ক'রে তার একটি অভিনব হৃদয়রঞ্জক রূপদান করেছেন। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে এই অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন হলেও তার উজ্জ্বল্য ও সাহিত্যিক মাধুর্য্য আজও অম্লান রয়েছে। বাল্মীকি থেকে কিছু পরিমাণে দূরে সরে গিয়ে, বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবনভাবনাকে যিনি স্বকীয় প্রতিভাবলে এই মহাকাব্যের জীবনের সঙ্গে অঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন —তিনিই কৃত্তিবাস।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এমন একজন লব্ধকীর্তি কবির জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ প্রামান্য কিছুই জানা যায় না। আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত তাঁর 'আত্মপরিচয়' বলে কথিত একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণী থেকে কৃত্তিবাসের জীবনবৃত্তান্ত এবং কাব্যসৃষ্টি বিবরণের ইতিহাস নির্মাণে পণ্ডিতবর্গ চেষ্টিত হয়েছেন। কৃত্তিবাসের এই আত্মবিবরণীটি প্রামান্য হিসাবে গৃহীত হ'লে, এর অন্তর্ভুক্ত তথ্যসমূহও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে হয়। যাই হোক, এই আত্মবিবরণী থেকে প্রাপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত এখানে খুব সংক্ষেপে পরিবেশিত হল।

কবির নিবাস ছিল নদীয়া জেলায় অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে। এঁরা ছিলেন মুখটি ব্রাহ্মণ। কবির প্রপিতামহের নাম ছিল নরসিংহ ওঝা। ইনি পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন এবং বেদানুজ মহারাজা'র মন্ত্রী ছিলেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন এই বেদানুজ মহারাজা ছিলেন গৌড়ের অধিপতি দনুজমর্দন গণেশ। মুসলমান উপদ্রবের সময় নরসিংহ ওঝা গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এরই এক পৌত্রের নাম মুরারি ওঝা। মুরারির সাত পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল বনমালী এবং এই বনমালিই ছিলেন কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মাল্লিনী। কবির জন্ম হয়েছিল মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এবং রবিবারে। শিক্ষাকাল উপস্থিত হলে কবি বড়গঙ্গা পার হয়ে বরেন্দ্রভূমিতে পড়তে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন।

পাঠ সমাপনান্তে কবি বাংলা দেশের রাজধানী গৌড়ের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। ( কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর এই স্থলে কিন্তু কোন রাজার নাম পাওয়া যায় নি। তাই গবেষকগণ আংশিক তথ্য এবং আংশিক অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন।) রাজার প্রশস্তিসূচক সাতটি শ্লোক তৎক্ষনাৎ রচনা করে তিনি রাজার কাছে পাঠালে রাজা শ্লোকগুলি শুনে যথেষ্ট প্রীত হন এবং কবিকে পুষ্পমাল্য এব পাটের পাছড়া ( কাপড় চাদর ) দানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর রাজার আদেশে কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা ( অনুবাদ) করেন।

রাজার বিষয় এবং কাব্য রচনায় কাল বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত হল—

"পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস বা গণেশ ও তৎপুত্র যদু ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর হন নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজা কংস বা গণেশের অথবা যদুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানো হইবার কথা। কিন্তু কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে লোকের মুখে মুখে ভাষা পবিবর্তিত হইয়া একেবারে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে।"

এবার কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক। কৃত্তিবাস সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তার কাব্যরচনার সময় যথাসম্ভব আদিকবিকে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি প্রাচীন পুঁথিতে এইরূপ অনুসরণের প্রমাণ সুস্পষ্ট। বাল্মীকি রামায়ণেব মত কৃত্তিবাসও তাঁর রামায়ণে রামেব পিতৃভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা, বাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ব, রামের ঐতিহাসিক ত্যাগ এবং প্রজানুরঞ্জন, সীতার শাস্ত্রানুসারী পতিভক্তি প্রভৃতির সুন্দর চিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

কিন্তু, অধিকাংশ স্থলে তিনি তাঁর কবিপ্রতিভার স্বকীয়তাকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যকে জাতীয় জীবন বৈশিষ্ট্যের এক শ্রেষ্ঠ ভাবময় প্রতিরূপে পরিণত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাব্য আমাদের জাতিগত অভিপ্রায়কেই যেন ব্যক্ত করেছেন। বাংলায় নিজস্ব গৃহগতপ্রাণ জীবনধারা, গার্হস্থজীবনের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য-সমূহ এবং প্রধানতঃ সীতার জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্যপীড়িত পারিবারিক জীবনের মর্মবেদনার এক বেদনাঘন চিত্র কবিকর্তৃক পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ যথার্থই আমাদের **জীবনকেন্দ্রিক জাতীয় কাব্য।**

কৃত্তিবাস ব্যতীত অন্যান্য যেসব কবি রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা সকলেই চৈতন্য-পরবর্তী যুগের। এদের মধ্যে নিত্যানন্দ আচার্য্য, কৈলাস বসু, দ্বিজ ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, চন্দ্রাবতী, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি

বিখ্যাত। নিত্যানন্দ আচার্য্যের রামায়ণ 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে খ্যাত। অষ্টাদশ শতকে রচিত রামায়ণের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত হ'ল রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত 'রামরসায়ন'।

**॥ কাশীরাম দাস ও মহাভারত ॥**

রামায়ণের মত মহাভারতও সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে চিরায়ত মহাকাব্য। বিভিন্ন সময়ে যেমন বিভিন্ন কবি রামায়ণ অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তেমনি ঘটনা মহাভারতের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে কবিগণের সংখ্যাধিক্য থাকলেও রামায়ণে যেমন কৃত্তিবাসই প্রথমস্থানীয়, অনুরূপভাবে অনগণ্য মহাভারত অনুবাদকগণের মধ্যে কাশীরাম দাসের নামই সাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছে।

কালের বিচারে অবশ্য কৃত্তিবাস বেশ কিছু পূর্ববর্তীকালের এবং কাশীরামের কাব্যের রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ ধরলে উভয় কবির মধ্যে কাল ব্যবধান হয় আনুমানিক দেড়শত বৎসর।

রামায়ণের ক্ষেত্রে যেমন কৃত্তিবাস সাধারণের জনপ্রিয় কবি, মহাভারতের অনুবাদেও তেমনি কাশীরাম সকল কবিগণের খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়ে নিজ গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশনারীগণ কর্তৃক মহাভারতের অনুবাদের প্রকাশ এই খ্যাতির ব্যাপ্তির যে সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য অনুরূপ প্রচেষ্টা রামায়ণের ক্ষেত্রের অব্যাহত ছিল। মহাভারত অনুবাদ প্রসঙ্গে আমাদের একটি তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন। কাশীরামের মত স্বল্প সংখ্যক কবিই মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। অধিকাংশ কবিই মহাভারতের পর্ববিশেষ রূপায়ণে তাঁদের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে অনুবাদক কবি-গোষ্ঠীর সকলেই কোন না কোন উপযুক্ত বিত্তশালী বা সাহিত্য প্রেমিকের আনুকূল্য ও প্রেরণালাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস এক অর্থে অনুরূপ পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস।

কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসের জীবনবৃত্তান্তও খুবই স্বল্প পরিমাণে জানা গিয়েছে। রীতিসম্মত তাঁর আত্মপরিচয়ের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল :—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপরস্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগিরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥"

এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলার উত্তরে অবস্থিত ইন্দ্রাণী নামক পরগণায় ব্রহ্মাণী নদীর তীরে সিঙ্গি নামক গ্রামে কাশীরাম দাস বসবাস করতেন। তাঁর প্রপিতামহের নাম ছিল প্রিয়ঙ্কর। পিতামহ ও পিতার নাম ছিল যথাক্রমে সুধাকর ও কমলাকান্ত। কবি কমলাকান্তের মধ্যম পুত্র ছিলেন। কাশীরামের তিন ভ্রাতাই সাহিত্যিক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কাশীরাম দাস যখন মেদিনীপুরে কোন রাজার আশ্রয়ে শিক্ষকতা করতেন তখন পণ্ডিতগণের মহাভারত পাঠ ও শাস্ত্রালোচনায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি মহাভারত অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেন। মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে যদিও আমরা কাশীরাম দাসের নামে সম্পূর্ণ অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত প্রচলিত দেখি, তথাপি এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ বিরাট পর্ব রচনা করে তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস বাকি অংশ রচনা করেন। কিন্তু, এ বিষয়েও ডঃ সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

কাশীরাম দাসের রচনাশৈলী ও অন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :—

> "কাশীরাম দাস খুব ভাল সংস্কৃত জানিতেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে কেবল পাণ্ডিত্যের দীপ্তি নাই, কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির পরিচয়ও আছে। ভাষার পারিপাট্য ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলিতে গেলে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যেই ভারতচন্দ্রীয় যুগের আগমনধ্বনি শুনা গিয়াছিল। এ কবির ভাষা ও উপমা প্রভৃতি ভারতচন্দ্রীয় যুগকে মনে করাইয়া দেয়।"

**মহাভারতের অপর অনুবাদকবৃন্দ—**

মহাভারত অনুবাদকগণের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। ইনিই 'পরাগলী' মহাভারত রচনা করেছিলেন। তুর্কী বিজয়ের পর হুসেন শাহ তাঁর কর্মচারী পরাগল খাঁকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মহাভারতের কাহিনী শোনার পর তিনি সমগ্র মহাভারত সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পাঠ সমাপনের যোগ্য একখানি মহাভারত রচনা করার নির্দেশ দেন। পরাগলী মহাভারত এই রাজকীয় কৌতূহল এবং নির্দেশেরই ফলশ্রুতি। এখানে পরাগল খাঁর মহাভারতের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি এবং তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী কালের বাংলার শাসকবর্গের সংস্কৃতি-প্রেমিকতা—এই দুটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদকবৃন্দের মধ্যে দ্বিতীয় কবি হলেন সঞ্জয়। ডঃ দীনেশ

সেন তাঁর প্রণীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির অস্তিত্ব ও রচনা বিষয়ে নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসুও ডঃ দীনেশ সেনের মতের প্রতি সমর্থন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অপরপক্ষে ডঃ দীনেশ সেন ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে সঞ্জয় ভণিতা যুক্ত মহাভারতের পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করেন এবং তাঁর গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ তিনি সঞ্জয়ের মহাভারত থেকে ভণিতার অংশটুকু উপস্থাপিত করেন :

"সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়।"

অথবা, "সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা।"

সঞ্জয়ের দেশ ও কাল সম্পর্কে কিছু পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। তবুও একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, সঞ্জয় যথার্থই বর্তমান ছিলেন এবং একদা মহাভারত অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সঞ্জয়ের মহাভারতকে কেন্দ্র করে বিশেষতঃ সমগ্র পূর্ববঙ্গে যে লোকখ্যাতি গড়ে উঠেছিল—তার থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি।

মহাভারত অনুবাদকবৃন্দের মধ্যে তৃতীয় প্রাচীন খ্যাতিমান কবি হলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ডঃ সুকুমার সেন প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনুদিত মহাভারতের নাম ছিল 'পাণ্ডব বিজয় পাঞ্চালী'। গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হলেও সমাপ্ত হয়েছিল—এমন অনুমান কেউ কেউ করেছেন। যাই হোক, তাঁর রচনার মধ্যে কৃতিত্বের সাক্ষ্য পরিস্ফুট।

এর পর শ্রীকর নন্দীর 'অশ্বমেধ পর্বে'র উল্লেখ করতে হয়। পূর্বেই আমরা পরাগলী মহাভারতের বিষয় আলোচনা করেছি। আলোচ্য মহাভারতখানি সেই পরাগল খাঁর পুত্র নসরৎ খানের (ছোট খাঁন নামে পরিচিত) আদেশক্রমে শ্রীকর নন্দী কর্তৃক রচিত। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ববর্তী মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তৃপ্ত হতে পারেন নি। জানা যায় যে, শ্রীকর নন্দী কেবলমাত্র অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে বেশ বিস্তৃত আকারে তাঁর মহাভারত রচনা করেন। তাঁর তথ্যাশ্রয় ছিল জৈমিনি সংহিতা।

এ সকল রচনা ব্যতীত রামচন্দ্র খান এবং রঘুনাথ অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে মহাভারত রচনা করেন। এঁদের রচনার প্রাচীন নিদর্শনও পাওয়া গেছে। তাছাড়া কবি অনিরুদ্ধ কুচবিহারের রাজা শুক্লধ্বজের অনুরোধক্রমে ভারত পাচালী রচনা করেছিলেন। রচনার এই সব ব্যাপকতা থেকে মহাভারতের বাংলা অনুবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বই প্রমাণিত হয়।

## চৈতন্য-জীবনী সাহিত্য

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণের সঙ্গেই সমগ্র ভারতে এক নবযুগের সূচনা হয়। জন্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশের হলেও তাঁর জীবন ও কর্মপ্রভাব সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবরসে মণ্ডিত করে তাকে নবসৃষ্টির গৌরব দান করেছিল। চৈতন্যদেবের জীবনকালের মধ্যেই তাঁর সামগ্রীক চারিত্র্য-প্রভাব সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রেমময় সত্তার অখণ্ড ভাবমূর্তি সমগ্র ভারতীয় জীবনে এক জীবন্ত দেবমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সংস্কৃতি ভারতের মর্মমূল থেকে উত্থিত হয়ে একটি সার্বিক বিশিষ্টতা লাভ করেছিল—তিনি সেই ধর্মীয় সংস্কৃতির দার্শনিক রহস্যময়তার আবরণ উন্মোচন ক'রে নিজের জীবনে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনে এক পরম প্রয়োগময় সত্যে রূপান্তরিত করলেন। মহাপ্রভু তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের ঐশ্বর্য্যের জ্বালাময়ী দ্যুতিকে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত করে অলৌকিক শক্তিবলে নিজের মধ্যেই তার প্রেমময় প্রকাশ ঘটালেন। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই প্রাচীন বৈষ্ণব সংস্কৃতির দার্শনিক তত্ত্বগত জটিলতা একটি প্রকাশময় ও প্রয়োগযোগ্য প্রেমভাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং এই ভাবেই একদিকে যেমন তিনি নবসংস্কৃতির প্রবর্তন করলেন, অপরদিকে তেমনই যথার্থ ভাগবত-প্রেমের স্বরূপ কি তা জানালেন সমগ্র ভারতবাসীকে।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তাই চৈতন্যদেবই সংস্কৃতির কেন্দ্রমূলে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর পরিবেশিত প্রেমধর্মের চর্চার দ্বারাই ভারতবাসী এক নব মানস-প্রেমের আস্বাদন লাভ করে ধন্য হয়েছিল কারণ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে যা ছিল শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি, সাধারণ জাগতিক মানুষের কাছে তাই ছিল মানবপ্রেম। অতএব, বাস্তব বিচারে প্রায় তখন থেকেই ভারতবাসী চৈতন্যদেব প্রচারিত প্রেমধর্ম থেকে এক নতুন মানবপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করলো এবং বহুশত বৎসর পরে ভগবান বুদ্ধের প্রেমধর্ম যেন আবার এই মহামানবের জীবনের সূত্রে প্রকাশিত হয়ে সমগ্র দেশকে আলোকোদ্ভাসিত করল।

চৈতন্য দেবের লোকাতীত দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বর্ণাশ্রম-আশ্রিত সমাজব্যবস্থার বিভেদ-সত্যকে যেন প্রচণ্ড প্রেম শক্তিতে পরাভূত করে আচণ্ডালে তাঁর প্রেম বিতরণ করলেন এবং সকল জীবনই যে কৃষ্ণ প্রেমাশ্রিত এই মহান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রচলিত সমাজ-শ্রেণীকে অস্বীকারের ভিতর দিয়েই তিনি যথার্থ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা সমান বলে স্বীকৃতিলাভ করল। এটি যে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন তাতে আর সন্দেহ কি? এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমের বাণী মানুষের মর্ম স্পর্শ করলে এবং মহাপ্রভু যে 'প্রেমের ঠাকুর' এই অভিধা দানের সূত্রেই সমগ্র জাতি যেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করায় কোন সঙ্গত কারণ নেই। কারণ, এককথায় সাহিত্য তো জীবনেরই ইতিবৃত্ত! তাছাড়া, নিছক তথ্যের দিক থেকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে জীবনী ও পদাবলী সাহিত্যে যে সৃষ্টির জোয়ার এল তা বিগত হাজার বছরের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব বলে বিবেচনা করা সঙ্গত। পরবর্তী যুগে আমরা দেখেছি এরূপ জীবনী সাহিত্যই আধুনিক যুগে অন্যতম প্রধান সাহিত্য-শাখা হয়ে উঠেছে এবং ক্রমে জীবনীগ্রন্থ তথ্য ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু, চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, একাধারে সেগুলি তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস-গ্রন্থ, ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা এবং অলৌকিকত্বের উপস্থাপন। এর মূলে ছিল চৈতন্যদেবের মানব দেহের আধারে প্রকাশিত আলোকজ্জ্বল দৈবী মহিমা অথচ তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন সংখ্যাতীত মানুষের মাঝেই। সংশ্লিষ্ট ভক্ত, ভাবুক ও শিল্পীমনে তাই এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রেরণার উদ্ভব হয়েছিল—যার ফলে এই শিল্পীকূল বিবিধ শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় কাজে ব্রতী হয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গঠনও করেছিলেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তাঁর মত বাংলা সাহিত্যকে সৃষ্টির প্রেরণায় এতটা প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তুলতে পারেন নি। নিজে একটি পঙ্‌ক্তি রচনা না করেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক অদ্বিতীয় পুরুষ।

## ॥ সংস্কৃতভাষায় চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ॥

চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রেরণা সঞ্জাত সাহিত্যকে তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ চৈতন্য দেবের জীবন কাহিনী অবলম্বনে দীর্ঘায়তন জীবনী গ্রন্থ, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ভাবজীবনকে আশ্রয় করে বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পূরক পদাবলী রচনা - যে গুলোকে আমরা গৌরচন্দ্রিকা বলে জানি; এবং তৃতীয়তঃ তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণা পুষ্ঠ এবং ব্যাখ্যা প্রেমতত্ত্বের মাধুর্য্য অবলম্বনে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারী পদাবলী সাহিত্য সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, কবিও জীবনীকারের সঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ বহু পণ্ডিতও এই ব্রতসাধনে তৎপর হয়েছিলেন—তাই এই ভাষাতেই চৈতন্য বিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত ও প্রচারিত হয়েছিল। সেকারণেই বাংলা সাহিত্যের গবেষকগণ এইসব সংস্কৃত রচনায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন—নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বলেই।

## ॥ মুরারি গুপ্তের কড়চা ॥

সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্য-বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা-ই পূর্বসূরীত্বের দাবী করতে পারে। গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' হলেও লোক সমাজে তা কড়চা নামেই আখ্যাত হয়েছিল। মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীহট্টের অধিবাসী এবং মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। নবদ্বীপে তিনি মহাপ্রভুর সহপাঠী এবং ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন বলে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতায় উদ্ভবও ছিল স্বাভাবিক। তথাপি একথা সত্য যে, চৈতন্য জীবনীকারগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের অবতাররূপে চিত্রিত করেন এবং পরে বিষয়টি বহুলতা প্রাপ্ত হয়। মুরারি গুপ্ত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মহাপ্রভুর জীবনের প্রারম্ভ থেকে অন্ত্যলীলা পর্য্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সকল ঘটনায় ঐতিহাসিক রূপদান করেছেন এবং সেই সঙ্গে সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যাদানে সমৃদ্ধও করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে তাঁর গ্রন্থরচনার কাল—১৫৩৩-১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ।

## ॥ কবি কর্ণপুর ॥

সমসাময়িক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে যে সকল জীবনীকারের আবির্ভাব হয়েছিল কবি কর্ণপুর তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন হলেও এই নামেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চৈতন্য পার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। মহাপ্রভুর সঙ্গেই তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং নীলাচলে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। ভক্ত পণ্ডিত হিসাবে তিনি চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁর অপার্থিব করুণালাভে ধন্য হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর দিব্যপ্রণয়োন্মাদ ভাবঘন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল এবং এই দুর্লভ অভিজ্ঞতাকে তাঁর চৈতন্যবিষয়ক কাব্য ও নাটক রচনায় নিয়োজিত করেছিলেন। কবি কর্ণপুর রচিত মহাকাব্যের নাম ছিল 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'। কবি যখন এই কাব্য রচনা করেন তখন বয়স বেশী নয়। অথচ বয়সের তুলনায় অধিক মাত্রায় নিপুণতা এই কাব্যরূপায়ণে তিনি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রন্থ মধ্যস্থ তথ্য অনুসারে এই কাব্যের রচনা কাল ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

তাঁর রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক'। নাটকটি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সময়ে রচিত হয়েছিল। এই নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পরবর্তী ঘটনাসমূহ। এই গ্রন্থের নাটকীয় বিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি কর্ণপুর রচিত তৃতীয় গ্রন্থটির নাম—'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'। চৈতন্যদেবের পার্ষদগণের সম্যক পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এটিরও রচনা কাল দ্বিতীয়টির অনুরূপ।

সংস্কৃতে চৈতন্যবিষয়ক পরবর্তী বিখ্যাত রচনা—স্বরূপ দামোদরের কড়চা। কবি কর্ণপুর এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁদের গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরূপ দামোদরের উল্লেখ করেছেন। তার ফলে তাঁর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রঘুনাথ দাস চৈতন্যদেব অবলম্বনে কিছু কবিতা রচনা করেন। এটি 'গৌরাঙ্গ স্তব কল্প-বৃক্ষ' নামে খ্যাত। পরবর্তী চৈতন্য জীবনীকারেরা এই সব সংস্কৃত রচনা দ্বারা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছিলেন।

## ॥ বৈষ্ণব-জীবনী সাহিত্য: বাংলা ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর সমগ্র দেশে যে নতুন ভক্তি ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল তার উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলা দেশ। ধর্ম ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসার সঙ্গে মহাপ্রভুর দৈব-জীবনের সাক্ষাৎ স্পর্শে এক ধরণের আকুলতার সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে এক শ্রেণীর পণ্ডিত-ভক্ত চৈতন্যদেবের জীবনকে সাহিত্যের মধ্যে ধরে রাখতে প্রয়াসী হয়েছিল। মহাপ্রভুর জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে মিশে ছিল তাঁর অলৌকিক লীলা-মাধুরী—যা সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাখ্যার অতীত ছিল বলেই এই রহস্যময় রসাবেশ ও বিস্ময়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ভক্তগণ তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর জীবনের কার্য্যাবলীর তদনুরূপ ব্যাখ্যা দিতে যত্নবান হয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেখলে এইসব জীবনীগ্রন্থের মধ্যে অলৌকিকত্বের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প নয়। কিন্তু একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ-জীবন সঞ্জাত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে এইসব জীবন-কাহিনী অনেকাংশেই উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। ধর্ম চেতনা আকীর্ণ দীর্ঘকালের বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ মানব জীবন অবলম্বনে রচিত চৈতন্য জীবনী সর্বপ্রথম এক যুক্তিসিদ্ধ ইতিহাস চেতনা এবং যা মানবিক মূল্যবোধকে এক সগৌরব প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই সাহিত্যের এটিই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরবর্তীকালের বাংলা জীবনী সাহিত্যের জগতে পূর্বসূরীত্বের গৌরব অবশ্যই ষোড়শ শতকে রচিত এইসব জীবনী সাহিত্য লাভ করেছে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত জীবনীগ্রন্থের মধ্যে যেমন মুরারি গুপ্তের কড়চা। বাংলা জীবনচরিতের মধ্যে তেমনি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' প্রথম বাংলা চৈতন্য জীবনী কাব্য। অতএব উক্ত গ্রন্থের বিষয় প্রথমে আলোচ্য।

## ॥ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ॥

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকট 'আদিকাব্য' নামে গৃহীত ও পঠিত। বৃন্দাবনদাসের কাব্যের যে নামটি আমরা বর্তমানে পাই আদিতে নাকি সে নামের পরিবর্তে 'চৈতন্য মঙ্গল' রাখা হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রবাদ এই যে, লোচনদাস একই নামের চৈতন্য জীবন চরিত রচনা করলে নাম সাদৃশ্যে কোন ভ্রান্তির সম্ভাবনায়

বৃন্দাবন জননী নারায়ণীর আদেশে বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে চৈতন্য ভাগবত রাখেন। কিন্তু 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে এর অন্য কারণ বিবৃত হয়েছে। সেই কারণটি এই—

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥"

এই কারণটিকে অনেক সমালোচক নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।

বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাব কাল বিষয়ে বিশেষ নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য নেই। তবে, একথা ঠিক যে, তিনি ছিলেন নারায়ণীর যৌবন বয়সের সন্তান। কাল-বিচারের ফলে জানা যায় তিনি ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ বা তারই কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পক্ষে চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়নি। তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন এবং তাঁরই আদেশে তিনি এই জীবনী-কাব্য প্রণয়ন করেন। তাছাড়া তথ্যের জন্য তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কথিত কাহিনীর উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করেছিলেন।

চৈতন্যভাগবতের মোট তিনটি অংশ আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যখণ্ড। প্রথম অংশে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে গয়াগমন পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ, দ্বিতীয় অংশে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং শেষ অংশে নীলাচলের জীবনের আংশিক বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। অতএব গ্রন্থটিতে সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা পাই না এবং এই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে। সেদিক থেকে দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথমটির পরিপূরক বলা যেতে পারে।

বৃন্দাবন দাস শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে চৈতন্যের জীবন চিত্রণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়তার ধর্ম-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্য রূপায়ণে প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায় প্রায়শঃই গ্রন্থকারকে ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট যে সব তথ্য তিনি আহরণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উজ্জ্বলতা থাকায়, সে সবের বর্ণনা যথার্থই বাস্তবানুগ এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যত্র তিনি কিছু কিছু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সেজন্য অবশ্য একথা বলা সঙ্গত হবে না যে, তার ফলে মহাগ্রন্থের মৌলিক ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কারণ বৃন্দাবন দাস নিজে ছিলেন পণ্ডিত, সাধক ও ভক্ত এবং যুগধর্মের প্রভাবও ছিল তাঁর উপর। তাছাড়া পরবর্তী জীবনীকারদের উপর মুরারিগুপ্ত প্রমুখ কবিগণের প্রভাবের কথাত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অনিবার্য কালপ্রভাবের ফলে মধ্যযুগীয় আলৌকিকতার অনেক ছাপ এ গ্রন্থের দেহে অনেকাংশেই বিদ্যমান। কিন্তু, অলৌকিকতার এই সম্পর্কটুকু ব্যতীত গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলেই চৈতন্য জীবনের বিবিধ ঘটনা তিনি ঐতিহাসিকসুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সে সকল স্থান মানবীয় আবেদনের স্পর্শে পরিস্ফুটিত। হাস্য, মধুর ও করুণ রসের বর্ণনায় গ্রন্থকার যথার্থই নিপুণতার সাক্ষ্য রেখেছেন। অধিকাংশ

স্থলের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত ষোড়শ শতকের বাংলা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন চেতনার এক আন্তরিক ও তথ্যনিষ্ঠ কাব্যরূপ। এই দিক থেকে দেখলে গ্রন্থকার ও গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়।

ভক্তিরসই এই কাব্যের মূল রস। কবির পক্ষে এই ভাবের অবতারণাই ছিল স্বাভাবিক। কাব্যটি পয়ার ছন্দে রচিত এবং পয়ার হওয়া সত্ত্বেও ভাবের প্রবাহমানতা অবশ্যই লক্ষণীয়। নানা দিক থেকেই এটি একটি অসাধারণ গ্রন্থ হিসাবে স্মরণীয়।

## ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত

বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতের' মতই সমমর্যাদাসম্পন্ন। বস্তুতঃ এই দুই মহাগ্রন্থ দুরূহ, জটিল বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বসত্যকে জীবনে প্রয়োগমূলক, অনুসরণীয় সত্যে পরিণত করে তার মহিমাকে শতগুণ উজ্জ্বল করে সমগ্র জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করে এক মহাকীর্ত্তি স্থাপন করেছে। এই দুই গ্রন্থের দার্শনিক তত্ত্বগত পটভূমি ব্যতীত সাধক জীবনের মর্মের রসময় পরিবেশনার জন্যও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৈষ্ণব সমাজে 'বেদ' এর মত প্রামান্য বলে স্বীকৃতি ও গৌরব লাভ করেছে।

কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মকাল ও জন্মস্থান এবং কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে খ্যাতকীর্তি পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিতর্কের বিষয়গুলো এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল :—

(ক) কৃষ্ণদাসের নিজপ্রদত্ত বিবরণ অনুসারে, কবির জন্মভূমি নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রাম। তিনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ লাভ করে শ্রীবৃন্দাবনে যান এবং সেখানে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর কৃপা লাভ করেন এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে গুরুর পদে বরণ করেন।

(খ) ডঃ দীনেশ সেনের মতানুসারে কবির জন্মসাল ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং জন্মভূমি হিসাবে তিনি বর্ধমানের ঝামটপুরকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নমে সুনন্দা এবং ভ্রাতার নাম ছিল শ্যামদাস।

(গ) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতানুসারে আমরা জানতে পারি যে কবির জন্মভূমি ছিল নৈহাটির অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রাম, বর্ধমান নয়। কবির জন্মসাল হিসাবে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে।

(ঘ) কাব্যের রচনাকাল বিষয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে প্রবেশ না করে আমি ডঃ সুকুমার সেনের মতটি উদ্ধার করছি। তিনি বলেছেন—"মোটামুটি এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সাতের আটের কোঠায় বইখানি রচিত হইয়াছিল।"

অতঃপর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের কাব্যমূল্য এবং অন্যান্য লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এখানে সংক্ষেপে সূত্রানুসারে বর্ণনা করা হ'ল—

(ক) চৈতন্য ভাগবতের মত এটিও মহাগ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদর্শনের আকরগ্রন্থ হিসাবে পূজিত। দার্শনিক জিজ্ঞাসার এক নিপুণ কাব্য-রসময় মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে করা হয়েছে। তাই এটি একাধারে দার্শনিক গ্রন্থ ও কাব্য।

(খ) পূর্ববর্তী গ্রন্থেব মত এটি তিন ভাগে বিন্যস্ত—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলোলা। প্রথম অংশে আছে জন্ম, বাল্য ও কৈশোবেব বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় অংশে সংক্ষেপে সন্ন্যাস গ্রহণের বিবরণ, শান্তিপুর আগমন এবং অদ্বৈত মহাপ্রভুর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। নীলাচল বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে এই মহাগ্রন্থের শেষ ভাগে বিবৃত হয়েছে এবং সম্ভবতঃ এটিই গ্রন্থেব শেষ অংশ। পরিকল্পনা অনুসাবে মহাপ্রভুর জীবনের শেষ পর্যায়ের কাহিনী যথাসম্ভব তথ্যপূর্ণ ও ভাবময় করে তোলার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। শ্রীবাধাব ভাবদ্যুতি সম্বলিত দিব্যোন্মাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মাধুর্য্যময় রূপের অতুলনীয় মহিমাময় প্রকাশ এই অংশকে সর্বাধিক গৌরবমণ্ডিত করেছে।

(গ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বিশেষতঃ সংখ্যাতীত সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি প্রভূত সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এবিষয়ে তার অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ- নিপুণতা প্রায় এক দুর্লভ স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রেমধর্ম ও আরাধ্য-আরাধনের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা পববর্তী কালের বৈষ্ণব সমাজ আদর্শ স্থানীয় বলে মনে করেছেন।

(ঘ) চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কিছুকাল পূর্বেই মহাপ্রভুর বিষয়ে অবতারবাদ প্রচাব হয়েছিল এবং তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজ এই সত্যকে প্রামান্য সত্য বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যেমন তাব আলোচনার বিষয়বস্তু, তাই এই গ্রন্থে উহাই প্রধান আলোচ্য বলে স্বীকৃতি ও গুরুত্ব লাভ করেছে। চৈতন্যদেব যে একাধারে শ্রীবাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ উভয় সত্তার সম্মিলিত বিগ্রহ এবং শ্রীরাধার প্রেমের গভীবতা কতখানি এবং তাব রহস্যময় আধ্যাত্মিক স্বরূপই বা কি তা আস্বাদনের জন্যই যে তিনি ধবাধামে অবতীর্ণ হয়ে তাব ভক্তিব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন —এই সত্য প্রতিপন্ন করাই ছিল কবিরাজ গোস্বামীর প্রধান অভিপ্রেত এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ভাবে সাধন করেছিলেন তা ঐতিহাসিক ভাবেই সত্য।

(ঙ) বৈষ্ণব সমাজ চৈতন্যচরিতামৃতকে দ্বিতীয় ভাগবত বলে গণ্য করতেন এবং এই গ্রন্থেব প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা এত গভীর ও ব্যাপক ছিল যে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা-কাব বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে সংস্কৃত ভাষায় এই মহাগ্রন্থের একটি টীকা রচনা করেন। পরিশেষে একজন সমালোচকের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হল—"বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত যদি ভাগবত

হয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত তাহলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার মহাবেদ। অথচ, মৌলিক বৈষ্ণব স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে এই মহাগ্রন্থ বাঙালীর ঐতিহাসিক দার্শনিক চেতনার এক অতীব সার্থক প্রকাশ।"

## ॥ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ॥

কালের নিরিখে জয়ানন্দ এবং লোচনদাস সমসাময়িক। তথাপি কার গ্রন্থ যে পূর্বে রচিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রাম তাঁর জন্মস্থান; তাঁর পিতার নাম ছিল সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতার নাম রোদনী দেবী। এই পরিবারটি নাকি স্বয়ং চৈতন্যদেবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিল।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতানুসারে চৈতন্যমঙ্গল কাব্যটি ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ বা তারই কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। এই কাব্য মোট নয় খণ্ডে বিভক্ত এবং এটিতে বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে এটি গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। এইকাব্য রচনার পশ্চাতে গদাধর পণ্ডিত এবং নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র প্রভৃতির প্রেরণা ছিল।

সম্পূর্ণ অভিনব একটি তথ্যের জন্য এইকাব্য একদা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভূত ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিল। বলা বাহুল্য তথ্যটি চৈতন্যদেব বিষয়ক এবং তাঁর প্রয়াণ সম্পর্কে একটি অভিনব তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন। সেকালে প্রচলিত অন্য কোন প্রামাণ্য চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থে তাঁর তিরোভাব সম্পর্কে অনুরূপ কোন কারণ দেখান হয়নি। বাস্তববিচারে জয়ানন্দের প্রদর্শিত কারণটি বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য, প্রাসঙ্গিক পংক্তি কয়টি এখানে উদ্ধৃত হল :—

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥"

জয়ানন্দের কাব্য ভাবাবেগ বর্জিত হলেও অনেক দিক থেকে তথ্য বিকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে কাব্যখানি প্রচার লাভ করলেও খ্যাতনামা বৈষ্ণবগণের আনুকূল্য এটি লাভ করতে পারেনি।

## ॥ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ॥

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের মত লোচনদাসের কাব্যও সম্ভবতঃ গীত হবার জন্য রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থেও বিভিন্ন সুর নির্দেশ আছে। কবি পরিচয় থেকে জানা যায় যে তিনি বর্ধমান জেলায় কোগ্রাম নিবাসী কমলাকর দাসের পুত্র ছিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু।

নিঃসন্দেহে লোচনদাসের গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। কারণ লোচদাসের গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে তাঁর কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কবির আত্মস্বীকৃতি থেকে জানা যায় যে, তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

লোচনদাসের এই কাব্যের মধ্যে অলৌকিকতা ও কল্পনাপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করেছে। সেজন্য এটিকে প্রামাণ্য চৈতন্যজীবনী বলে অভিহিত করা যায় না। বৃন্দাবনদাসের যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবণতা ও গভীরতা ছিল তা আমরা লোচনদাসের মধ্যে পাই না। তবে একটি বিশেষ কারণে কাব্যখানি আকর্ষণীয়। কবি হিসাবে লোচনদাসের সৌন্দর্য ও রসদৃষ্টি ছিল এবং তার পরিচয় এতে পরিস্ফুট হওয়ায় কাব্যরসিকের কাছে এটির সমাদর প্রত্যাশিত।

## ॥ গোবিন্দদাসের কড়চা ॥

'গোবিন্দদাসের কড়চা' ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশ করেন। সর্বপ্রাচীন বাংলা চৈতন্য-চরিত সাহিত্য বলে দাবী করা হলেও বৈষ্ণব সমাজে তা স্বীকৃত হয় নি। পরিচয় দান সূত্রে কবি বলেছেন তিনি ছিলেন বর্ধমান নিবাসী শ্যামদাস কর্মকারের পুত্র। গৃহজীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেন এবং পরে তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যে যান। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ আছে। ডঃ দীনেশ সেন দিনলিপির আকারে লিখিত মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ কাহিনী হিসাবে গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিলেন।

## ॥ বৈষ্ণব পদাবলী ও বাংলা সাহিত্য ঃ প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যগত আলোচনা ॥

কেবলমাত্র বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যেই নয়—সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই বৈষ্ণব কবিতা সার্থক গীতিকবিতা হিসাবে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রকাশভঙ্গীর অনুপম সৌন্দর্যে, ভাবের গভীরতায়, আধ্যাত্মিক ভাবনার রসগাঢ়

আলোকময় প্রকাশে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণে, জাগতিক ও অতিজাগতিক অনুভবের পারস্পরিক সেতুবন্ধনে এগুলি অতুলনীয়। গীতিকবিতা যদি ভাবুক ও মরমী শিল্পীর হৃদয়োৎসারী হয় তবে বৈষ্ণবকবিতা সম্পূর্ণতা ও সার্থকতার গৌরবে সমুজ্জ্বল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রায় সকলেই সাধক ছিলেন বলেই তাঁদে' ভজনলব্ধ ঐশ্বর্যের বাণীরূপই হল এ সমস্ত কবিতা। এবং সে কারণেই এগুলিকে গীতিকবিতা বলতে কোন বাধা নেই। বৈষ্ণব পদাবলী সাধক ভক্তজন রচিত বলেই এর আর এক নাম মহাজন পদাবলী। ভক্তির অন্তর্লীন সুরটি ব্যক্তি-অনুভবের মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে বৈষ্ণব গীতিকবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সর্বোপরি ভক্তহৃদয়ের আকুলতার সঙ্গে বৈষ্ণবোচিত দীনতা এবং অপ্রাপ্তির বেদনাজনিত হাহাকার মিশে গিয়ে বৈষ্ণব কবিতাকে করুণ বিষাদাচ্ছন্ন মাধুর্য দান করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ধারাটি সুপ্রাচীন। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে একালের মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কমবেশী আটশত বৎসর ধরে অপ্রতিহত গতিতে এই ভক্তিরসধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই ধারার মধ্যে আবার চরম প্রকাশের কাল হচ্ছে চৈতন্যযুগ এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী কাল। চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ও গৌরচন্দ্রিকা মহাপ্রভুর ঐতিহাসিক আবির্ভাবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। চৈতন্য-পরবর্তী সাহিত্যের চারিত্রধর্মে গুরুতর পরিবর্তন সাধন এর পরোক্ষ প্রভাব সঞ্জাত। বৈষ্ণব-দর্শন ভাবনা জাতির মর্মমূলকে আশ্রয় করে না থাকলে দীর্ঘ হাজার বছরের জাতীয় ইতিহাস কখনও এমন করে গড়ে উঠতে পারত না।

একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বাংলা সাহিত্যের অন্য শাখার সূচনাকালের দুর্বলতা এবং ক্রমঃ অভিব্যক্তির স্তরগুলি খুব স্বাভাবিকতার সঙ্গেই চিহ্নিত। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী তার জন্মলগ্ন থেকেই যৌবন-পূর্ণতা দীপ্ত। ভাবের অখণ্ডতা ও উৎস-বিশুদ্ধিই এর কারণ।

কেবলমাত্র ভাগবত-প্রেমই যদি এর একমাত্র উপকরণ হ'ত—তবে, বোধ করি, এ জাতীয় পূর্ণতা অর্জন করতে পারত না। কারণ, সৎ-সাহিত্য কর্মের উৎস মানব মন যা তার জাগতিক অভিজ্ঞতা-পুষ্ট। এবং সেই অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্যভাবনার সুষম সম্মিলনের ফলেই সাহিত্য-শিল্পের উদ্ভব। বৈষ্ণব সাহিত্য তাই একাধারে জীবন-ভাবনা ও ঈশ্বর-ভাবনার সুন্দর সংমিশ্রণ—আকাশ ও পৃথিবীর মহামিলনজাত পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। দেবতা এখানে প্রিয়-তে রূপান্তরিত এবং প্রিয়জনেই দেব মহিমার আরোপে মহত্তর সত্তায় উন্নীত। শুধুই ভগবৎ-ভাবনার রসরূপ নয় বলেই বৈষ্ণব কবির প্রতি কবিগুরুর জিজ্ঞাসা উচ্চারিত—বৈষ্ণব কবির অম্বিষ্ট কি কেবলই ঈশ্বরপ্রেম? বৈষ্ণব রস-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের সমাহারে। স্পষ্টতঃই এগুলি প্রীতিপূর্ণ মানব সম্পর্কেরই আধ্যাত্মিক রূপায়ণ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখন সন্তানরূপে, কখনও সখারূপে আবার কখনও বা প্রেমাস্পদ রূপে কল্পিত ও রূপায়িত। মানব জীবনে প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কটি যেমন মধুরতম—বৈষ্ণব রসতত্ত্বের জগতে তেমনি মধুররসই চরম ও পরম উদ্দিষ্ট। এই মধুর ভাব আবার দ্বিবিধ—স্বকীয় ও পরকীয়া—যার মধ্যে পরকীয়াই অধিকতর উৎকর্ষমণ্ডিত। পরকীয়া সাধনাই তাই বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের সারস্বরূপ—যেখানে ঈশ্বর কৃষ্ণস্বরূপ এবং জগৎ ও জীবের একমাত্র প্রেমময় আশ্রয়ভূমি। সংসারের নানা সংস্কারময় জীবনের বন্ধনগত সত্যকে অস্বীকার করে সেখানে পরমতর সত্যলাভের সর্বগ্রাসী ব্যাকুলতা মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা একদিক থেকে বিচিত্র। বাংলা ভাষা যখন ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক বিশিষ্ট রূপলাভ করছিল—তখনই বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমপ্রসার। অবহট্‌ঠ ও মৈথিলীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য সুপ্রচুর। ব্রজবুলি এবং বাংলা যদিও পদাবলীর প্রধান মাধ্যম তথাপি সেই বাংলা প্রাচীন এবং আধুনিক পাঠকের নিকট সহজবোধ্য নয়। ভাবপ্রকাশে পারঙ্গমতা এবং ধ্বনিজাত সুমিষ্টতা সৃষ্টিতে এই ভাষা অতুলনীয়। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতকে বাদ দিলে এখনও পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী সমগ্র ভারতে গ্রহণযোগ্য প্রধানতঃ এর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর

পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাব সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপ্রভু সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং এই প্রেমধর্মের সম্পদকে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিপ্রভাব সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কৃষ্ণ ও রাধাপ্রেমের জটিল তত্ত্ব তিনিই তাঁহার সহজ জীবনচর্যা ও ভাবসাধনা এবং কীর্ত্তনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। চৈতন্যপূর্ব যুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কাব্য ও পদ রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের রচনা মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের উপায়স্বরূপ ছিল। ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে সমগ্র জাতির জীবনখাতে যে ভাবের জোয়ার এসেছিল তার ফলে বিপুল আয়তন চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য গড়ে ওঠে। সন্দেহ নেই যে, এই সাহিত্যের উপর পূর্বসূরীদের কিছু প্রভাব অবশ্যই ছিল। তবে মূল প্রেরণাতে ছিলেন চৈতন্যদেব। বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর দেহ সামগ্রীকভাবে বিপুল আয়তনে রূপান্তরিত হ'ল এবং অসংখ্য কবি তাঁদের প্রচেষ্টাকে এই পথে নিয়োজিত করলেন। তার ফলে বিচিত্রধর্মী সংখ্যাতীত পদাবলীই যে শুধু রচিত হ'ল তাই নয়—পদাবলী সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটি নূতন ধারাও রচিত হ'ল—সেটি হচ্ছে গৌরাঙ্গবিষয়ক বিপুল সংখ্যক পদ, যার প্রচলিত নাম গৌরচন্দ্রিকা। এবং বিষয়টির গতি কেবলমাত্র সাহিত্যের মধ্যে সীমায়িত না থেকে সঙ্গীতের মধ্যে তা

প্রসারিত হ'ল। এই বিশিষ্টধর্মী পদাবলী সাহিত্য সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করল — যা নিয়ে বাংলা দেশ চিরকালই গর্ব অনুভব করতে পারে। বাংলা সাহিত্যের কাছে ভারতীয় সাহিত্যের এই ঋণ চিরদিনই অবশ্য স্বীকার্য। মহাপ্রভু বিষয়ক একটি বৃহদায়তন সঙ্কলনের নাম "শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী" এবং সঙ্কলকের নাম জগদ্বন্ধু ভদ্র। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি ভাবের গভীরতা, প্রকাশভঙ্গীর স্বকীয়তায় অপর সকলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের স্বল্প পরবর্তীকালে যাঁরা বৈষ্ণব কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং খ্যাতির অধিকারী হন — তাঁদের প্রায় সকলেই চৈতন্যদেবের পার্ষদ বা তাঁদের শিষ্য ছিলেন। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচনায় যাঁরা দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন — তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বসন্ত রায়, পরমানন্দ গুপ্ত প্রভৃতির নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই কবিদলের মাঝে নরহরি সরকারই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। পঞ্চদশশতকের মধ্যভাগ থেকেই উত্তর রাঢ়ের শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা নরহরি সরকার এখানেই আবির্ভূত হন। কথিত আছে, ইনিই গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদরচনার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁর রচিত একটি পদে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। এখানে নরহরি সরকারের দুটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ উদ্ধৃত হ'ল :

(ক) "গৌরসুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে, নয়নে গলয়ে লোর॥
হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর, গদগদ মৃদু কহে।
সকলি অকাজ করে মনসিজ এত কি পরাণে সহে॥"

(খ) "গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহু যমুনার ভনে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পূরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীতবসন আর সে মুরলী চাহে॥"

চৈতন্যোত্তর যুগের কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই প্রধানস্থানীয়। জ্ঞানদাস-রচিত পদাবলীর মাধ্যম বাংলা ও ব্রজবুলি এবং কখনও বা উভয়ের মিশ্রণ। তুলনামূলকভাবে ব্রজবুলি অপেক্ষা বাংলায় রচিত পদগুলিতে জ্ঞানদাস তাঁর ভাবগত সমৃদ্ধিকে অধিকতর নিপুণতায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় সকল সমালোচকই জ্ঞানদাসের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করেছেন। এই তুলনা সঙ্গত বলেই

মনে হয়। কারণ, প্রকাশগত সারল্য এবং ভাবগভীরতা ও তন্ময়তায় জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনুরূপ শক্তিময়তার প্রমাণ রেখেছেন। চণ্ডীদাসেব সহজিয়া চিত্ত যেন আরবার বিপুল ব্যাকুলতায় আত্মপ্রকাশ কবেছে। তার পদাবলীতে অলঙ্কৃত সৌন্দর্যও যেমন আছে, তারই পাশে তেমনি বয়েছে সংহত সূক্ষ্ম অনুভূতি। একজন সার্থক গীতিকবির মত তিনি যেন বিষয়কে আত্মগত অনুভবের বস্তু কবে তুলেছেন এবং সাধক কবিব মন প্রেম-ব্যাকুল বাধার দ্বিতীয় হৃদয়ে রূপান্তবিত হয়েছে। তাই জ্ঞানদাস রূপ ও রূপাসক্তির কবি নন—তিনি শেষ পর্যন্ত এক মহাভাবের আবাসভূমি অতীন্দ্রিয় লোকে যাত্রা করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় চণ্ডীদাসের মত এক সর্বব্যাপী বেদনার সুর। জ্ঞানদাসের উপজীব্য প্রেম যেন 'চিত্রা'র রবীন্দ্রনাথের এক সংহত সৌন্দর্য-প্রেম-চেতনা—যার পাদমূলে তাঁব সাধকচিত্তকে অর্ঘস্বরূপ অর্পণ করেছেন। 'এ কবির ভাবের জ্যোতি অনির্বচনীয়তাব মেঘলোক অতিক্রম কবে এক মহাকাশের দিকে ক্রমপ্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। দুটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপিত হ'ল—

(ক) "ওহে নাথ কি দিব তোমারে।
কি দিব কি দিব মনে কবি আমি॥
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥"

(খ) "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোব কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

চৈতন্যোত্তব যুগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। যুগ্ম ভাবে জ্ঞানদাসের সঙ্গে সমপর্যায় গোবিন্দদাসের নামটি উচ্চারিত হয়। ভাবধর্ম ও রূপায়ণ-ধর্মে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুগামী। তাই, বোধ করি, ইনি চৈতন্য পরবর্তী বাংলা দেশে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে খ্যাত। এব পিতার নাম ছিল চিরঞ্জীব সেন। এঁর মাতামহ ছিলেন বর্ধমানের শ্রীখণ্ড নিবাসী সেযুগের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও কবি দামোদর সেন। গোবিন্দদাস ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ। এঁব রচিত অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে। কিছু পদ অবশ্য সংস্কৃতে রচিত।

গোবিন্দদাসকে অভিসারের কবি বলা হয়। সম্ভবতঃ অভিধাটি অতিশয়োক্তি নয়। কারণ, কবি দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় অভিসারের পদের রচয়িতা। গভীর প্রতিকূলতার দুঃখ, মিলনোৎকণ্ঠা, বিরহ-তীব্রতার দহন এবং সাধনার তন্ময়তা প্রভৃতি কবির অভিসারের পদগুলির ভাব-দেহকে গঠন করেছে। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল :—

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।

বিদ্যাপতির পদে আমরা পাই যৌবন-রূপ মাধুর্য ও আনন্দ উচ্ছলতা, চণ্ডীদাসে পাই প্রেমের গভীর বেদনা ও চিরন্তন বিরহোৎকণ্ঠা, আর গোবিন্দদাসে দেখি প্রেমের তীব্রতা এবং আদর্শ ত্যাগ স্বীকার। রাধার আভ্যন্তরীন সত্তার আবিষ্কারে তাঁর উপর যেমন বিদ্যাপতির প্রভাব, তেমনি চণ্ডীদাসের প্রভাবও অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, বিচ্ছেদের সুরটি যেখানে মিলনের মধ্যেও প্রধান হয়ে উঠেছে, সেখানে আমরা চণ্ডীদাসকেই আবার নতুন রূপে উপলব্ধি করি।

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উপর বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তররহস্যের সুদূর-প্রসারী প্রভাবের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সবশেষে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্যায়ণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাটি শেষ করছি—"অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আটশত বৎসর পর্যান্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে।"

## ॥ চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য : চৈতন্য-প্রভাব সমীক্ষা ॥

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা চৈতন্য প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করেছি এবং এর প্রভাবগত বৈশিষ্ট্য আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু, কেবলমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের অন্য শাখাতেও এই মহাপুরুষের সামগ্রীক প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অধিকন্তু, বাংলার সমাজ ও ধর্ম-জীবনও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর মহা আবির্ভাবকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বিবেচনা করলে পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত তাঁর প্রভাব কার্যকরীরূপে বর্তমান ছিল বলা যায়। সাহিত্য যখন বাস্তব জীবনেরই প্রতিরূপ, তখন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে বাংলায় সমাজ-জীবনে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার উপস্থাপনা প্রয়োজন এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যক্ষ সত্যকে ঐ যুগ এবং পরবর্তীযুগের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে গণ্য করতে হবে

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে ( ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ) বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল এবং কোন জাতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি জনগণ তাঁদের জীবনে অবলম্বন

করেছিলেন—তা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করলেই জানা যায়। তাছাড়া পূর্ববর্তী সাহিত্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মধ্যে প্রাপ্তব্য জীবন চিত্র এবং চৈতন্য পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও সমকালীন জীবনের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। স্পষ্টতঃ একথা সত্য যে, উক্ত গ্রন্থগুলির পটভূমি নির্মাণে কবিগণ তাঁদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই মূলধন করে অগ্রসর হয়েছিলেন। তার ফলে ঐ সকল রচনা একদিকে যেমন বস্তুধর্মী হয়েছে, অপরদিকে তেমনই সমসাময়িক জীবন ধারার সার্থক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে এগুলির আলোচনা করলে চৈতন্য পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের আন্তর-ধর্মের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য পরিস্ফুটিত হবে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন যখন রচিত হয়—তখন ইতিহাসের তথ্যের দিক থেকে অবক্ষয়ের সূচনার কাল। জাতীয় জীবনে তখন তান্ত্রিক আচার বিচারের প্রত্যক্ষ প্রভাব চলছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মধ্যে উপস্থাপিত প্রেম-চিত্রের সঙ্গে তাই সাধারণ লোক জীবনে অনুষ্ঠিত প্রেমলীলার গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পাঁচালী কাব্য হিসাবে রচিত হওয়ার মূলেও সম্ভবতঃ এই প্রেরণা ছিল যে, কাব্যখানির প্রচারের মাধ্যমে অনেককাংশেই লোকসংস্কৃতি তথা লোক-জীবন সত্যকেই পরিপোষণ করা হবে এবং তার মধ্যে প্রকাশিত রুচির স্থূলতা ও গ্রাম্যতা প্রায় যেখানে অশ্লীলতার সীমারেখা স্পর্শ করেছে, সেখানেও একটি লোকপরিতৃপ্তির সম্ভাবনার প্রত্যাশা কল্পনা করা সম্ভবতঃ অবাস্তব এবং যুক্তিহীন হবে না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের কখনও দেবতা বলে মনে হয় না এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ও রাধার চিত্ত ও ভাবগত বিশুদ্ধির সঙ্গে তার তুলনার কথা কল্পনার অন্তর্ভুক্ত করাও কঠিন। স্পষ্টতঃ, এই প্রেম-লৌকিক জীবন কেন্দ্রিক এবং কৃষ্ণচরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যও এই ভাবটির পরিপোষক। কিশোরী রাধার নবোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রতি তার আকর্ষণের সূচনা থেকে ক্রমরূপান্তরের স্তরগুলিতে 'বড়ায়ি' এর সাহায্যে প্রেমনিবেদনের ভঙ্গীগুলিতে সর্বত্র এক কুটীল দেহলোলুপ গ্রাম্য যুবকের মানস বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব লক্ষণ থেকে আমাদের মনে হয় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা দেশের জীবনধারায় অন্ততঃ অংশবিশেষ ঐরূপ মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হ'তেন। কাব্যটির মধ্যে কোথাও কোথাও কবি কর্মের উচ্চমানের কথা মনে রাখলেও এর তীব্র নীতিহীনতার কথা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না। তুলনামূলকভাবে চৈতন্য-পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রধানতঃ গোবিন্দদাস এবং জ্ঞানদাসের মধ্যে এমন সর্বাত্মক নীতিহীনতার সংক্রমণ একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। মহামানব মহাপ্রভু যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রসাস্বাদ করতেন এমন কথা কোন বৈষ্ণব—মহাজন স্বীকার করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, নির্মলতম চরিত্রের এই মানুষটির প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য এক উন্নতমানের নীতি বিশুদ্ধতার জগতে উন্নীত হয়েছিল। দেহের প্রসঙ্গ সেখানে থাকলেও দেহাতীতের প্রতি কবি-

সাধকগণের আকুতি যেন সর্বকালের সীমারেখাকে অতিক্রম করেছিল। তাই ভূমিতে অবস্থান করে ভূমার জন্য আর্তিই সেখানকার মূলসুর হয়ে উঠেছে। আরও মনে রাখতে হবে—মধুর রসই একমাত্র রস নয়—বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও রসতত্ত্বে আরও চারটি রসও সমান আগ্রহের সঙ্গে অবলম্বনীয় বলে গণ্য হয়েছিল। শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং দাস্য রসের অসংখ্য পদাবলীও চিরকালীন বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস হয়ে আছে। চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বড় প্রমাণ এর থেকে আর কি হ'তে পারে?

অবশ্য, এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক সত্যের কথা অনেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রভাবগত পরিবর্তন পুনরায় নিম্নগামী আব এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। চৈতন্য প্রভাব ক্রমশঃ বৃহত্তর জীবন থেকে ক্ষীয়মান হ'তে হ'তে তা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু ভক্তজনের উপজীব্য হতে থাকে এবং অষ্টাদশ শতকের সামগ্রীক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে জনজীবন আবার অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হয়। ফলে রাজসভার সভ্যতাকে অবলম্বন করে আত্ম-প্রকাশ করে সেই ভারতচন্দ্রীয় বিলাস-কলা-যার মধ্যে শুধু জীবনের তাৎক্ষণিক তারল্যের লঘু সুরটিই ধ্বনিত। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অন্তর্গত নৈতিক অধঃ-পতনের চিত্র এমনকি সেকালের সমাজের পক্ষেও একটু বেশী মাত্রায় উগ্র ছিল। অপরপক্ষে, মনে রাখা দরকার যে, বিদ্যাপতিও রাজসভাকবি হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর পদাবলীতে ঐশ্বর্যের জীবনকেন্দ্রিক ঔজ্জ্বল্য প্রধান হলেও তা কোথাও সাহিত্যিক শালীনতাকে অতিক্রম করে নি।

মধ্যযুগের বিস্তৃত পটভূমিতে নব মানবতাবাদের যে প্রসারতা আমরা লক্ষ্য করি তা প্রধানতঃ চৈতন্যদেব আচরিত জীবনধর্মের প্রত্যক্ষ ফল। কেবলমাত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নয়, সমগ্র জীবন চিন্তার মধ্যেই তিনি একটি গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল আচরিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের ফলে সমগ্র জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বগত ভ্রান্তি এবং জীবন চারণের মধ্যে নানা সঙ্কীর্ণতা ও অধর্ম এবং জাতি ও বর্ণগত তীব্র বৈষম্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। মহাপ্রভুর সময় থেকেই এই সব কিছুর মধ্যেই একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন সূচিত হ'ল।

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের বাংলাদেশে কেবলমাত্র যে বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী পার্থক্য যে বড় করে দেখা হ'ত তা নয়—হিন্দু-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বর্ণাশ্রিত শাখার মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্কের মানের গুরুতর অবনতি দেখা যাচ্ছিল এবং প্রায় সর্বত্র ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এক সামাজিক অত্যাচারের সীমারেখা স্পর্শ করেছিল। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব হয়েছিল বিস্মৃত অতীতের সত্য এবং মানুষের জীবনের মূল অবলম্বন হয়েছিল কতকগুলি শুষ্ক, নিষ্প্রাণ এবং অসার্থক আচার অনুষ্ঠান। প্রকৃত মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধ হয়েছিল জীবন থেকে অন্তর্হিত। বহুবিধ লৌকিক ধর্ম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং তন্ত্র এক নিকৃষ্টমানের আচারে পরিণত

লাভ করেছিল। অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তিই ছিল জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সুখ সমৃদ্ধির একমাত্র উপকরণ। এসব ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় সমসাময়িক সাহিত্যে খুব যত্নের সঙ্গেই পরিবেশিত হয়েছে। উৎসগ্রন্থ হিসাবে বিবিধ মঙ্গলকাব্য এবং চৈতন্য জীবনী-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত থেকে তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তথ্যমূলক উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল ;—

(১) "কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥"

(২) "না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥"

(৩) "বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥"

বলা বাহুল্য উদ্ধৃতিগুলি স্বয়ং ব্যাখ্যাত এবং এগুলি পড়লেই তৎকালীন সমাজের রূপটি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এসব অধঃপতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শাসকের যুক্তিহীন অত্যাচার।

মহাপ্রভু এই সার্বিক সামাজিক অধঃপতন থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করলেন। অবশ্য এই লক্ষ্যে পৌছাতে গিয়ে তিনি নিজে সমাজকল্যাণ-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন নি। প্রকৃত ধর্ম তিনি তাঁর নিজের জীবনেই এমনভাবে দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে প্রকাশ করলেন যা সকলের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে উঠল। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন পর্য্যন্ত নানা ক্ষুদ্র আচরণের মধ্যে তাৎপর্য নিহিত ছিল। তাই সজ্ঞানে তিনি কখনই ইউরোপীয় আদর্শের অনুরূপ মানবিকতার চর্চা ও প্রচার না করেও কেবলমাত্র ব্যবহারিক জীবন-চর্যার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানবধর্ম ও প্রেম ধর্মকে প্রকাশ করলেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। গভীর প্রেমময়তায় জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করে দেখিয়ে দিলেন যে, মানবতার দৃষ্টিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম কত অসার। ভক্ত হরিদাস ও জগাই মাধাইকে প্রেমধর্মে দীক্ষিত করে শত্রু মিত্রের ব্যবধান এবং কৃত্রিম মূল্যবোধের অন্তরায়কে চূর্ণ করলেন। সারা দেশ ভ্রমণ করে যেমন সমগ্রজাতির মর্মমূলে মহাপ্রেরণা সঞ্চার করলেন, তেমনি প্রেমই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা প্রতিপন্ন করলেন নতুন করে। ঐতিহাসিক অর্থে ভগবান বুদ্ধের পর এমন অখিল রসামৃতমূর্ত্তির আবির্ভাব জাতীয় জীবনে আর কখনও সূচিত হয় নি। ফলে, সমগ্র ভারতে এক নব সংস্কৃতির বীজ অঙ্কুরিত হ'ল এবং তার ফলও সুদূর প্রসারী। চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উন্নত মানের রুচির প্রবর্তনা হ'ল তাই

নয়—যাঁদের আমরা বিধর্মী মুসলমান বলি, তাঁদের মধ্য থেকেই এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রতিভাধর ব্যক্তি বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ ও খ্যাতি অর্জন করলেন। সহজেই বোঝা যায় এটি ধর্মান্তর গ্রহণ বা অপর কোন অনুরূপ প্রভাবজনিত ফল নয়। মোটকথা, তাঁরা প্রেমের ধর্মকেই জীবন সত্য বলে গ্রহণ করার ফলেই এমনটা সম্ভব হয়েছিল। একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ্য—

"আলোচ্য মুসলমান কবিসম্প্রদায় যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে তাঁদের কাব্যের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন—সেই রাধা এবং কৃষ্ণ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের দেবদেবী নন—তাঁর নিখিল প্রেমসাধনার পরম প্রতীক।"

এ বিষয়ে তথ্যগত প্রমাণ অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের "বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" শীর্ষক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এবার মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে চৈতন্য প্রভাবের চিহ্ন অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আদি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য প্রধানতঃ লোকজীবনের সঙ্কীর্ণতা, ভেদবুদ্ধি এবং ধর্মীয় অনাচারকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের মঙ্গলকাব্যে এই সঙ্কীর্ণতা-বিরহিত উদার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মঙ্গলকাব্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করেছেন :—

"চৈতন্য পরবর্ত্তীযুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত; ইহার কারণ চৈতন্যদেবের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিকগুণ ছিল, তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস প্রত্যক্ষ মানব জীবন অবলম্বী জীবনী সাহিত্যের উন্নততম অভিব্যক্তি—সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ চৈতন্য-প্রভাব ফলশ্রুতি—যার ফলে পরবর্তী সাহিত্যের ধারা দেবতার দিক থেকে ক্রমে মানবমুখী হয়েছে।

## ॥ মঙ্গলকাব্য : সাহিত্যিক তাৎপর্য ॥

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধানতঃ দুটি অংশ একটি বৈষ্ণব সাহিত্য অপরটি মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণব সাহিত্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে—এখন মঙ্গলকাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নাতিদীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়—সেটি এই যে, উক্ত উভয় শ্রেণীর সাহিত্যই ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে চিরায়ত ভাবসাধনার ধারাটি সহজেই চোখে পড়ে। তাছাড়া প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও পূর্বের ঐতিহ্যটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে আন্তরিকভাবে। অপরদিকে আভ্যন্তরীণ ধর্মের দিক থেকে মঙ্গলকাব্য যেন

লোকসাহিত্যের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার একটি সাংস্কৃতিক চর্চা 'গান' ও 'কথা'কে আশ্রয় করে যে লালিত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে—তা অসত্য নয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী এবং বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্যের প্রকাশসূক্ষ্মতা ও বিশুদ্ধি সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারণার বাইরেই ছিল। মনসামঙ্গলই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হওয়ায় এব কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে লোক সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও শিবায়নও প্রধানতঃ লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রীক এবং পালাগান, যাত্রা ইত্যাদির আকাবে এগুলির পরিবেশনা জনপ্রিয়তাব জন্যই সম্ভব হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের মৌল চারিত্র্য ধর্ম মানুষের বাস্তব জীবন সমস্যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গডে উঠেছে। তাই বৈষ্ণবসাহিত্য-সুলভ উন্নত মানের দার্শনিকতা ও ভাবগভীরতা এখানে প্রত্যাশা করা যায় না।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলোকে দেবতাব লীলা মাহাত্ম্য প্রচারক বলেই মনে হয়। মর্ত্যে দেবতার মহিমা প্রচারই কাব্যগুলিব মূল লক্ষ্য হলেও পরোক্ষভাবে শেষপর্যন্ত মানুষের মহিমাই অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিমা প্রচারের ক্ষেত্র হিসাবে দেবতারা শেষ পর্য্যন্ত মাটির পৃথিবীকেই নির্বাচন কবেছেন এবং সাধাবণ দুঃখার্ত মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তাঁবা ধন্য হতে চেয়েছেন—যদিও বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই তাঁবা মাধ্যমে পরিণত কবেছেন। একথা মনে হওযা খুবই স্বাভাবিক যে, স্বর্গবাস তাঁদেব স্বর্গীয় সুখের ব্যবস্থা কবতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি এবং সেজন্যই বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনের নতুন তাৎপর্যেব তৃষ্ণায় তাঁদের অন্বেষা-তৎপর হতে হয়েছে। প্রাচীনতম মনসামঙ্গল থেকে অর্বাচীন সত্যনারায়ণ এবং শনির পাঁচালী পর্যন্ত লোককাব্যের সর্বত্র দেবতাদের এই একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

কয়েক শতকের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মঙ্গলকাব্যকে অবলম্বন করে অসংখ্য কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁদের রচিত এসব কাব্যরচনা প্রেরণার যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সেগুলি পড়লে জানা যায় প্রায় সকল কাব্যের ক্ষেত্রেই কবি দেব বা দেবী কর্তৃক কাব্যরচনার জন্য স্বপ্নাদেশ লাভ করেছেন এবং পরে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন। অনিবার্য জনপ্রিয়তা লাভের একটি কৌশল হিসাবে এটিকে গণ্য করলেও এর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, মানুষের সমাজই যখন দেবতার প্রতিষ্ঠা-পীঠ তখন গুরুত্বের দিক থেকে মানুষের দিকটাই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কোন কোন কাব্যে ত সরাসরি দেবতাকে অনেক হীন ও ষডযন্ত্রপরায়ণ করে আঁকা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়তঃই মানুষের পৌরুষ-গৌরব সেখানে অনেক উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যখন মানুষের গৌরব নতুন করে প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়—তখনই এই সব মঙ্গলকাব্য দেবতাকে গৌণ করে মানুষের শক্তি ও মহিমাকে এক নতুন মূল্যদানে ধন্য করেছে। সবদিক থেকে এ যেন নব

মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা। কবিগণ তাঁদের কাব্যসমূহে বিভিন্ন চরিত্রকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁদেরই প্রগাঢ় জীবনদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যে আর্য ও অনার্য-উভয়বিধ সংস্কৃতি চেতনাই ক্রিয়াশীল ছিল। সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর মঙ্গলকাব্য আমরা লক্ষ্য করি—একটি ধারা চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি লৌকিক দেবতা অবলম্বনে এবং অপরটি দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি পৌরাণিক ধারাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া চৈতন্যমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্য নামে খ্যাত। জনপ্রিয়তার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে, লৌকিক দেবতা সমন্বিত মঙ্গল-কাব্যগুলিই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছিল। বাংলাদেশকে আমরা আর্য ও অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়ের পীঠস্থান বলে জানি। এখানকার সংস্কৃতি এই সমন্বয়ের ফল। তার চিহ্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে খুব বেশী পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও প্রভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিষয়টিও মনে রাখা দরকার। মনসা-মঙ্গল যদি অনার্য-সভ্যতা সম্ভূত সর্পপূজা পদ্ধতির সাহিত্যিক রূপায়ণ হয় তবে ধর্মমঙ্গলের ধর্ম ঠাকুর ও তাঁর পূজা পদ্ধতি বৈদিক সূর্যদেবতা ও বৌদ্ধ-দেবতার সমন্বিত রূপ। তাছাড়া সুদীর্ঘকালের তন্ত্রসাধনার প্রভাবও মঙ্গলকাব্যের বিবিধ দেবদেবীর পূজা পদ্ধতির মধ্যে পড়েছে। এখানে একজন বিশেষজ্ঞের মত উল্লেখ করা হ'ল—

"মঙ্গল কাব্যের সাহায্যে প্রকাশ্য বৌদ্ধদেবতা ধর্ম, প্রচ্ছন্ন ধর্মরূপী দক্ষিণরায়, বৌদ্ধশক্তি হরিতি প্রচ্ছন্ন হইয়া শীতলা নামে, বৌদ্ধশক্তি তরিতা মনসা নামে এবং বজ্রতারা বা বাশুলী সংস্কৃত বিশালাক্ষী নাম লইয়া পুরাণের চণ্ডীর সহিত একাত্ম হইয়া নিজেদের পূজা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যের যাঁরা নায়ক নায়িকা—তাঁরা শাপভ্রষ্ট দেবতা। নানা দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্যে জীবন অতিক্রান্ত হওয়ায় পরে পুনরায় তাঁদর নিজস্ব বাসভূমি স্বর্গরাজ্যে ফিরে যেতে দেখা যায়। অবশ্য ইতিমধ্যে পরিকল্পিত দেবতার পূজা পৃথিবীতে প্রচলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, গণেশ বন্দনা ইত্যাদি এবং কোন কোন কাব্যে চৈতন্যদেব ও রামচন্দ্রের বন্দনাও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া পতিনিন্দা, বারমাস্যা, রন্ধন প্রণালী প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ বিষয় প্রায় সব কাব্যেই দেখা যায়। কোন কোন কাব্যে সেকালের সমাজ, অর্থনীতি, লোকাচার এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি এত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলি শেষ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে এবং এযুগের মানুষের জ্ঞান তৃষ্ণার নিবৃত্তি সাধন করেছে। বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীবন ও জীবন-ভিত্তিক দর্শনকে তাঁর কাব্যমধ্যে এত আন্তরিকতায় সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন যার ফলে তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের এক বিশিষ্ট কথাকারের গৌরব-

লাভ করেছেন। উপস্থাপনায় বাস্তবতা, কালের ক্রম, চিন্তার স্বচ্ছতা সন্তোষজনকভাবে অনুসৃত হয়েছে বলেই তাঁর কাব্য অনেকাংশে কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। মুকুন্দরামের অনুরূপ জীবনদৃষ্টি অপর মঙ্গল কাব্যের কবিগণের না থাকলেও অনেক কবিই প্রশংসনীয় জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলিকে আধুনিক কথা সাহিত্যের সূচনা বলে গণ্য করতে হয় এবং সেইসঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলির অসীম জনপ্রিয়তার মূলে যে এই জীবন-ধর্মী কাহিনীর আকর্ষণ ছিল তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মঙ্গলকাব্যগুলি দেবতাগণের প্রতিষ্ঠাকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এগুলিতে যে সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দেবতাদের মহিমা কীর্তন লক্ষ্য বলে গণ্য করলেও মঙ্গল কবিগণ তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন নি। কারণ অঙ্কিত দেবতা চরিত্রের প্রচলিত মহিমা তাঁদের অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্খিত আচরণে প্রায়শঃই ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সংকীর্ণতা ব্যঞ্জক ব্যবহারের দ্বারা তাঁরা গৌরবের আসন থেকে অবনমিত হয়েছেন। ইপ্সিত ফললাভ না করলেই তাঁরা ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন এবং উৎপীড়নের আগুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দগ্ধ করেছে। এসব থেকে একথা মনে করা স্বাভাবিক যে, মধ্যযুগীয় শাসকবর্গ সাধারণ মানুষের উপর যে জাতীয় উৎপীড়ন ও দমনমূলক আচরণ করতেন—তারই কাব্যময় প্রতিফলন এসব চরিত্রের উপর হয়েছিল এবং দেবতাকে এরই সঙ্গে জড়িত করে তাঁরা সম্ভবতঃ এক জাতীয় সান্ত্বনা লাভে তৎপর হয়েছিলেন।

## ॥ ভারতচন্দ্র : একটি মূল্যায়ণ ॥

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের বাংলা দেশের সর্বাধিক বিতর্কিত কবি-ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমসাময়িক কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতচন্দ্রকে বহুবিধ নিন্দা ও প্রশংসার লক্ষ্যস্থল হতে হয়েছে। ঊনবিংশ শতকেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক মদনমোহন গোস্বামী প্রভৃতি সমালোচক ও সাহিত্যিক তাঁর কবি প্রতিভার মূল্য নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন। এই সব সমালোচনা পাঠ করলে পারস্পরিক মত প্রকাশে বিরোধিতার সুরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই কবি হিসাবে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে জগতে তাঁর স্থান নির্ণয়ে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন।

জীবন অভিজ্ঞতা ও তার প্রভাবের সূত্রটিকে সমালোচনার মৌল সত্য হিসাবে গ্রহণ করলে, দূর অতীতের কবি ভারতচন্দ্রের দেশ, কাল ও ভাবগত পটভূমির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত প্রয়োজন। যদিও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক, কবি সমালোচক এবিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন :

"ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। ..... অহং ও আত্মা যে একবস্তু নয়, সেকথা কি এদেশে বুঝিয়ে বলা দরকার ?... ভারতচন্দ্র ছোট হোন বড হোন...জাতকবি, সুতরাং তাঁর অহং এর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যেব যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আব কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে।"

বলা বাহুল্য, প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নিজে এইসব জীবন তথ্য উপেক্ষা কবার সপক্ষে মত প্রকাশ করলেও আমাদের পক্ষে যেহেতু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়—সেকারণেই শিল্পীর মানসিকতা গঠনে সমসাময়িক জীবন ধর্মের প্রভাবকেও স্বীকার না করা অস্বাভাবিক এবং অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনসত্যের মধ্যেই তাঁর কাব্য-সত্য নিহিত ছিল।

গবেষক অধ্যাপক এবং ভারতচন্দ্র-বিশেষজ্ঞ মদন মোহন গোস্বামী মহাশয় ভারত চন্দ্রের আবির্ভাব কাল অষ্টাদশ শতককে জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য সব দিক থেকেই এক দিক পরিবর্তনসূচক কাল হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের তথ্যের দিক থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলাকে এক সন্ধিক্ষণের পটভূমি বলা যায়। একদিকে মুসলমান রাজত্বের অবসান, অপর দিকে ইংরাজ রাজত্বের গোড়াপত্তন এই উভয় যুগান্তকারী ঘটনা এই শতকের মধ্যভাগেই ঘটেছিল। কবির জন্ম ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জীবনকাল মোট আটচল্লিশ বৎসর। জীবনের শেষ পর্যায়ে পলাশীর যুদ্ধের ঐতিহাসিক মীমাংসা (১৭৫৭) তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান সভ্যতা ও ইংরেজ কৃষ্টি এই উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। বৃটিশ ভারতে ইংরেজীর যে প্রভাব মুসলিম ভারতে ফার্সীর সেই প্রভাব ছিল এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাজকর্মচারীগণ সে ভাষা উত্তমরূপে জানতেন। ভারতচন্দ্রকে পুরাতনের অনুসরণে সংস্কৃত ও ফার্সী এবং আরবী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি যে জাতীয় কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন সে কাজে আরবী ও ফার্সীর প্রয়োজন নিতান্ত কম ছিল না। এবং তাঁর বিখ্যাত কাব্যের রচনা শৈলীও এই দুই ভাষার প্রভূত শব্দসম্পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁর জীবনের যে সব ঘটনা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি নীচে সন্নিবিষ্ট হল।

(১) জীবন কাহিনী থেকে জানা যায় যে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাডীর বিরোধ নানা সূত্র অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ তার একটি কারণ।

(২) ভারতচন্দ্র জীবনে নানা সময়ে নানা দুর্বিপাকে পড়েছিলেন এবং নিজ চাতুর্য

ও উপস্থিত বুদ্ধির বলে তিনি সেই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। বর্ধমানে অস্থায়ীভাবে থাকার সময়ে ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি কাবারুদ্ধ হন এবং কৌশলে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করতেও সক্ষম হন।

(৩) ভারতচন্দ্রের প্রখর বাস্তব-চেতনা ছিল। প্রায় শৈশব থেকেই তিনি জীবনের দিক্‌নির্ণয় করেছিলেন এবং কৈশোরে প্রবাসে বিদ্যার্জনকালে তিনি অর্থকরী বিদ্যাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন এবং এবিষয়ে কোন প্রতিকূলতাকেই আমল দেননি।

(৪) কবি আর পাঁচজনের মত বা মধ্যযুগীয় অন্য কবিদের ( মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ) মত বাস্তব জীবনের দুঃখকে মেনে নেওয়ার মত মানুষ ছিলেন না। তিনি উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন বলেই বহুবার প্রতিকূলতার হাত থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করে শেষ পর্যন্ত রাজার আশ্রয়ে ( কৃষ্ণচন্দ্র রায় ) নিজেকে আমৃত্যু নিরাপত্তা ও সম্মানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠা তাঁর অব্যবসায়, শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার মূল্যস্বরূপ।

(৫) দুঃখজয়ী কবিমন বাস্তবতার প্রচণ্ডতাকে উপেক্ষা করে নিজমনে এক দার্শনিকোচিত সরসতার চর্চা করেছিলেন এবং তাঁর এই কৃষ্টিগত সরসতা তাঁর কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হিসাবে তাঁকে সফলতার শীর্ষে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া রাজসভাকবি হিসাবে এটি ছিল তাঁর অপরিহার্য স্বভাব-গুণ। বাক্-সরসতা বাক্ পটুতারই কাব্যময় রূপ এবং প্রধানতঃ এই একটি মাত্র গুণকে আশ্রয় করেই তিনি জনপ্রিয় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। উক্তির সবসতা প্রসঙ্গটি তাঁর কাব্য থেকে তিনটি উদাহরণেব দ্বারা দেখান হ'ল—

(ক) "কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।"

(খ) [illegible] ভক্তি আশে ভারত সরস ভাসে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।"

(গ) "নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাসে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।"

(৬) এ তথ্য অবিস্মরণীয় যে, কবি রাজ আদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। অতএব, রাজা ও সভাসদগণের মনোরঞ্জনের প্রশ্নটি তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বড় ছিল ছিল এবং একে উপেক্ষা করার কোন মনোভাবও তাঁর ছিল না।

(৭) ডঃ সুকুমার সেনের মতে কবির অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট তিনটি ভাগের মধ্যে প্রথম দুটি ভাগ—অন্নদা মঙ্গল ও কালিকা মঙ্গল ( বিদ্যাসুন্দর ) ভারতের অন্য অংশে পূর্ব-প্রচলিত কাব্য-উপাদান অবলম্বনে রচিত এবং কাব্যের শেষাংশ অর্থাৎ 'মানসিংহ' ভারতচন্দ্রের মৌলিক রচনা। তবে এই তিনটি ভাগের মধ্যে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। একটি তথ্য থেকে জানা

যায় যে, বিদ্যাসুন্দর অংশটি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতার সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কলকাতার লক্ষ্মীবিলাস প্রেস এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেস এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস থেকে এই কাব্যের বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে রক্ষিত পুঁথির সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য অন্নদামঙ্গলের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। ছাপাখানার কল্যাণে সম্পূর্ণ অন্নদামঙ্গল কাব্য সহজপ্রাপ্য হলেও জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ বিদ্যাসুন্দরকে কেন্দ্র করে। এই তথ্য থেকে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে—বিদ্যাসুন্দরের যৌনজীবনের প্রবণতা অবলম্বী কাহিনী অষ্টাদশ শতকের বিপর্যস্ত জীবন-চেতনার প্রতিরূপ হলেও অনেকটা সমধর্মিতার জন্য এই জনপ্রিয়তার ধারা পরবর্তী শতক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল।

## ॥ কাব্যমূল্য নির্ণয় ॥

ভারতচন্দ্রের পরবর্তীযুগের সমালোচনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় অন্নদামঙ্গল কাব্যকে অবলম্বন করে অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয় শ্রেণীর সমালোচনাই দেখা দিয়েছিল। যাঁরা ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরা তাঁর বিশিষ্ট রচনারীতি, কাব্যে প্রকাশিত জীবনধর্মিতা এবং আধুনিক মনোভাবের প্রসঙ্গে প্রায় সীমাহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তবে ভারতচন্দ্রের বাক্-বৈদগ্ধ্যই যে সবকিছুর কেন্দ্রভূমি ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে অবশ্য অনুকূল প্রতিকূল কোন সমালোচকই দ্বিমত পোষণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রকাশ-কুশলতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাব্যের রচনার অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে তাই কবির রচনা শৈলী-প্রসঙ্গ এবং অপর বহুল আলোচিত অশ্লীলতার বিষয়টি একটি বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতচন্দ্রের রচনা সৌন্দর্য যেমন প্রশ্নাতীত, অশ্লীলতাও তেমনি সন্দেহ রহিত। ভারতচন্দ্রের প্রবীণতম সমালোচক রাখালদাস হালদার মহাশয়ের ভারতচন্দ্রের সমালোচনার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল এবং পরবর্তী উদ্ধৃতি দুটি যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরী ও মদনমোহন গোস্বামীর।

(ক) "অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহৎ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না।"

(খ) "সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল, তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকারও সাধু ভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।"

(গ) ভারতচন্দ্রের প্রশংসায় বর্ত্তমানযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর কুণ্ঠা তদ্‌রচিত বিদ্যাসুন্দরকাব্যের অশ্লীলতার প্রসঙ্গে।......সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি বিমল আনন্দদান হয়, তবে কি বিদ্যাসুন্দরের আপাতদৃষ্ট দেহসর্বস্ব ভোগলোলুপ অশ্লীলতার পঙ্কে অম্লান আনন্দ-পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হয় নাই। কবি এই অশ্লীলতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচনায় এত অলংকার, এত কারুকার্য্যের প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।"

তিনটি উদ্ধৃতি থেকেই অশ্লীলতার স্বীকৃতিকে সাধারণ সত্য হিসাবে অবশ্যই গ্রহণ করা যায়। অতএব ভারতচন্দ্রের কাব্য যে সর্বকালের দৃষ্টিতেই অশ্লীলতা দোষদুষ্ট তা সাহিত্য সমালোচনার জগতে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মেনে নিতে হয়। উদ্ধৃতির তিনজন সমালোচক তিনটি যুগের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুগ ও যুগধর্ম পরিবর্তিত হলেও মানুষের সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারণায় এমন একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সত্য থাকে যার আলোকে এ জাতীয় সমীক্ষা অপরিবর্তিত থেকে যায়।

রাখালদাস মহাশয়ের সমালোচনাটির প্রকাশকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব তাকে প্রাচীনপন্থী বলে মনে করতে বাধা নেই। সর্বোপরি তিনি রুচির দিক থেকে গোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের জীবনী রচনায় আগ্রহী এবং তৎপর হয়েছিলেন। এই তৎপরতা তাঁর সাহিত্যপ্রেম এবং সহৃদয়তার কথাই প্রমাণ করে। জীবনীরচনার কাজকে তিনি সাহিত্যিক দায়িত্ব পালন বলে মনে করলেও মতামত প্রকাশে তিনি কঠিন পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। যে রুচি সৌন্দর্যের জন্য পদাবলীর চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবকবিতা সাদরে পঠিত ও গীত হয় এবং যা মহাপ্রভুরও আদরের সামগ্রী ছিল, তার বিপরীতধর্মিতার জন্যই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিগত প্রায় হাজার বছর ধরে সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে আছে এবং দীর্ঘকালের রুচি পরিবর্তন সত্ত্বেও এই অভিযোগ খণ্ডিত হয়নি এখনও। এর থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী যতই আপেক্ষিক হোক না কেন এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা নির্ণয় প্রসঙ্গ যত প্রাচীন এবং দুরূহ হোক না কেন—এবিষয়ে একটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য আছেই। অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্র সম্পর্কেও অশ্লীলতার অভিযোগটি তাই চিরকালের সত্য হয়ে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও এসত্যকে অস্বীকার করেননি। বিষয়বস্তু শালীনবিহীন হলেও রচনাচাতুর্যে যে তিনি এর মধ্যে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, প্রকারান্তরে তাকেই কবির কৃতিত্ব বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু, একথা কি সত্য যে, বিষয়বস্তু যদি যথার্থই নিম্নরুচির হয় তবে তার অঙ্গসজ্জার সাহায্যেই কি তাকে সুন্দর করে তোলা যায়? তাছাড়া, বিদ্যাসুন্দরের যথার্থ নাটকীয় অংশগুলি কি অসীম ঔদার্যের দৃষ্টিতেও বিন্দুমাত্র

রুচিরসম্পন্ন বলে গণ্য করা যায়। আমাদের ত মনে হয় তা যায় না—তার সরসতার উপাদানের কথা প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যত জোরের সঙ্গেই বলুন না কেন।

আধুনিক সমালোচক গোস্বামী মহাশয় অনেকটা সমজাতীয় মত প্রকাশ করে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, অশ্লীলতার পঙ্কের কদর্যতাকে সৌন্দর্যময় আবরণ-দানে কবির যত্নের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু প্রয়াসে আন্তরিকতা থাকলেই কি সর্বদা অসুন্দর সুন্দর হয়ে ওঠে? বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনীকে যদি রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যায়—তবে তার নির্মিতিতেও সমজাতীয় নিপুণতার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি তার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কিছুটা অসঙ্গত হলেও বলব যে, প্রধানতঃ যুগ প্রয়োজনেই রাজসভাকবি ভারতচন্দ্রের অলংকারময় কারুকার্যে সমস্তটুকু প্রচ্ছন্ন করার মনোভাবের অভাব ছিল। কি বিষয় নির্বাচন কি রূপায়ণ—সবদিকেই তিনি যুগধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং সবদিক থেকে তাঁর কাব্যকে যুগসৃষ্টি হিসাবে রাজসভাসদগণের মনোরঞ্জন করার উপযোগী করে গঠন করতে তৎপর হয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রকাশভঙ্গীও অনুরূপ জীবনের বহিরঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

যাইহোক, কবি হিসাবে ভারতচন্দ্রের দুটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব পাঠক ও সমালোচক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—একটি হ'ল তাঁর বিস্ময়কর রচনানৈপুণ্য এবং অপরটি তাঁর জীবনদৃষ্টি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনাশৈলী ছিল তাঁর নিজস্ব এবং জীবনের শতবর্ষের কালসীমার মধ্যে তাঁর কাব্যে ভাষার অভিনবত্বের গৌরব ছিল অক্ষুণ্ণ। রুচির দিক থেকে তাঁর ছিল যেমন যুগ-স্পৃষ্ট প্রকাশভঙ্গী এবং জীবন-দৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যুগ-অতিক্রান্ত। "গীতিকাব্যের অভিনবত্ব, আধুনিকতা ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, চরিত্র চিত্রণের নূতনত্ব এবং সংস্কার মুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি—ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভায় বিশিষ্ট লক্ষণ। অনাস্বাদিতপূর্ব বাস্তববোধ, নবতম সমাজ সচেতনা, মোহশূন্য বিশ্লেষণমূলক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন পর্যালোচনার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য—এই গুণগুলির জন্যই ভারতচন্দ্র আধুনিকতাধর্মী।"

অষ্টাদশ শতকের অর্ধ-অন্ধকারময় বাতাবরণের মধ্যে প্রাচীন ভাবধারার বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করে একজন আধুনিক কবির মত ভাষা ও ছন্দ নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সে যুগের আর কোন কবি করেন নি। সংস্কৃত, আরবী ফারসী ভাষার দক্ষতাকে তিনি বাংলা কাব্যের দেহসৌন্দর্য বিন্যাসে সযত্নে কাজে লাগিয়েছিলেন। এবিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী কোন ধর্মীয় বা প্রথানুগ সংস্কারের দাসত্ব করেন নি। তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টি কখনও ক্ষুরধার বুদ্ধির কৌশলের প্রয়োগের দ্বারা আবার কখনও বা লোক-জীবনমূলক সত্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সম্ভব করে তুলেছিলেন। ভারতচন্দ্রের অনেক রচনাংশই প্রায় দুশত বৎসরের বাধাকে অতিক্রম করে আজও জনমানসে বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত

হ'ল—(ক) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা, পাদনখে পড়ে আছে, তারি কতগুলা (২) বড়র পিবীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ (৩) নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ? (৪) আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ইত্যাদি।

চরিত্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্র উল্লেখযোগ্য নিপুণতা প্রদর্শন করতে সক্ষম না হ'লেও সর্বযুগেব মানুষেব জীবন সত্যগুলিকে তাঁর কাব্যমধ্যে রূপায়িত করেছিলেন। উক্ত উদ্ধৃতিগুলিই তার প্রমাণ। ভারতচন্দ্র-গবেষকের মতে পরবর্তী খ্যাত ও অল্পখ্যাত বহু সাহিত্যিক যথা—রামনিধি গুপ্ত, ইশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত (অনঙ্গমোহন কাব্য' দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ( গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ), বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন প্রভৃতির উপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব পড়েছিল। সে কারণে ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও স্মরণীয়।

## ॥ শাক্ত-পদাবলী ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শাক্তপদাবলী অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সৃষ্টি বলে গণ্য হয়েছে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যে যুগে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা ক'রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বস্তুতঃ তখন থেকেই শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে হরপার্বতীর জীবনকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অন্যান্য ভাষার কিছু বিক্ষিপ্ত কবিতা রচিত হয়েছিল। কিছুসংখ্যক তান্ত্রিক পণ্ডিতও এই কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও 'চৌতিশা' স্তব 'জগজ্জনীর রূপ'—, 'মাতৃকা প্রশস্তি' ইত্যাদি রচিত হয়েছে। তাছাড়া চর্যাপদ এবং বৈষ্ণব সহজিয়া পদ প্রভৃতির মধ্যেও শাক্ত সাধনার ইঙ্গিত আছে। এর সবগুলি-কেই বাংলা শাক্ত-পদাবলীর আদি উৎস বলে গণ্য করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই থেকেই প্রধানতঃ ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনকে অবলম্বন করেই শাক্ত কবিতা ও সঙ্গীত উদ্ভূত, বিকশিত ও সমৃদ্ধি লাভ করে। শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে রামপ্রসাদ সেনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সাধক জনোচিত সরলতায়, ভক্তির সুগভীর প্রকাশে, ঐকান্তিক আকুলতায়, জাগতিক দুঃখ জয়েব সাধনায়, সার্বিক আত্মসমর্পণে রামপ্রসাদের গানগুলি অতুলনীয়। বাংলা দেশের শাক্ত সাধনা রামপ্রসাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, শাক্ত সঙ্গীতের আর এক নাম হয়েছে রামপ্রসাদী।

শক্তি পূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা, মহারাজা, জমিদার, দেওয়ান প্রভৃতি। সমাজের এইসব উচ্চতম পর্যায়ের লোকেরা প্রভূত জাঁকজমক সহকারে মাতৃ-পূজার আয়োজন করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, —যেমন দেওয়ান রঘুনাথ।

সাধক কমলাকান্ত ভক্ত কবি হিসাবে প্রায় রামপ্রসাদের সমকক্ষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁর বাড়ি ছিল বর্ধমানের অম্বিকা-কালনা। ইনি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। কমলাকান্তের প্রায় আড়াইশত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। রামপ্রসাদের সঙ্গে কমলাকান্তের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। কবিত্ব শক্তিতে উভয়ই বিশিষ্ট। তবে রামপ্রসাদ যেখানে আপনভোলা সাধক-ভক্ত কবি, সেখানে কমলাকান্ত বেশ সচেতন শিল্পী। রামপ্রসাদ প্রধানতঃ সঙ্গীত রচয়িতা এবং রচনার সৌকর্য সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু কমলাকান্ত একজন উচ্চ শ্রেণীর গীতি কবি—যাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ নিপুণতা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। দুটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :—

(ক) মজিল মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীল কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হইল কামাদি কুসুম সকলে॥

(খ) শুকনো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে॥

কমলাকান্ত যেখানে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সাধক, সেখানে রামপ্রসাদ গৃহবাসী সাধক। রামপ্রসাদী গানে একদিকে যেমন বেদান্তের তত্ত্বসমূহে এক রহস্যময় গম্ভীর জটিলতার সন্ধান পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনই শাস্ত্র ও তত্ত্বনিরপেক্ষ সরল আত্মসমর্পণও চোখে পড়ে। এখানে অনাড়ম্বর সহজ সাধনায় ভাবটি ব্যক্ত :—

"মন, তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে॥
জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাবে করবে পূজা জানবে নারে জগজনে॥"

প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উনবিংশ শতকের শেষভাগের এক বিখ্যাত সাধক কবি। এঁর বাড়ী ছিল হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে। এঁর রচিত সঙ্গীত ভাবের দিক থেকে রামপ্রসাদের অনুগামী। সর্বাঙ্গীন মাতৃনির্ভরতা এঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

"মান অপমান সবই সমান মায়ায় দিয়ে জলাঞ্জলি।
সার করেছি রাঙ্গা চরণ ভবের কথায় আর কি ভুলি?"

গোবিন্দ চৌধুরী ছিলেন আর একজন সাধক কবি। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও সুকবি। মনোরম সৌন্দর্যময় কবিতার জন্য তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁর জন্ম হয়েছিল বগুড়া সহরের নিকটস্থ এক গ্রামে।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও রামলাল দাস দত্ত আর দু'জন শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ রচনায় জন্য এঁরা ভক্তমনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁদের দুজনের দৃষ্টিতেই মায়ের স্নেহময়ী ও সন্তানবৎসল রূপটি প্রধান হয়ে ধরা পড়লেও তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপ সম্পর্কেও তাঁরা অনবহিত থাকেন নি।

সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁরা মাতৃভক্ত ও কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর পুত্র মহারাজ শিবচন্দ্র রায় ও কুমার শম্ভুচন্দ্র এবং একই রাজবংশের সন্তান কুমার নরচন্দ্র রায় এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান ইতিহাস-খ্যাত মহারাজ নন্দ কুমার। তাছাড়া নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ এবং বর্ধমান রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত মহারাজ মহাতাব চাঁদের নামও উল্লেখযোগ্য।

মাতৃরূপে ঈশ্বর সাধনা ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন। শাক্ত কবি-সাধকগণ পরমা শক্তিকে বিশ্বসৃষ্টি ও রক্ষণের মূলাভূত কারণরূপে জ্ঞাত হয়ে মাতৃরূপে সেই শক্তির ধ্যান করেছেন এবং মাতৃবৈশিষ্ট্যের যাবতীয় গুণাবলী তাঁর উপর আরোপ করে তাঁর মহামূর্তি কল্পনার দৃষ্টিতে ও সাধনার দৃষ্টিতে দেখে তারই বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং সেই মূর্তিই অনুধ্যান করেছেন। তাঁদের দৃষ্টি যেমন রূপমুগ্ধ, তেমনই মহাভাব-গুণ মুগ্ধ তাঁদের চিত্ত। আপন ভোলা সাধক কবি জগতমাতৃকার মধ্যে বাস্তব গুণাবলী আরোপ করে সন্তানের মত নানা মান-অভিমানের খেলায় মেতেছেন। এইসব কবিতায় তাই বাৎসল্যই প্রধান। স্নেহের অসীম ক্ষমতা এইসব পদাবলীতে প্রকটিত। এমন হৃদয়স্পর্শী স্নেহ মমতার প্রকাশ এক বৈষ্ণব-পদাবলী ছাড়া আর কোথায় আছে?

মাতৃরূপের এই সহজ, সবল সাধনার পাশাপাশি শাস্ত্রানুসারী তাত্ত্বিক জ্ঞানও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। অনুরূপ সাধনার ধারা আমাদের দেশে সুপ্রাচীন বলেই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়গুলি পরবর্তী কালের জীবন-চিন্তার মধ্যে অনিবার্য ভাবেই অনুসৃত হয়েছে। তত্ত্ব-সমন্বিত পদগুলি তাই বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য এবং এবিষয়ে যথার্থ অধিকারী ব্যতীত অপর সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলির রস-গ্রহণ সহজসাধ্য নয়।

শাক্ত পদাবলীর আর এক বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়বে। আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত পোষিত ও পালিত হলেও বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের একটা সুরও এইসব বৈপরীত্যের মাঝে ধ্বনিত হ'তে শোনা যায়। তাই কৃষ্ণসাধকও কালীর নাম করেন এবং এই সমন্বয়ধর্মিতাও তাই অনেক শ্যামা সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনা প্রকৃতপক্ষে মানুষের বন্ধন মুক্তির সাধনা এবং সুখ বা দুঃখ বেদনা ভোগও জগতের সকলের ক্ষেত্রেই সমান অর্থাৎ সার্বজনীন। সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে সর্বকালের মানুষই জীবনের উচ্চতর সত্যলাভে তৎপরতা দেখিয়ে আসছে। বিবিধ ধর্মমত সেই তৎপরতারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এবং সেজন্যই শাক্ত পদাবলীতেও বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম-দর্শনের সত্যের প্রকাশও দেখা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যেমন ভক্তহৃদয়ের অকৃত্রিম আকুতি সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে চিরকালের মুক্তিকামী মানুষের পারলৌকিক তৃষ্ণা নিবারণের

উপাদান হয়ে উঠেছে, শাক্ত পদাবলীও অনুরূপভাবে মাতৃপূজকের একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মত শাক্ত পদাবলীও বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্ম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, আমরা কখনও বিস্মৃত হতে পারি না যে, উভয় পদাবলীই মূলতঃ মহাজন-হৃদয় উদ্ভূত এবং সেজন্যই ঐশ্বরিক চিন্তার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সেগুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যেন কোন অন্তহীন পথে যাত্রা করেছে। কবিতাগুলির উৎস তাই এমন মানব হৃদয়—যা ভক্তিরসে সিঞ্চিত এবং যেখানে মুক্তি-কামনাবৃক্ষের বীজটি অঙ্কুরিত। সরল ভক্তিভাব যেখানে প্রধান, সেখানে প্রকাশভঙ্গীও সরল এবং মায়ের ঐশ্বর্যভাব যেখানে তান্ত্রিক রহস্যের আধারে বিধৃত, সেখানে কবির প্রকাশভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত জটিলতামণ্ডিত।

শাক্ত পদাবলীর মধ্যে সমসাময়িক জীবন চেতনার প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস ধূলিমলিন ও অন্ধকারময়। জীবনের সঠিক বিপর্যয় বোধ করি এই যুগেই সর্বাধিক। অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তি ও কেন্দ্রচ্যুত ক্ষমতার অনাচার সমাজ-জীবনকে এক দুরপনেয় অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। বাস্তব জীবনের এমন এক রূপের মধ্যে তাই আমরা দুঃখ ও বেদনার কান্না এবং বেদনামুক্তির আকুতির কোমল আর্ত্ত সুরটিই শুনতে পাই। আর কাঁদতে যদি হয় তবে মা ছাড়া আর কার কাছেই বা সেই কান্নাকে আমরা পৌঁছে দিতে পারি? তিনিই সেই সর্বারাধ্যা জগন্মাতা যাঁর বরাভয় দায়িনী রূপের মধ্যে আমরা প্রশান্ত আশ্রয়টুকু লাভ করে মায়ের করুণা-প্রাপ্তিতে ধন্য হতে পারি। এই সহৃদয় প্রার্থনাটুকুই শাক্ত পদাবলীর মর্মবাণী।

## ॥ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংলা গদ্য ॥

নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণেই বাংলা গদ্যের সূচনা কাল হিসাবে ষোড়শ শতককে মেনে নিতে হয়। ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের পর্তুগীজ মিশনারীদের কাল পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ব্যবহার কেবলমাত্র চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ, আদালত ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাও এই ব্যবহারের ব্যাপকতা ছিলনা বললেই চলে। সুতরাং বাংলা ভাষার ব্যবহার সুদীর্ঘ হাজার বছর ধরে চললেও সে ভাষা কেবল মাত্র কবিতার ভাষা হ'য়ে ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের স্বল্পকাল পূর্বে পর্তুগীজ মিশনারীদের ধর্মীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ বাংলা গদ্যের ব্যবহার সক্রিয় ভাবে শুরু হয় এবং এ বিষয়ে পূর্বসূরীর গৌরব লাভ করেন "দোম আন্তোনিও" এবং "মনো এল-দ্য-আসসুম্প্‌সাঁও"। এঁদের রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ধর্মীয় প্রচেষ্টার আকারে বাংলা গদ্যের প্রারম্ভিক চর্চার নিদর্শন। আর একটি চমকপ্রদ তথ্য এই যে, প্রথম বাংলা ব্যাকরণও রচিত হয়েছিল বিদেশী পাদ্রী 'মনোএল' দ্বারা এবং

রচনার ভাষাও ছিল বিদেশী অর্থাৎ পর্তুগীজ এবং প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশে অর্থাৎ পর্তুগাল রাজধানী লিসবনে এবং মুদ্রণের বর্ণমালাও বিদেশী অর্থাৎ রোমান হরফে। এই ব্যাকরণের রচনা কাল ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং প্রকাশ কাল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই তথ্য থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যে মাতৃভাষার জন্য আজ আমরা গর্বিত তার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও গঠনের সূত্রপাত বিদেশীদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়েছিল এবং বিজাতীয় ধর্মপ্রেরণা তার মূলে কার্যকরী ভাবে বর্তমান থাকলেও শেষ পর্যন্ত উপকৃত হয়েছি আমরাই এবং তাঁরা উদ্যোগী না হলে এ প্রচেষ্টা যে আরও বিলম্বিত হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত মন্তব্য আরও সমীচীন বলে মনে হবে, যদি আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান সম্পর্কে সামান্য মাত্রও অবহিত হই। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ইতিহাসের ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি দেখা দিয়েছিল। বস্তুতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌল প্রয়োজনই রাষ্ট্রীয় চেতনা-ভিত্তিক এবং যাতে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ সাম্রাজ্যের অধিকতর পুষ্টিসাধন হয়-সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ইংরাজ রাষ্ট্রনায়কেরা তদ্দেশীয় করণিকদের উত্তম ভারতীয় ভাষা-ভিত্তিক জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই কলেজটির প্রতিষ্ঠা করেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হল ১৮০১ থেকে-যখন উইলিয়ম কেরী এর সর্বাধ্যক্ষ হয়ে এলেন শ্রীরামপুর মিশন থেকে কলকাতায়। কেরী বাংলা সাহিত্যের রচনাকার অপেক্ষা প্রবর্তকের গৌরব লাভ করে চিরদিন বাংলা গদ্য সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ না থাকলেও এটুকু বললেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হবে যে, কেরীর আগমন সম্ভব না হলে বাংলা গদ্যের অগ্রগতির ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হ'ত।

কেরীর প্রাথমিক প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে শ্রীরামপুর মিশনকে অবলম্বন করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসার পর থেকেই নানাভাবে তিনি নিজেকে এই দেশের উপযোগী করে প্রস্তুত করছিলেন। তাঁর প্রস্তুতির ব্যাপকতা তাঁর পুত্র ফেলিক্স কেরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সকল স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর সততা, আন্তরিকতা ও কর্মক্ষমতা ছিল আদর্শস্থানীয়। বাইবেলের অনুবাদ, রামায়ণ ও মহাভারতের বিবিধ অনুবাদ প্রভৃতি মহৎ কাজ দিয়ে শ্রীরামপুরের মুদ্রণ যন্ত্রের সক্রিয়তার সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চানন কর্মকার এবং চার্লস উইলকিন্স এর নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। হালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণও মূলতঃ এঁদেরই দান।

কেরী সাহেবকে একজন ভারতবিদ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এ দেশের কাজে আত্মনিয়োগের পূর্বে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে মারাঠী, পাঞ্জাবী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি অপর

পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় উক্ত ভাষাগুলির ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ণ এবং প্রকাশে যত্নবান হয়েছিলেন। বাংলায় তাঁর রচিত অনেকগুলি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর 'কথোপকথন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটি ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। এদেশে নিযুক্ত ইংরাজ রাজকর্মচারীগণ যাতে এদেশীয়-গণের সঙ্গে বাংলা ভাষার সাহায্যে উত্তমরূপে যোগাযোগ স্থাপন করে সরকারী কাজ কর্মকে সহজ সাধ্য করে তুলতে পারেন—এই পুস্তকটি প্রকাশের মূলে সেই উদ্দেশ্যই ছিল। বইটিতে ভাগীরথীর তীরবর্তী অধিবাসীগণের বাস্তব জীবন ভিত্তিক কথোপ-কথনের নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল। এটিতে মোট একত্রিশটি অধ্যায় ছিল। বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রার অতি মনোজ্ঞ চিত্র এতে আছে। চাষা, ক্ষেত মজুর, ভিক্ষুক, মুটে মজুর, বাড়ীর গৃহিণী এবং অন্যান্য মহিলাবৃন্দ তাদের বিচিত্র জীবনধারার সামগ্রীক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বইয়ের পটভূমিতে সমুপস্থিত। শেষ পর্যন্ত এটি বিকাশকালের বাংলা গদ্যে রচিত আমাদের তৎকালীন সমাজের একটি নকশা হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে দেখলে কেরীর কথোপকথন'কে ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের পূর্বসূরী বলতে হয়। 'কথোপকথন' সম্পর্কে আরও দুটি তথ্য এখানে পরিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—বইটি দুটি ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল—এক পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং অপর পৃষ্ঠায় বাংলা। এটির পরিচয় জ্ঞাপক আর একটি উপনাম ছিল—"Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language."

কেরী সাহেবের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ গ্রন্থটি কেরীর নামে প্রকাশিত হলেও এর অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু রচনা অপর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত বা সংশোধিত হয়েছিল। বইটির নাম ইতিহাসমালা হলেও আমাদের দেশে বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত নানা কাহিনী এর মধ্যে সঙ্কলিত হয়েছে। এগুলির অন্যতম প্রধান উৎস 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশ' এর মত সংস্কৃত গ্রন্থ। কেবলমাত্র তিনটি ইতিহাস-ভিত্তিক কাহিনী এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে :—(ক) প্রতাপাদিত্য (খ) রূপ ও সনাতন এবং (গ) আকবর ও বীরবল। বইটির নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ও ডঃ সুকুমার সেন যে মন্তব্য করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য :

> "ইতিহাসমালার রচনারীতি সুষম এবং প্রাঞ্জল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের লেখনীপ্রসূত পুস্তকগুলির মধ্যে ইতিহাসমালা রচনা ভঙ্গির দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। মনোরম বিষয়বস্তু ও সহজ রচনাভঙ্গি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত ও বিবেচিত হয় নাই বলিয়াই বোধকরি, ইতিহাসমালা পাঠ্য পংক্তিভুক্ত হয় নাই। কিন্তু বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গল্পসংগ্রহ বলিয়া ইতিহাসমালার মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না।"

উইলিয়ম কেরী প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় শুভাকাঙ্খী ছিলেন। একথা বলার কারণ এই যে, তিনি অপর ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশে উৎসাহিত হলেও বাংলাভাষার উন্নতির জন্য তিনি কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধক্রমে এই সব ব্যক্তি বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কেরী সাহেব নিজেই ইংরাজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ এবং ইংরেজী-বাংলা অভিধান প্রনয়ণ করেন। বলা বাহুল্য, এগুলি তাঁর অসামান্য কীর্তি।

কেরীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব ব্যক্তি বাংলা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং গোলোকনাথ শর্মা। এঁদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

এইসব পণ্ডিতগণের মধ্যে রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই প্রধান স্থানীয় ছিলেন। রামরাম বসু ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক। তিনি ছিলেন ফারসীতে বুৎপত্তিসম্পন্ন মুন্সী। সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য না থাকলেও মোটামুটি জ্ঞান ছিল। এবং কেরীর সংস্পর্শে আসার পর তিনি মোটামুটি-ভাবে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। টমাসের কাছে তিনি ইংরেজী শিখতেন এবং তাঁকে তিনি বাংলা শেখাতেন। শ্রীরামপুর মিশন থেকে তাঁর রচিত দুখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়—(১) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ( ১৮০১ ) এবং (২) লিপিমালা ( ১৮০২ )। তাছাড়া খ্রীষ্টবিষয়ক একটি দীর্ঘ স্তোত্রও তিনি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রতাপাদিত্য চরিত্র তাঁর মৌলিক রচনা এবং তাঁর রচনা শৈলীর নিদর্শন এর মধ্যেই আমরা পেতে পারি। তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর ছিলেন এবং সেই সূত্রে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর জানা ছিল। তিনি মূলত সেগুলিকে অবলম্বন করেই তাঁর এই ইতিহাস গ্রন্থখানি রচনা করেন। রচনা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রন্থটির মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দ খুব বেশী সংখ্যায় তিনি ব্যবহার করেছেন। ফলে রচনা স্থানবিশেষে বেশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। আবার রচনার কোথাও বা আশাতীত সরল ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। বইটির বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ইতিহাস হওয়ায় সেকালের রীতি অনুসারে আরবী ফারসী প্রয়োগ যথোপযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হয়—তাছাড়া তাঁর প্রয়োগ নৈপুণ্যও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'লিপিমালা' তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা। বইটি প্রয়োজনভিত্তিক। বিদেশী শিক্ষার্থীকে বাংলা সাধু ও চলিত ভাষায় পরোক্ষ অভিজ্ঞতালাভে সাহায্য করাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল। বইটির পরিশিষ্টে গণিত বিষয়ক কিছুসংখ্যক পাঠের অবতারণা করা হয়েছিল। বইটির নাম লিপিমালা এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানের নমুনা স্বরূপ কিছু সংখ্যক চিঠিপত্র এতে উপস্থাপিত হয়েছিল। তথ্যের দিক থেকে এ কথাও সত্য যে, অনেকগুলি রচনাই চিঠির আকারে কাহিনী মাত্র।

রামরাম বসুর রচনার শব্দ-সম্ভারের প্রকৃতি বিষয়ে পূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে। তাঁর রচনার অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রধানতঃ তিনি কথ্য ভাষার অনুকারী ছিলেন, যদিও কোথাও বা বিচিত্র অন্বয়রীতি অলম্বনের ফলে রচনা কিছু পরিমাণে আড়ষ্ট এবং আরবী ফারসীর বাহুল্য হেতু সামান্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। তাঁর রচনার সরলতা ও জটিলতা—এই দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিছু লোকপ্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গীর ব্যবহারের দ্বারা তাঁর গদ্য বেশ সরস ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। আবার যেখানে তিনি তৎসমশব্দ বহুল রচনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন —সেখানে রচনা তার স্বাভাবিক প্রাণ-স্পন্দন হারিয়ে ফেলেছে। যথা– বিলাপীয় ক্রন্দন, উচ্ছবীয় বাদ্যকরেরা, অধপাতীয় দূত ইত্যাদি। তৎসম শব্দের শুদ্ধ বানানও তিনি অনেক স্থানেই ব্যবহারে সক্ষম হন নি।

অধিকাংশ সমালোচকের মতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এঁর জন্মভূমি মেদিনীপুর। ডঃ সুকুমার সেনের মতে উত্তরবঙ্গে বসবাসের সময় উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়রচিত পাঁচখানি বাংলা বইএর সন্ধান পাওয়া যায়—'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' 'রাজাবলি', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' এবং 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'।

বত্রিশ সিংহাসনের প্রকাশকাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। বইটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ভাষা সাধু। সেকালের রীতি অনুযায়ী ছেদচিহ্ন অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়েছে —ফলে অর্থবোধে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। বাক্য গঠনেও জটিলতা আছে। বিদেশ থেকেও বইটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রাজাবলির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা নয়। কারণ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় একই নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একখানি পুঁথির কথা শ্রদ্ধেয় রমেশ মজুমদার মহাশয় উল্লেখ করেছেন। রাজাবলি প্রাচীন রাজা বিচিত্র-বীর্য্য থেকে শুরু করে কোম্পানীর আমল পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থ। বইটিতে আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকলেও মোটামুটি রচনা প্রাঞ্জল এবং সে কারণেই তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হিতোপদেশ গ্রন্থখানিও সংস্কৃত থেকে অনুবাদ এবং রচনাভঙ্গী সংস্কৃতের অতিমাত্রিক প্রভাবহেতু সাবলীল হয়ে উঠতে পারেনি। কল-কাতার স্কুল বুক সোসাইটি থেকে বইটি পুনঃ প্রকাশিত হয় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' স্পষ্টত, বেদান্ত বিষয়ক সংস্কৃতানুগ গ্রন্থ। রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত চর্চার প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় বেদান্ত চন্দ্রিকা রচনা করেন। রামমোহন সম্পর্কে কিছু কটূক্তিমূলক কথা গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন। রামমোহনের বেদান্ত চর্চার প্রতিবাদে নানা যুক্তি তর্ক সহকারে এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। রচনা-দর্শ সংস্কৃত ভাষার অনুসারী। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যের

নাই

অপূর্ব নিদর্শন। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবোধ চন্দ্রিকা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে প্রচলিত ছিল। বিবিধ রচনা রীতির সংকলন হিসাবেও বইটির একটি পৃথক মর্যাদা ছিল। সেকালের শিক্ষাবিদেরা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এটিকে আদর্শ স্থানীয় বলে মনে করতেন বলেই শেষ পর্যন্ত বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের সম্মান লাভ করেছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রকাশিত পুস্তকাবলীকে অবলম্বিত গদ্যের সাধারণ ত্রুটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

(ক) বাক্য মধ্যস্থ পদবিন্যাস যথাযথ না হওয়ায় অর্থবোধের অসুবিধা হ'ত। (খ) অর্থ স্পষ্ট করার জন্য কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। (গ) ছেদচিহ্ন সামান্যই ব্যবহৃত হ'ত। (ঘ অনেক শব্দের বানানের কোন সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল না। তাহলেও এই যুগের গদ্য রচনাকারদের প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক ও উদ্দেশ্যমূলক বলেই অভিনন্দনযোগ্য।

## ॥ বাংলা গদ্য : রামমোহন অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর ॥

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে মধ্যভাগ অবধি কালসীমার মধ্যে বাংলা গদ্যের সেবা অনেক ভাষা সেবকই করেছেন। কিন্তু এঁদের সকলের মধ্যেই যে নানাকারণে অক্ষয় কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রধান এবং বিদ্যাসাগর প্রধানতম—সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়—এঁদের মধ্যে কাকে সঠিকভাবে বাংলা গদ্যের জনক বলা সঙ্গত সে কথাটিও ভেবে দেখতে হবে। কারণ, এটি একটি বিতর্কমূলক অভিধা এবং অধিকাংশ সময়েই ইতিহাসনিষ্ঠ ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ সাপেক্ষ সত্য হিসাবে দেখা দেয়নি। বাংলা গদ্য গঠন ও ক্রমোন্নতির আন্তরিক প্রচেষ্টায় উইলিয়ম কেরীর অবদানই যে, সর্বাধিক —তা ইতিহাসের সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের বাঁধা ঘরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তাকে ক্রমান্বয়ে সুসজ্জিত করে উন্নতমানের বাসোপযোগী করে তোলেন।

রামমোহনের ভাষা ও সাহিত্য সেবার কালসীমা ১৮১৪—১৮৩৩ এবং এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহনের ভাষাচর্চা পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্য-মূলকতার ধর্ম অবশ্য অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে বর্তমান থাকলেও এক বিশেষ শ্রেণীর সহৃদয় সৃজনধর্মিতা শেষোক্ত দুজনের মধ্যে বর্তমান ছিল—যার ফলে শেষ বয়সে গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেও অক্ষয়কুমার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ও ২য় খণ্ড) এর মত শ্রেষ্ঠস্থানীয় গ্রন্থ রচনা করতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারক হলেও 'ভ্রান্তিবিলাস' ও 'শকুন্তলার'

মত গ্রন্থ রচনার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। রামমোহন, কিন্তু কোন বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করতে চেষ্টা করেননি। অবশ্য তাঁর মানসিকতাও অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। গদ্য রচনাকার হিসাবে রামমোহনের অবদান নিতান্ত স্বল্প নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের তুলনায় তাঁর গদ্য রচনার মৌল ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডঃ সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য' নামক গ্রন্থে রামমোহনের বাংলা রচনার পরিচয় দান প্রসঙ্গে তাঁর যে সব পুস্তক ও পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—রচনার সবগুলিই প্রায় তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী। তাঁর বাংলা রচনার পরিচয়জ্ঞাপক তালিকাটি এইরকম:—(১) ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, (২) গোস্বামীর সহিত বিচার (৩) প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (৪) পথ্য প্রদান (৫) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (৬) বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদ (৭) বেদান্ত গ্রন্থ ও (৮) বেদান্তসার। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে, বেদান্ত ও উপনিষদের চর্চার প্রসার হ'ক এমন একটা ইচ্ছার বসবর্তী হয়েই তিনি এই সব প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' শীর্ষক গ্রন্থে রাজা রামমোহনের রচনার যে নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে তারমধ্যে সরসতা ও সৌন্দর্যের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কারের রচনার থেকে সুবোধ্য বাংলা অবশ্যই রামমোহন লিখেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী গদ্যরচনাকারেরা যে দুরূহ তৎসম এবং বিদেশী শব্দবহুল উদ্ভট গদ্য লিখেছেন রামমোহনের গদ্য সে তুলনায় অনেক সহজবোধ্য শব্দ সমন্বিত। কিন্তু, সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে, দূরান্বয়ের বৈশিষ্ট্যটি রামমোহনের গদ্যে থাকায় ভাবগ্রহণ খুব সহজসাধ্য ছিলনা। তাছাড়া খুব সামান্য সংখ্যক যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থের স্পষ্টতা ফুটে ওঠে নি। রামমোহনের গদ্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত রচনার প্রাঞ্জলতার উপর জোর দিলেও সরসতার অভাবের বিষয়টি উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন—"সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্ঠতা ছিলনা।"

শব্দ সন্নিবেশে সৌন্দর্য-দৃষ্টির প্রয়োগ যে অক্ষয়কুমারও খুব সার্থকতার সঙ্গে করতে পেরেছেন তা মনে হয় না। কিন্তু তাঁর রচনা আরও সুগঠিত এবং গভীর ভাব প্রকাশে সক্ষম। এমন কথাও বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় যে বিদ্যাসাগরের রচনা ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশের পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় কুমার অনেক প্রাঞ্জল ও ভাববহনক্ষম সংহত গদ্য রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম দিকের গদ্যরচনার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত সংস্কৃতপ্রভাব বিদ্যমান থাকায় তা খুবই জটিল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। অবশ্য যথেষ্ট অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর রচনাকে এই যান্ত্রিক আড়ষ্টতার প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দন এনেছিলেন এবং সে ভাষা সহসা যৌবন-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে সর্ব

প্রকার ভারবহনে সক্ষমতা অর্জন করেছিল। কিন্তু, এসব সত্য হলেও অক্ষয়কুমারেব প্রভাব ও শক্তিমত্তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। একথা বলা খুবই সঙ্গত যে, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইতিহাস সৃষ্টির গৌরব লাভ করেছিলেন বলেই তাঁদের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ণও সামগ্রীক প্রখর ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমধিক প্রভাবিত হয়েছিল। এবং এই দু'জনের রচনার ভাষা ও সাহিত্যিক বিশ্লেষণ যত বেশী হয়েছে সেই তুলনায় অক্ষয়কুমারেব সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ততখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অর্থাৎ তিনি অনেক পরিমাণেই অনালোচিত থেকে গেছেন। অতএব অক্ষয়কুমারের-গদ্যরচনাব উপর নতুন আলোকপাত ঐতিহাসিক কারণেই প্রয়োজন। মনে বাখতে হবে, বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' এবং 'কথামালা' যে শিক্ষাকেন্দ্রিক গৌরব লাভে ধন্য হয়েছিল অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' তার তুলনায় কিছুমাত্র কম গৌরব লাভ করেনি। ডঃ সুকুমাব সেন মন্তব্য করেছেন "বহু বৎসর ধরিয়া চারুপাঠ বাঙ্গালী বালকের ভাষাশিক্ষায় ও জ্ঞান বৃদ্ধির যোগান দিয়া আসিয়াছে।" কিন্তু এসব মন্তব্য থেকে একথা মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই যে, ভাষাবিজ্ঞানী এবং ভাষাশিল্পী হিসাবে বিদ্যাসাগর প্রতিভার অবমূল্যায়ণ হচ্ছে। উনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে আবির্ভূত গদ্য লেখকদের মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে বাংলা গদ্যের প্রাণধর্ম আবিষ্কারের গৌরব লাভ করেছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য এবং সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার ছন্দ, লালিত্য, রসমাধুর্য এবং সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিদ্যাসাগরেরই একক আবিষ্কার এবং এই দুর্লভ উপলব্ধিব ফলই যে ললিত মাধুর্যময় বাংলা গদ্য—তা নিঃসংশয়েই বলা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে নয়—রাজা রামমোহনকে নয়—অক্ষয় কুমারকে নয়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই যে বাংলা গদ্যেব জনক বলা হয় এবং এই অভিধা যে নিতান্ত সমীচীন তা সম্ভবতঃ উক্ত কারণেই। একজন সমালোচকেব এই উক্তি তাই নিতান্ত মামুলী প্রশংসা-বাণী নয়—

> "সত্যই বিদ্যাসাগবের আগে বাঙ্গলা গদ্যে শ্রী বা ছন্দ বড কিছু ছিল না। বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যে লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য্য আনয়ন করিয়াছিলেন। বাংলা গদ্যের ছন্দ তিনি আবিষ্কার করেন। ছন্দোময় বাক্য গঠনরীতির প্রচলন বিদ্যাসাগর মহাশয় অতুলনীয় কীর্ত্তি।"

বিদ্যাসাগবের রচনাবলী নিতান্ত স্বল্পায়তন নয়। তাঁর রচনাকে বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মোট পাঁচ শ্রেণীর লেখা আমরা দেখতে পাই :

(ক) পাঠ্য পুস্তক :—

(১) বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। (২) ব্যাকরণ কৌমুদী। (৩) কথামালা। (৪) বোধদয়। (৫) জীবন চরিত (চেম্বার্সের

Biography অবলম্বনে) (৬) চরিতাবলী। (১৮৫৬) (৭) বাঙ্গালার ইতিহাস।

(খ) অনুবাদ গ্রন্থ :—

(১) বেতাল পঞ্চবিংশতি। (২) ভ্রান্তিবিলাস। (৩) শকুন্তলা।
(৪) সীতার বনবাস।

(গ) সাময়িক প্রসঙ্গ :—

(১) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।
(২) বাল্য বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।

(ঘ) বিবিধ—

(১) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, (২) বিদ্যাসাগর চরিত, (৩) মহাভারত, (৪) প্রভাবতীসম্ভাষণ।

(ঙ) কিছু বিচিত্র ধর্মী রচনা—

(১) ব্রজবিলাস, (২) রত্ন পরীক্ষা (৩) অতি অল্প হইল (৪) আবার অতি অল্প হইল।

যদিও বিদ্যাসাগর সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন—তবু সেগুলি ঠিক ভাষানুবাদ ছিল না। কারণ, বিষয়বস্তু মূলানুগ হলেও পরিবেশন-বৈচিত্র সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। তাঁর ব্যক্তি জীবনের সহৃদয়তা এই সব গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিক্ষিপ্ত হয়ে এক পৃথক মর্যাদা লাভ করেছে। সর্বোপরি অনন্যসাধারণ পেলবতা ও মাধুর্যের জন্য এক বিশিষ্ট সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে এইসব রচনা।

তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি এক সুদুর্লভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহযোগে রচিত। এ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচ্য। উনবিংশ শতকের পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতাগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রধান স্থানীয় বলে গণ্য। তাঁর রচিত অনেক পাঠ্যপুস্তক এক শতক পরে আজও সগৌরবে প্রচলিত। বিদ্যাসাগরের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে সহৃদয়তার সংমিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর বিষয়ক রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাটি শেষ করছি—

"গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

## ॥ প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ॥

উনবিংশ শতকের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উজ্জ্বলতম নামগুলির একটি। জাতীয় নবজাগরণের দ্বন্দ্ব-সমৃদ্ধ এবং যুগপৎ ধ্বংস ও সৃষ্টির পরম সন্ধিক্ষণে যে সব ভারতীয় মনীষী প্রাচীন ভারতীয় সাধনার সুসংস্কৃত রূপকে অবলম্বন করে একটি বলিষ্ঠ জীবন-ভিত্তিভূমি গঠন করে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ চিন্তার আলোকে সুষম ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে ব্রতী হয়ে বিবিধ সাহিত্যিক কর্মানুষ্ঠানে তৎপর হয়েছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। তাঁর শতক দেখা দিয়েছিল ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ রূপে। তৎকালীন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আপন প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎজীবন গঠনের বাস্তবতাকে যেন প্রত্যক্ষ করে পরহিত ব্রতেই আপন সাহিত্য-সৃষ্টির শিল্পীজনোচিত নৈপুণ্যকে নিয়োগ করেছিলেন। এমন দুর্লভ দৃষ্টি ছিল বলেই বিবিধ কালসীমার অন্তর্গত বিচ্ছেদগুলোকে সমন্বিত করার বিশেষ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন এবং তৎকালীন যুগ চিন্তা যেমন তাঁর শিল্পী ও সাধক-মানসকে গঠন করেছিল, অপরদিকে তেমনই তাঁর লোকোত্তর দৃষ্টির সঙ্গে মিশেছিল তাঁর জীবনদৃষ্টি এবং তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার মধ্যে পড়েছিল এই সমন্বয় দৃষ্টির প্রভাব। উনবিংশ শতকের অর্ধগঠিত সাহিত্যিক পটভূমিতে তিনি অবতীর্ণ হয়ে শুধু যে বিস্ময়কর ভাবপ্রবর্তনার দ্বারা নব যুগের সৃষ্টি করলেন—তাই নয়, পরন্তু তাঁর সাহিত্য-কর্ম-প্রচেষ্টা বিশেষ শৈলী দ্বারাও চিহ্নিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র তাই একাধারে আঙ্গিক-সংগঠক এবং নব মানবিক ভাব চেতনার উদ্গাতা।

তাঁর রচনা থেকেই তাঁর সাহিত্য-প্রেরণার উৎস নির্ণয় করা সম্ভব এবং সঙ্গত। এক সুপরিসর কল্যাণ চিন্তা থেকেই তাঁর সাহিত্য-প্রেরণা সমুদ্ভূত হয়। জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নব প্রাণসঞ্চারের মাধ্যমেই তিনি জাতীয় জাগরণের ও সার্বিক সমৃদ্ধির বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কর্মবীর ও স্বপ্নদ্রষ্টা—এই উভয় সত্তারই সুষম সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সাহিত্য গুরু। সাহিত্য প্রেরণার পৃষ্ঠভূমি স্বভাব ধর্মানুসারে সাহিত্য-প্রতিভা 'ললিতা ও মানস'এর রূপায়ণে প্রযুক্ত হলেও—সেই সত্যকে আমরা কেবলমাত্র জাতীয় বিশিষ্ট ভাবধারায় অনুকারী বলেই মনে করতে পারি। শীঘ্রই তিনি পথ পরিবর্তন করলেন এবং যৌবনের প্রাথমিক মোহ-কুয়াশা অপসৃত হলেই গদ্য-অবলম্বী সাহিত্য সাধনার রাজপথ তাঁর মানসে সুপ্রসারিত দেখা গেল, তিনি পরিচয় পেলেন—উপন্যাসেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ মুক্তি। সূচনা হল ১৮৬৫ এর 'দুর্গেশ নন্দিনীর' ঐতিহাসিক পদক্ষেপ—যার প্রতিধ্বনি চতুষ্পার্শ্বকে স্বল্পকালেই সচকিত করে তুলল। নতুন বিস্ময়ে প্রকাশিত হ'ল 'কপালকুণ্ডলা'—যার মধ্যে দেখতে পাই মধ্যে গভীর জটিল রহস্যঘেরা সাগর-বনানীর স্বপ্ন কল্পনার জীবনকে ঘিরে এক পার্থিব জীবন-জিজ্ঞাসার রূপায়ণ। এর অনুপম শিল্পকলা অবিলম্বে পাঠক

সমাজকে এক অপরিচিত আনন্দের স্বাদ এনে দিল এবং অনুরূপ বিস্ময়বোধে তাঁরা আবিষ্ট হলেন। এবং এই দিনগুলোর চমক ও কোলাহলকে কেন্দ্র করেই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় মন্তব্য :

"এক মুষলধারে ভাববর্ষনে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ব বাহিনী এবং পশ্চিম বাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনবেগে চলিতে লাগিল।" আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বের সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী উচ্ছ্বাস যেন এখনও কান পাতলেই আমাদের রক্তের মধ্যে ধ্বনিত শুনতে পাই। এই নব আলোক সৃষ্টির প্রবুদ্ধ চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রকে নব নব সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগে বাধ্য করল এবং ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সর্বাধিক শক্তিশালী কথাশিল্পীর আবির্ভাব হ'ল— যাঁকে আমরা এযুগে 'সাহিত্যসম্রাট অভিধা দিয়েই হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারি নি।"

অবশ্য ইতিহাসের চোখে প্রতিভার ভ্রান্তি এবং তার নিরসন—সবই একটা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। মাইকেলের 'ক্যাপটিভ লেডী' রচনার মত বঙ্কিমচন্দ্রের Rajmohan's wife) 'রাজমোহনের বৌ' অবশ্যই একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। কারণ, উনবিংশ শতকীয় বিদেশী প্রভাবের অধীন হয়েই তাবৎ শিক্ষিতকুল ইংরেজীর চরণে জীবন মন সমর্পণ করে ইংরেজী-আশ্রয়ী রচনায় আত্মপ্রকাশের সাধনায় মগ্ন হয়ে র্থকতার অন্বেষণে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁদের কজনকেই বা আজ দেশ মনে রেখেছে আর বঙ্গভাষাসেবী বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম চন্দ্রের স্থানই বা কোথায়? ইতিহাসে প্রত্যয় দৃষ্টি নিয়েই বলা যায় যে, সুদৃঢ়ভাবেই এই প্রশ্নের মীমাংসায় আজ থেকে অনেক আগেই সমগ্র জাতি উপনীত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনায় স্কট প্রমুখ বিদেশীগণের প্রভাবের কথা সকলেই উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু, বিস্মৃত হলে চলবে না যে, এই প্রভাব নিতান্ত বাহ্য এবং সে কারণেই তা তাঁর অন্তরলোক স্পর্শ করতে পারে নি। যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মহান রূপকার হিসাবে বঙ্কিম প্রতিভা কীর্তিত তার পিছনে এটি ছিল একটি উপপ্রেরণার মত। তাছাড়া তাঁর প্রতিভার আভ্যন্তরীণ ধর্মের কথা মনে রাখলে আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর অনন্যসাধারণ সংশ্লেষণ ও সমন্বয় ও আত্মীকরণের বিশেষ সত্যটিতে পৌঁছাব। অতীত-প্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ আর এই অতীতকেই তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠতম উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ এই অতীত চেতনাই তাঁর ভবিষ্যৎ নির্মিতির সোপান স্বরূপ ছিল। আর বোধ করি, একে আশ্রয় করেই সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালী চেতনা থেকে যাত্রা শুরু করে সর্বমানব-সমাজ সত্যের স্বর্গরাজ্যে তিনি সহজেই উপনীত হতে পেরেছিলেন এবং এটিই তাঁর সাহিত্যের মর্মাশ্রয়ী সত্য।

অঙ্কের হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়। দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম অর্থাৎ ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৭ পর্য্যন্ত কালসীমার মধ্যে তিনি মোট

১৪ খানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন—সেগুলির বিবিধ শ্রেণীবিভাগ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত প্রভৃতি সমালোচকগণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে এসব শ্রেণীবিভাগ সার্বজনীন স্বীকৃতি না পেতেও পারে। যাইহোক বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক, সামাজিক, রোমান্টিক, দেশাত্মবোধক, তত্ত্বমূলক প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর উপন্যাসেব রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে 'রাজসিংহ' প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। অনেকে অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী' 'আনন্দমঠ' সীতারাম প্রভৃতিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁব সামাজিক উপন্যাসেব মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তেব উইল' শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। রোমান্টিক উপন্যাস হিসাবে প্রধানতম 'কপালকুণ্ডলা' এবং প্রসঙ্গক্রমে 'রজনী' এবং 'ইন্দিরা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। প্রখ্যাত সকল সমালোচকই অবশ্য এবিষযে একমত যে, তাঁব শেষ জীবনে বচিত তিনখানি উপন্যাস আনন্দমঠ, দেবী চৌধুবাণী এবং সীতারাম প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক এবং জীবনাশ্রয়ী ভাবতীয় সনাতন ধর্মচেতনাবোধ থেকেই প্রেরণা পেয়েছে একথাও বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, শেষ পর্যায়েব এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক পরিমাণেই একটি মিশ্র রীতি অনুসরণ করেছেন

উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ যাইহোক না, কেন—তাঁর অধিকসংখ্যক উপন্যাসেই কথাশিল্পেব আদর্শ রচনারীতি অনুসৃত হয়েছে। উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা পূর্বে কিছু কিছু দেখা দিলেও বঙ্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে তুলনায় সেগুলি নিতান্তই নগণ্য। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস, (১৮২৫) ফবাসী মহিলা ম্যুলেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' অথবা প্যারীচাঁদেব 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রাবম্ভিক প্রচেষ্টা হিসাবে অভিনন্দনযোগ্য হলেও এগুলি প্রচেষ্টা মাত্র ফলবতী প্রচেষ্টা নয়। তাই বিগত একশত বৎসরেব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে এখনও শ্রেষ্ঠতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। উপন্যাস রচনায় কালাতীত আদর্শ তাঁরই রচনার মধ্যে প্রতিভাত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন, সমাজ, পারিপার্শ্বিকের গুরুতর পরিবর্তনহেতু জীবনদৃষ্টিরও পরিবর্তন সাধিত হয়—এই বিষয়টিকে সত্য হিসাবে মেনে নিলেও জীবনেব রহস্যময় জটিল ভাব শিল্পসম্মত উপস্থাপনই যদি উপন্যাস হয় তবে বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাস সর্বকালেব নিরিখে প্রায় আদর্শস্থানীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকে আজ পর্যন্ত উপন্যাস রচনা রীতির মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হযেছে এবং কাহিনী প্রধান উপন্যাস ক্রমশঃ চরিত্র প্রধান উপন্যাস ও সবশেষে বিশ্লেষণ প্রধান এবং চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে পরিবর্তিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসের শিল্পরহস্যের কেন্দ্রীয় সত্যের উদ্ঘাটন, ভাব-গভীরতা, শিল্পদৃষ্টি, সর্বোপরি জীবন জিজ্ঞাসা—যার মূলকথা ব্যাপকতর জীবনসত্যে উত্তরণ ইত্যাদি সর্বকালের পাঠকের কাছেই তাঁর উপন্যাসেব আকর্ষণকে অম্লান করে রাখবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা অখণ্ড হলেও একই জীবন-সত্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সৃষ্ট ক্ষমতাকে নিয়োজিত করেছিলেন কথাসাহিত্য ও মননশীল সাহিত্যে—এই

উভয় শ্রেণীর রচনায়। বলা বাহুল্য সাহিত্যের এই দুটি শাখায় সামগ্রীক পরিচয় লাভ না করলে পরিপূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের রূপটি উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। কারণ, এক বিশেষ পরিশীলিত, কল্যাণময় জীবনলাভই ছিল বঙ্কিম-আর্তির শেষ অন্বিষ্ট। এবং সেই অন্বেষণেই তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের পুণ্যশ্লোক ভগীরথ, তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হ'ল।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় লাভের সঙ্গে প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিটি সমন্বিত করলেই আমরা পরিপূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই। কিন্তু, ইনি কোন বঙ্কিমচন্দ্র? অবশ্য শিল্পী বঙ্কিম ও প্রবন্ধকার বঙ্কিম একে অপরের পরিপূরক। তাঁর জীবন দর্শনের যে কথাটা শিল্পরসমণ্ডিত করে বলেছেন কথা সাহিত্যের মধ্যে তাই তিনি স্পষ্ট বাস্তব- করে বলেছেন কৃষ্ণ চরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮), বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫), সাম্য (১৮৭৯) প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধাবলীতে। উল্লিখিত সব রচনাই গুরু চিন্তামূলক অর্থাৎ গভীর মননশীল ও মতপ্রধান। তাছাড়া তাঁর একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর রচনা রয়েছে যার সমকক্ষ রচনার নজির বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের রসাশ্রিত বিচিত্র রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অধিকাংশ সমালোচকের মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে 'কমলাকান্তের দপ্তর'। কমলাকান্তের আপাত উদাসীন চরিত্রের মধ্যে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা ক্লিষ্ট তত্ত্বদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের আপন ব্যক্তি চরিত্রের রসান্বিত প্রতিফলন হয়েছে। এটি বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ রচনা—কি বক্তব্যের স্বকীয়তা এবং গভীরতায়—কি বক্তব্য প্রকাশের অভিনব ভঙ্গীতে, তিনি যেন 'কমলাকান্তের' মুখোস পরে জীবনের কলকোলাহলের পশ্চাদবর্তী এক প্রচ্ছন্ন পটভূমিতে নিজেকে স্থাপন করে বিশেষ প্রজ্ঞা-দৃষ্টির আলোকে গতিমান এই জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। সরস বাগ্‌ভঙ্গীর সহায়তায় জীবনের এক আপাত-লঘু পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত, যার অন্তস্থল থেকে একটি ব্যর্থতা-পীড়িত বেদনার দৃষ্টিতে কবি-দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র এই জীবনের পরমার্থের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে অবশেষে সত্যপ্রাপ্ত হয়েছেন—"আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশালায়তন প্রবন্ধ সাহিত্য-তার বিশেষ স্থানটি বাংলা সাহিত্যে কোথায়? উনবিংশ শতকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অসংখ্য চিন্তাবিদ্ যাঁরা নানাভাবে তাঁদের চিন্তার সম্পদ আমাদের সামনে পুঞ্জীভূত করে রেখে গেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কোন অর্থে বিশিষ্ট? এর উত্তর একটি কথাতেই দেওয়া যেতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন মিলিত ও সমন্বিত উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র

তিনি বিপুল ক্ষমতাবলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার আত্মসাৎ করেছিলেন এবং তারই সঙ্গে নিজের সংস্কারমুক্ত অথচ অতীতপ্রেমী ও সত্তাকে সাঙ্গীকৃত এবং সংযুক্ত করে এক উদার ও মহান মানবিক ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর মানসিকতা গঠনে অতীত যুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকেই আশ্রয় করেছিল অথচ এক মোহমুক্ত স্বচ্ছ বিচারবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাকে বহুল পরিমাণে সংস্কার করে আধুনিক জীবনের উপযোগী করে গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বস্তুবাদী ও আদর্শবাদী। বস্তুর মধ্যেই তিনি শাশ্বত চৈতন্য সত্তাকে স্থাপন করতে আগ্রহী ছিলেন। ধর্মের সেইটুকুই আশ্রয় করতে প্রস্তুত ছিলেন যা মানুষের আন্তর সত্তার জাগরণ ঘটিয়ে মানুষকে মানুষ করে তুলতে সক্ষম হয়। তাই তাঁকে আমরা সংস্কারমুক্ত এক আধুনিক দার্শনিক বলতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে বুদ্ধির জগতে স্থাপন করেই তাকে যুক্তি ও তর্কের আঘাত সহকারী একসত্যে পরিণত করতে চেয়েছেন। এদিক থেকে তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয়।

রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের, বিবিধ প্রবন্ধ', 'সাম্য, 'লোকরহস্য' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' অশেষ আকর্ষণের সামগ্রী। এযুগের সংঘাতমুখর বিবিধ 'ইজম' এর পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিশিষ্ট সমাজবাদী—সমন্বয়ী রাজনৈতিক ও সমাজ-দর্শনের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে তিনি বাংলা তথা ভারতের সাধারণ ও অসাধারণ সব শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করেছেন—তা যথার্থ বিস্ময়কর। তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব এই যে, রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তার যোগসাধন করে তিনি চিন্তার তথা জীবনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন।

> "যখন সকলেই আমার তুল্য তখন আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব।......পর সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, কাহারও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ-প্রীতির সামঞ্জস্য।"—ধর্মতত্ত্ব

আশা করি, এই উদ্ধৃতি কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করেই স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

বক্তব্য প্রাধান্য হেতুই যে রচনা সাহিত্যে পরিণত হয় তা নয়। শৈলী সর্বস্বতা সমর্থনকারী আলংকারিকেরা ত প্রকারান্তরে প্রকাশ নৈপুণ্যকেই সাহিত্যিকের মৌল শক্তি বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন—'রসাত্মক বাক্যই হচ্ছে কাব্য। বঙ্কিমী-শৈলী এই বক্তব্যের অভিনবত্বের উপরই গড়ে উঠেছে। তাঁর বক্তব্যের বিশিষ্টতার ত তুলনাই নেই—সেই সঙ্গে মিশেছে তাঁর প্রকাশ ঐশ্বর্য্য। রবীন্দ্রনাথের সগৌরব

স্বাকৃতির পর এবিষয়ে কোন প্রশ্ন ওঠা অসম্ভব। কারণ মতটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পৃথিবীর যে সব সাহিত্যিক নিজস্বষ্ট ভাষাখাতে সাহিত্য স্রোতকে প্রবাহিত করে যুগপৎ ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিম পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক যে কোন গদ্য রচয়িতার ভাষা বিশ্লেষণ করলেই সে সত্য উদ্ঘাটিত হবে। তৎকালীন দুটি শক্তিশালী গোষ্ঠী বিদ্যা-সাগরীয় ও আলালী—এই দুইএর মধ্যে প্রথমটিকে যথাবিহিত সংস্কার ক'রে গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু তাই নয়—তাঁর সদা-সংস্কারপন্থী ও সৃষ্টিশীল মন যে কেবল প্রতি মুদ্রণে উপন্যাসগুলিকে সংস্কার করে নতুন রূপদানে তৎপর থাকত—তাই নয়, ভাষা সম্পর্কেও তিনি অতিমাত্রায় সচেতন থাকতেন এবং তাঁর বিজ্ঞান-দৃষ্টি ও সহৃদয়তা—এই দুই শক্তিমত্তার প্রয়োগ করে প্রকাশমাধ্যমকে আধুনিক যুগোপযোগী করে গঠন করতেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক থেকে শেষ জীবনে রচিত পুস্তক এবং একই পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণের ভাষাভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি ধরা পড়বে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকের ভাষা বিদ্যাসাগরের প্রভাবযুক্ত কিন্তু অল্প পরবর্তীকাল থেকেই ভাষা স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে। বঙ্কিমের ভাষায় যে কেবল তৎসম শব্দ প্রাধান্য ও তদনুরূপ ধ্বনি মাধুর্য আছে তাই নয়—জীবনধর্মিতার খাতিরে তিনি এক গতিশীল কথ্য ভাষারও নিপুণ ব্যবহার করেছেন। সবশেষে তাঁর রচনা-শৈলী সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ পোদ্দারের রচনাংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

> "যে নূতন জীবনচেতনায় সমকালীন মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, যে মুক্তি পিপাসা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, জীবনের প্রতি যে একটা অপরিমিত মোহ তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই চেতনা এবং উপলব্ধি, সেই গতি এবং প্রাণময়তাই শব্দ নির্বাচন এবং সাহিত্যরীতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে।"

## ॥ শরৎচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস ॥

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে এখনও পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্রই সম্ভবতঃ সমধিক জনপ্রিয় নাম। এমন সর্বগ্রাসী জনপ্রিয়তা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথও লাভ করেন নি। অবহেলিত নারীসমাজের প্রতি সর্বাঙ্গীন সহানুভূতি এবং তার সাহিত্যিক রূপায়ণই এই খ্যাতির উৎসস্বরূপ। যে অনুপম শিল্পকৃতি এবং গভীর জীবন-চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে খ্যাতির উচ্চসীমায় পৌঁছে দিয়েছিল শরৎচন্দ্র তার থেকে কিছু পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে তাঁর স্বকীয় শিল্পরীতির উদ্ভাবন করলেন এবং নীতির চিরাচরিত জগতকে পিছনে ফেলে ঔচিত্যবোধের সীমারেখা লঙ্ঘন করে মানবজীবনের প্রেম-ব্যাকুলতার তৃষ্ণাজনিত সত্যের প্রকাশের মধ্যেই মানুষের সার্থকতার সন্ধানে

ব্যাপৃত হলেন। মানবিক হৃদয়-ভাবনাই তাঁর সাহিত্য সাধনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়াল। মনুষ্যের প্রেমগত পূর্ণতার পথে সমাজকেই প্রতি-বন্ধকস্বরূপ আবিষ্কার করে তাঁর মৌলিক জিজ্ঞাসার সুরটি ধ্বনিত হল। কাহিনী-নিয়ন্ত্রিত ঔপন্যাসিক পটভূমিকে স্বীকৃতি জানিয়ে মানুষের মনের গভীর জটিল রহস্যালোকে সূক্ষ্ম হল তাঁর সতর্ক অথচ মরমী পদচারণা। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একটি সহানুভূতিশীল হৃদয় এবং আন্তরসত্যের উন্মোচন—এই দুটি সত্য দিয়েই উভয় ঔপন্যাসিককে আমরা চিনে নিতে পারি। যুগোপযোগী উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের ঔপন্যাসিক চেতনাকে গঠন করেছিল বলা যায়।

শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। শরৎচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ কিশোর এবং অর্ধস্ফুট কবি। বঙ্কিম প্রতিভা-সূর্য্য তখন মধ্যগগণ স্পর্শ করেছে। এবং তার উত্তাপ দীপ্তি ও প্রাখর্য্য সকলকেই প্রভাবিত করেছে। ঠিক সেই সময়েই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হ'ল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ বলেই এবং চিন্তাধারায় অনেক পরিমাণে অগ্রণী হওয়ায় তাঁর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর পড়েছিল। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে চিন্তার সাদৃশ্যই ছিল এই প্রভাবের মূল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি শরৎচন্দ্র অসংখ্যবার পাঠ করেছিলেন এবং বইখানির প্রভাব তাঁর শিল্পী-চরিত্রের উপর ছিল অপ্রতিরোধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-শিল্পের একটা দিকের অনুসৃতি অবশ্যই শরৎ-চন্দ্রের মধ্যে ছিল যদিও আপাত দৃষ্টিতে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশেই বিপরীতমুখী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাল, ঘটনা, চরিত্র ও আদর্শগত সংহতি প্রায় আদর্শ-মানে উন্নীত হয়েছে। শরৎচন্দ্র ও উপন্যাসের দীর্ঘ ব্যাপ্তি সত্বেও অনুরূপ সংহতিকে সর্বদাই বজায় রাখতে সচেষ্ট। শ্রীকান্ত তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্নরীতির উপন্যাস হলেও ভাবগত ঐক্যকে তিনি পরম্পরাক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ ও রক্ষা করে চলেছেন।

প্রচলিত দৃষ্টি অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সকলেই কট্টর নীতিবাদী এবং আদর্শ সাহিত্যিক হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত। কারণ, জীবনের ক্ষয়-ক্ষতির মূল্যে তিনি জীবনের শ্রেয়-বোধেই আস্থাশীল ছিলেন এবং শুচিতা ও মানসিক বিশুদ্ধিই ছিল তাঁর সাধনার ধন। অপর দিকে শরৎচন্দ্রকে সাধারণভাবে নীতিভ্রষ্ট এক দার্শনিক হিসাবে দেখাই সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলেই শরৎচন্দ্রের মধ্যেও এক দৃঢ় নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী প্রাণসত্তার আবিষ্কার করা যায়। কারণ, একথা কারও পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, শরৎ-চন্দ্রের পক্ষে প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যাভিচারই ছিল একমাত্র কাম্য। বরং শরৎসাহিত্যে আমরা মানব-মানবীর সমাজাশ্রয়ী সত্তার উর্ধগামী এক পবিত্র প্রেমসত্তার জগতে

উত্তরণের প্রাধান্যের বিষয়টিই লক্ষ্য করি। বস্তুতঃ শরৎ-অস্তিত্ব তার সমগ্রতা নিয়ে সেকালের সমাজের কাছেই একটি সুবৃহৎ জিজ্ঞাসার চিহ্নের রূপ ধারণ করেছিল বলেই তাঁকে আমরা এক নতুন আদর্শের অনুসারী হিসাবে দেখব। এটিও জীবন ভিত্তিক এক নীতির প্রশ্ন —যার মধ্যে নব মানবতাবাদের উদার স্বরটি শোনা যায় এবং যা আমাদেব এতদিনের পিপাসিত হৃদয়কে সান্ত্বনার স্পর্শে সঞ্জীবিত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় শরৎ-প্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি? নানাদিক থেকেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কোন সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মের বৈশিষ্ট্য তার বিষয়বস্তু এবং রচনা কৌশলের দিক থেকে নিরূপিত হতে পারে। প্রত্যেক শক্তিশালী সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব নীতির প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করে থাকেন। তার মধ্যেই তাঁর স্বাতন্ত্র সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়ভাবে ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রও প্রকাশবৈচিত্রের নিজস্বতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। ববীন্দ্রনাথ যে নতুন মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির অবতারণা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে করেছিলেন—তার সার্থক চর্চা শরৎচন্দ্রের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে প্রকাশভঙ্গীর যে চরম সংহতি লক্ষ্যকরি তা শরৎচন্দ্রে নেই—এখানে বিশ্লেষণের পশ্চাৎপট আরও ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্যের অনুশীলনে রত হতে দেখা যায় ঔপন্যাসিককে। বঙ্কিমচন্দ্রে যে বিশ্লেষণের অভাব আছে—তা নয়, তবে তার রীতি যে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন সে কথা অবশ্য স্বীকার্য।

বঙ্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায় প্রধানতঃ বিষয়বস্তু ও মনোভঙ্গীর বিষয়কে কেন্দ্র করেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপজীব্য ছিল যেখানে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, কৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্চমধ্যবিত্তের জীবন—সেখানে শরৎচন্দ্র তাঁর দৃষ্টিক্ষেপ করলেন বাংলার পল্লীর অভ্যন্তরে—যেখানে নানা সমস্যায় জর্জরিত জীবনরূপের অন্তরালে হৃদয়ের লীলাস্রোত যথারীতি উৎসারিত। সমাজের ব্যাপকতর রূপকে প্রত্যক্ষ করলেন শরৎচন্দ্র তাঁর সম্প্রসারিত হৃদয়ের অনুভূতি-গভীর দৃষ্টিতে। যে জীবনেব অভ্যন্তবে জন্মলাভ করেছিলেন এবং জীবনের স্তর-পরম্পরা যে বাস্তব উপাদানে গড়ে উঠেছিল তাকেই তিনি তাঁব বাহ্যিক ও মানসিক জীবনের অঙ্গীভূত করে নিলেন—রূপায়িত করলেন সেই মহাজীবন সত্যকে—যা ছড়িয়ে আছে অবজ্ঞাত পল্লী বাংলায় জীর্ণ কুটীরের অভ্যন্তরে। পরিচিত জগতের অন্তরালে আবিষ্কার করলেন সেই সব বহুধা-বিস্তৃত শক্তিশালী সমাজ সত্যকে-যা এতদিন এই দেশেরই মানুষের উপর অবস্থান করেছে অনড় প্রস্তরখণ্ডের মত। আর্থিক ও মানসিক দৈন্য-জীর্ণ সেইসব মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন—যার কিছু কিছু প্রতিফলন হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্র, তারক গঙ্গোপাধ্যায় ও রমেশ দত্ত এবং প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে—সে সবই অভিনবরূপে প্রতিফলিত ও পুনঃ প্রকাশিত হল শরৎ সাহিত্যে। সে কৃতিত্ব গড়ে উঠেছে পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপে বিরত ছিলেন সে দিকেই শরৎচন্দ্র তাঁর পরিপূর্ণ দৃষ্টি

নিয়ে দেখলেন এবং আমাদের উপহাব দিলেন তাঁর নতুন জীবন-চেতনার ফসল। বিভূতিভূষণেও আমরা অনুরূপ জীবন-দৃষ্টি লাভ করি তা কিছু কিছু পার্থক্য চিহ্নিত। বিভূতিভূষণে যে আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক প্রকৃতি চেতনা—তা শরৎচন্দ্রে নেই। আবাব শরৎচন্দ্রের বাস্তব-সমাজ চেতনা ও সমাজ-সংশোধনের পথনির্দেশ ও সুকঠিন সমালোচনাও বিভূতিভূষণ নেই। অতি সচেতন শরৎচন্দ্রেব সমালোচক সত্তাব চবম প্রতিফলন হয়েছে তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে এবং বার্ণার্ড শ এব মত এক সুবিশাল জিজ্ঞাসায় তিনি উচ্চকিত করেছেন সমগ্র সমাজকে। আর 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রেব শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হয়েছে। মনে হয়, উনবিংশ শতকীয় যুক্তিবাদ ও নতুন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা তিনি প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব মত চিন্তাবিদ না হলেও তাঁর মননশীলতাব কিছু কিছু প্রকাশ হয়েছে তাঁর চিঠিপত্রগুলিতে, অভিভাষণসমূহে এবং সর্বোপবি 'নাবীর মূল্য' শীর্ষক ক্ষুদ্র অথচ চিন্তাপ্রধান গ্রন্থে। শবৎচন্দ্র এসবেব মধ্যে নির্দ্বিধায় এবং পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

শরৎ সাহিত্যের প্রশংসা সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নিন্দাবাদও তাঁব প্রাপ্য। এ জাতীয বিরূপ সমালোচনায় সবচেয়ে বড উপাদান হ'ল তার ভাবাতিশয্য। ভাববস্তুই যে সাহিত্যেব প্রাণস্বরূপ সে বিষয় আব সন্দেহ কি? কিন্তু, তাব আতিশয্যও যে শিল্প দৃষ্টিতে নিন্দনীয়—তাতেই বা সংশয় কি? শবৎচন্দ্রেব সর্বাধিক জনপ্রিয উপন্যাস, বোধ কবি 'দেবদাস'। এটি তাঁব প্রথম যৌবনেব রচনা বলেই ভাবাতিশয্যে পরিপূর্ণ। কি কারণে 'দেবদাস' প্রধান স্থানীয় প্রায় সকল ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল? জনপ্রিয়তাই যে এব কাবণ, সে সত্য সহজেই অনুধাবন কবা চলে। আব সমভাবে এটিও সর্বজন পরিজ্ঞাত সত্য যে, এমন বাঙালী যুবক কমই আছেন যিনি এই উপন্যাস পাঠে অশ্রু সংবরণে সমর্থ হয়েছেন। অথচ এই উপন্যাসটিতে বিরুদ্ধে শবৎচন্দ্রেব কাঁচা শিল্পকলার অভিযোগ অনেক কালেব।

কিন্তু, শরৎচন্দ্রের ভাবাতিশয্যের একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে। তিনি একাধাবে বাস্তববাদী এবং ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতা তাঁব বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাব হৃদয় মধ্যস্থ প্রতিফলন বলেই গৃহীত হতে পারে। প্রসঙ্গটি আমাদের শবৎ-চন্দ্রেব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবনেব কথাই স্মবণ কবিয়ে দেবে—যে জীবন তিনি বাংলা দেশ, ভাগলপুব, এবং ব্রহ্মদেশে যাপন কবেছিলেন। মনুষ্যত্বেব বহুবিধ অব-মাননা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিনি সর্বকালের একজন সাচ্চা হৃদয়বান মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর দেখাটা ঠিক সেই দৃষ্টিতেই হয়েছিল। জীবনকে যদি তিনি এভাবেই না দেখতেন তবে কোথায় পেতাম ব্রহ্মদেশের পটভূমিব এই জীবনছবি—কোথায় পেতাম অন্নদা দিদিব মতো এক চিরস্মরণীয় চরিত্র—যার ভিত্তিভূমি এক ভাবকেন্দ্রিক আদর্শবাদ (স্বামীনিষ্ঠা)? এ বিষয়ে একটা বিস্ময়কব

সত্য এই যে, শরৎ-সাহিত্যের এই ভাবালুতা তাঁরই ব্যক্তি চরিত্রের রোমান্টিক ভাবালুতার বহিঃপ্রকাশ।

এক অতুলনীয় হৃদয়বত্তা সত্ত্বেও, গভীর ব্যবহারিক সংযম ও ত্যাগনিষ্ঠা শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ নারীচরিত্রই আত্মসমর্পন এবং সেবা-পরায়ণতার মহিমায় উজ্জ্বল। শ্রীকান্তের অন্নদাদিদি, বিপ্রদাসের বন্দনা, চরিত্রহীনের সাবিত্রী, শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি এর নিদর্শন। হৃদয়াবেগ ও অভিমান এবং এসবের গোপন সংযত শিল্পসম্মত প্রকাশ শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে সহজেই প্রাপ্তব্য। অনুরূপ ভাবালুতা শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যেও সংক্রামিত। বঙ্কিমের পুরুষ চরিত্রগুলির মতো এই সব চরিত্র দৃঢ়চেতা, চিন্তা-প্রধান এবং কর্মঠ নয়। নারীসুলভ ভাবাতিশয্য, মান অভিমান এবং তার সুদূরব্যাপী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন পুরুষ চরিত্র তাদের কর্মধারাকে প্রসারিত করেছে। রমাকে কেন্দ্র করে রমেশের প্রতিক্রিয়া একটা অন্তহীন জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেটি কোন সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছায় না। গৃহদাহের মহিমের মধ্যে যে প্রেম ও সিদ্ধান্তকেন্দ্রিক দার্ঢ্য আমরা প্রথম দিকে লক্ষ্য করি—পরে সে শক্তি আর কখনও অধিকারবোধের প্রতিষ্ঠার মধ্যে রূপান্তরিত হয় না এবং সুরেশ পুরুষ হলেও অচঞ্চল পৌরুষের কোন লক্ষণ তার মধ্যে নেই। পুরুষের অব্যবস্থিতচিত্ততার চরমউদাহরণ শ্রীকান্ত—যে চরিত্রটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের আত্ম প্রতিফলন সর্বাধিক পরিমাণে হয়েছে—তার মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল বিস্ময়কর ঔদাসীন্য এবং জীবনের প্রতি দীর্ঘ আকর্ষণহীনতা।

শরৎ সাহিত্যে বিবিধ সমাজ সমস্যার সযত্ন উপস্থাপনা আছে কিন্তু তার কোন সুষ্ঠু সমাধান আমরা পাই না। ঔপন্যাসিকের চরিত্রের এক অনির্দেশ্য দুর্বলতা ও সঙ্কোচ আমাদের কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত থেকে বঞ্চিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রীয় দৃঢ়তা ও চিন্তা স্বচ্ছতা এখানে অলভ্য। অবশ্য, এমন দাবীর যাথার্থ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারেই। তবুও একথা যে আমাদের মনে জাগে তা স্বীকার করতেই হবে।

শরৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি এই যে, সমগ্র নারী সমাজের প্রতি তিনি অশেষ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে তাঁদের অন্তরঙ্গ চিত্র তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে অঙ্কন করে চিরকালের মত তাঁদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই সৌভাগ্য আর কোন সাহিত্যিক অর্জন করেন নি। তাছাড়া প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতার পাপ আছে তার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করে শরৎচন্দ্র গোর্কীয় মতই মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন বলেই তিনি শ্রদ্ধেয়।

## ॥ বাংলা কবিতা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের সর্বাধিক বিতর্কিত কবি। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের অনেক সমালোচক অনুকূল ও প্রতিকূল

উভয়বিধ সমালোচনা করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কবিতার শ্রেণী নির্ণয় ও সেগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা—সে বিষয়েও নানা মত প্রকাশ করা হয়েছে। সেযুগের শ্রেষ্ঠ স্থানীয় সাহিত্যিক ও সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইংরেজীতে একটি বিরূপ সমালোচনা এবং পরে একটি নিরপেক্ষ সমালোচনা করেছিলেন। আধুনিক যুগে একাধিক সাহিত্য ইতিহাসকার এবং সমালোচক ঈশ্বর প্রতিভার মূল্য নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের দ্বিবিধ সত্তাকে স্বীকার করে নিযে আমবা একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণের দিকে অগ্রসর হতে পারি। তিনি মুখ্যতঃ সাংবাদিক ছিলেন এবং কবিত্ব ছিল তাঁর জীবনের গৌণ দিক। সত্য হিসাবে আর একটি মন্তব্যকেও আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারি। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হিসাবে যেমন তিনি তাঁর সমাজ সচেতনাকে প্রকাশ করেছিলেন—একই সত্যের সূত্র ধবে তিনি তেমনি একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠিকে গড়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ এই গঠনমূলকতা তাঁর স্বদেশপ্রাণতা ও সমাজ গঠন প্রয়াসের একটি বড় দিক বলে বিবেচিত হতে পারে। ইতিহাসের সত্য অনুসারে তিনি অক্ষয় দত্তের আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের পথকে সুগম করেছিলেন তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠির সঙ্গে তাঁব পরিচয় সাধন করে এবং দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যিককে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা তিনিই দিয়েছিলেন।

গুপ্তকবির জীবনের মূল সুরটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীলতার। তাঁর এই মনোভাব গঠিত হয়েছিল তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ের কঠিনতম প্রতিকূলতাকে কেন্দ্র করে। কৈশোরে গৃহবিতাড়িত অবস্থায় তিনি যে মানব জীবনের সাধারণ প্রাপ্য স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাই নয় তখন থেকেই তাঁকে দুরূহ জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। জীবনের যে প্রতিকূলরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তারই বিরুদ্ধে উত্তর জীবনে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তকে যেখানে আমরা হাস্য-রসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতার কবি হিসাবে পাই, সেখানে আমরা বুঝতে পারি যে, সুস্থ-জীবন কামনা তাঁর মধ্যে কতখানি তীব্র ছিল এবং তার অভাবেই তিনি যেন আক্রমণপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কৃত্রিমতার আঘাতপ্রাপ্তি খুব বেশী মাত্রায় হয়েছিল বলেই জীবনের যা কিছু অসার ও বাহ্যিক—তার অবস্থান ও পুষ্টিকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি।

তাঁর অন্তর্জীবনের মধ্যেই ছিল এক প্রচণ্ড আপোষহীন বিরোধ। তাই একধারে তিনি ছিলেন প্রাচীন পন্থী ও আধুনিক। কিছু সঙ্কীর্ণতা, স্থূলতা ও অশ্লীলতা সত্ত্বেও সার্বিক বিচারে তিনি ছিলেন চিন্তাশীল, সুন্দর ও ঈশ্বরের পূর্ণ রূপের পূজারী এবং সর্বোপরি একজন খাঁটি বাঙ্গালী দেশপ্রেমিক। তাঁর আভ্যন্তরীণ সত্তার এই সব বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হয়ে গেছে যে, এ বিষয়ে বেশী

কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। বিংশ শতকীয় জীবন-দৃষ্টি ও বিচারবোধ নিয়ে গুপ্তকবির বিচার করতে বসলে তাঁর অনেক কিছুই আমরা গ্রহণ করতে পারব না– তা সত্য। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর কালগত পার্থক্য যতই থাক না কেন এবং তাঁর মধ্যে উন্নত মানের কবি-জনোচিত প্রকাশভঙ্গীর অভাবকেও স্বীকার করে নিলেও তাঁর চিত্তের শুদ্ধচারিতা ও সরল অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গীর জন্য তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা অর্জন করবেন।

গুপ্ত কবির কবিতা-সমালোচকগণ তাঁর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন—একটি স্থূলতা অপরটি অশ্লীলতা। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির উপযুক্ত সূক্ষ্মতা তাঁর মধ্যে ছিল না। অতএব গীতিকবি হিসাবে মধুসূদন এবং বিহারীলালের যে অনন্য সাধারণ দক্ষতা ছিল, এমনকি হেমচন্দ্রের মধ্যে যতটুকু শিল্পনৈপুণ্য ছিল—সে সবের অনুরূপ নৈপুণ্য ঈশ্বর গুপ্তের ছিলনা। তাই গীতি কবি হিসাবে তিনি সংখ্যাতীত কবিতা রচনা করলেও ভাবের তুলনায় বস্তুই অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। রসসৃষ্টি হলেও তা উল্লেখযোগ্য কোন সূক্ষ্মতা লাভ করতে পারে নি। অবশ্য এইসব বিপরীতমুখী সত্য সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর কবিতাগুলির সর্বত্র একটা অপরিসীম আন্তরিকতা ও জীবনসুস্থতার প্রতি আকর্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এবং অপর কয়েকজনের মতে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর অনেকাংশেই এক অমার্জিত রুচি এবং অশ্লীলতায় প্রকাশ ঘটেছে। অশ্লীলতার বিষয়টি সমর্থন না করলেও এর কালগত এবং সুপ্রাচীন সংস্কারগত ভিত্তিকে অস্বীকার করা যায় না। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমালোচকরা তাঁদের সমালোচনায় বলতে চেষ্টা করেছেন যে, সুদূর অতীত কালের জয়দেব থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস, চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কয়েকজন মঙ্গল কাব্যের কবি এবং একালের ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ইত্যাদি সকলের মধ্যেই অশ্লীলতার একটি ধারা প্রবহমান রয়েছে। এর উত্তরাধিকার ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও স্বীকৃতি লাভ করেছে কার্যকরীভাবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, বাংলা সাহিত্যকে এই প্রাচীন কলুষতা থেকে মুক্ত করলেন সর্ব প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উন্নতমাণের সর্বোত্তম রুচির প্রতিষ্ঠার দ্বারা—যার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরপ্রাণতা, ভোজন বিলাসিতা, বঙ্গসংস্কৃতি—প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় অবলম্বনে তিনি প্রচুর সংখ্যক কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু, এত সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সব গুলোর মধ্য থেকেই একটা সাধারণ সুরই যেন আমরা শুনতে পাই—সেটি হচ্ছে তাঁর স্বদেশভক্তির সুর। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত ইতিহাসের গৌরবদৃপ্ত অধ্যায় অবলম্বনে যেমন সে যুগের ভারত-সংস্কৃতি সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত তেমনি বাংলাসংস্কৃতির অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও

তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়গুলিকে তিনি যেন এক বলিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির উষ্ণ স্পর্শে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরসতা ও কৌতুক বোধ দ্বারা তিনি এই সব বিষয়কে অভিষিক্ত করেছিলেন। যার ফলে এযুগের উন্নাসিক পাঠকের কাছেও এই জাতীয় কবিতা যথেষ্ট আগ্রহের কেন্দ্র-স্বরূপ।

(১) "সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা॥
বধুর মধুর খনি মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু শতদল॥"—পৌষপার্বণ।

(২) "সকল নয়ন মাঝে রক্ত আভা আছে।
মনে হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥"—আনারস।

কোন কবিতায় বা কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে জীবনার্তির অশ্রু। বলাবাহুল্য এই পংক্তিগুলি যথার্থই করুণ।

(৩) "সিঞ্চিয়া অমৃত নিধি জীবে দান দিল বিধি
নিরুপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে কোটি কল্পে নাহিমিলে
কালকূট কালের কৌতুক।"—যৌবন।

কাব্যকৃতিতে ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশকুশলতার উন্নত মানে উন্নীত হতে সক্ষম না হলেও এক দুর্লভ বলিষ্ঠ জীবনচেতনায়, দীপ্ত প্রকাশ ব্যাকুলতায়, ভাবের আন্তরিকতায় তাঁর কবিতাগুলি এক কালোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করেছে।

## ॥ মাইকেল মধুসূদন : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥

উনবিংশ শতকের গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ পদচারণায় কম্পমান, কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস মঞ্চেও মাইকেল মধুসূদনও তেমনি গৌরবে সমাসীন। মহিমান্বিত জীবনদৃষ্টির উজ্জ্বলতায়, আঙ্গিক রীতির উদ্ভাবন ও রূপায়ণের অভিনবত্বে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবময়তার সমন্বয়ে এবং সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বিস্ময়ের দ্বারা তিনি সামগ্রীক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে চিহ্নিত করেছেন। বিচিত্র জীবনচারী মধুসূদন বিশিষ্ট যুগ-পটভূমিতে আবির্ভূত হয়ে তাঁরই পরিপার্শ্বকে এক বিচিত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে প্রকৃতপক্ষে একটি নূতন যুগ সৃষ্টিই করেছিলেন। তাই তিনি একাধারে যুগ-সৃষ্টি ও যুগ-স্রষ্টা এবং সেই অর্থেই যুগন্ধর। কারণ, তাঁর মধ্যেই বিশিষ্ট যুগভাবনা লালিত পালিত হয়েছিল এবং তাঁর কবিমনের লীলা-ময়তার মধ্যেই ঘটেছিল তার সুন্দরতম প্রকাশ।

সৃষ্টি-নৈপুণ্য কবির মর্মমূল থেকে উৎসারিত হলেও, কবিকর্মের সাংগঠনিক কৃতিত্ব অবশ্যই কবির অনন্য জীবনধারা—সাগরদাঁড়ির মধু কবির কপোতাক্ষ নদের কুলুধ্বনি সমৃদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং গৃহ-পরিবেশে জননী জাহ্নবীর স্নেহ-সান্নিধ্য, শিক্ষা পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের অনন্ত বৈচিত্র্য এবং অসীম গভীরতা তাঁর বাল্য-চিত্তকে ধীরে ধীরে একটা নির্দিষ্ট রূপ দান করছিল। উত্তর জীবনে তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা মেঘনাদ বধ কাব্যের নারী চরিত্র সৃষ্টিতে এই জননী জাহ্নবীর প্রভাব অনিবার্যভাবেই কার্য্যকরী হয়েছিল। সুদূর প্রবাসে বসবাসের সময় তাঁর মানসকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বহু দূরবর্তী কপোতাক্ষের সুমিষ্ট কলতান।

আজন্ম বিলাসী মধুসূদনের স্বভাব ধর্মের মধ্যে বিলাসিতা অনুস্যূত হলেও, তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল যথার্থই বিস্ময়কর। অতি শৈশব থেকেই এই ধারাটি তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে তাঁর সাহিত্যিক—মনকে উপাদান সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য ভাষা ও সাহিত্য প্রীতি আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণের জীবন ইতিহাসে কিংবদন্তীর মর্যাদা লাভ করেছে। মধুসূদনের ক্ষেত্রে এটির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্য তাঁর সাহিত্যের ভাবময়তাকে কোথাও অতিক্রম করে যেতে প্রয়াসী হয় নি। মধুসূদন ছিলেন আত্ম-প্রত্যয় দৃঢ়—যার থেকে এসেছিল আত্মসচেতনতা। এই আত্মসচেতনতা তাঁর কবি মনের নিয়ন্ত্রক শক্তিস্বরূপ ছিল। এই ভাবটির অতিমাত্রিকতা কখনও বা আত্মম্ভরিতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তার সম্যক পরিচয় তাঁর কলকাতায় ছাত্র-জীবন ইতিহাসের বিবিধ পর্যায়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিশ্রিত ভাব প্রেরণা এবং প্রধানত প্রতীচ্য মহাকবি-কেন্দ্রিক প্রেরণা যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্য রূপায়ণে উৎসশক্তি স্বরূপ, সীমাহীন স্ব-শক্তি নিষ্ঠা তেমনি রূপান্তরিত হয়েছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে।

নাটক রচনা দিয়েই মাইকেলের সাহিত্য জীবনের সূচনা এবং বেলগাছিয়ার নাট্যশালা তাঁর প্রথম পাদপীঠ। ভাল বাংলা নাটকের অভাব জনিত আত্মধিকার ও যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং আত্মবিশ্বাস তাঁর মনে নাট্য রচনার প্রেরণা সঞ্চার করে এবং তারই ফলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আত্ম-প্রকাশ। অল্প পরবর্তী সময়ের মধ্যেই তাঁর অন্যান্য নাটক 'পদ্মাবতী' 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'. 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের' প্রকাশকাল ১৮৬০। পরে তাঁর অপর কাব্যগ্রন্থ 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' এবং সবশেষে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন খুব দীর্ঘস্থায়ী নয়—সামগ্রীকভাবে মাত্র পাঁচ বছর এবং তাঁর রচনার সংখ্যাও বেশ সীমিত।

'মেঘনাদবধ' কাব্যকে মধুসূদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গণ্য করেছেন প্রায়

সকল সমালোচক। উনবিংশ শতকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি কবিবৃন্দ মহাকাব্য রচনা করলেও মেঘনাদবধ কাব্যই যে তুলনামূলকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ—সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই কাব্য সৃষ্টির বহিঃপ্রেরণা হিসাবে আমরা পাশ্চাত্যের মিল্টন, ভার্জিল, ট্যাসো, হোমার প্রভৃতি মহাকবিগণের নাম উল্লেখ করতে পারি এবং একই সঙ্গে ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের মূল রচয়িতা বাল্মীকি ও বেদব্যাস এবং অনুবাদক কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। আর অন্তস্থ প্রেরণা ছিল তাঁর মহাকবি হিসাবে খ্যাত হবার দুর্জয় অভিলাষ। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন,–"সে যুগের সাহিত্য রচনার আদর্শে মহাকাব্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইত মহাকাব্য রচনা করিলেই মহাকবি হওয়া যায় ইহাই সমাজের বিশ্বাস ছিল। মধু-সূদন যেমন উচ্চাভিলাষী ছিলেন, তেমনি আত্ম-প্রত্যয় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও মহাকাব্য রচনা করিয়া মহাকবি বলিয়া গণ্য হইবার অভিলাষ করিলেন।" মোট ন'টি সর্গে কাব্যখানি বিস্তৃতিলাভ করেছে। কাব্যের নাম 'মেঘনাদবধ কাব্য' হলেও এর প্রকৃত নায়ক হলেন রাবণ। কবির অসংখ্য চিঠিপত্রের মধ্যে এই কাব্যের বহু প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যেগুলির সাহায্যে এর কাব্যধর্ম সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। রাবণকে মহাকবি অন্তরের সমগ্র সহানুভূতি দিয়ে নির্মাণ করেছেন। এই কাব্যে রাবণ এক দৈবাহত শক্তিশালী, কৃষ্টিবান মানুষ হিসাবে চিত্রিত যাঁর মধ্যে কবির ব্যক্তি চরিত্রের প্রতিফলন হয়েছে বলে মনে করা হয়। উনবিংশ শতকের নবজাগ্রত পটভূমিতে উদ্ভূত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ একটি ভিন্নধর্মী ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রকে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া এক বিশেষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীও এই চরিত্রের কাব্যময় রূপায়ণের সহায়ক হয়েছে।

খুব সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের বিশিষ্টতা-নিরূপক লক্ষণগুলি উপস্থাপিত হতে পারে। যদিও স্বল্প পরিসরে মধুসূদন আলোচনা সুকঠিন ব্যাপার। ভাবের দিক থেকে না হলেও রীতির দিক থেকে স্বাভাবিক বলেই মধুসূদন তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিভাকে মহাকাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছিলেন। একটি অনুপম ক্ল্যাসিক চেতনা তাঁর মধ্যে শুদ্ধরূপেই বর্তমান ছিল। উনবিংশ শতকের অপর মহাকাব্য রচয়িতাগণের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকেই শ্রেষ্ঠ কবির সম্মানজনক আসনটি দিতে হয়। কারণ, কল্পনায় এমন উদাত্ততা, ভাবের গভীরতা, অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী, সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী, প্রকাশ সংহতি অপর কবিদের মধ্যে ছিল না। তাই মধুসূদন প্রকৃত অর্থেই মহাকবি ও উনবিংশ শতকের বৃহৎ কাহিনীকাব্যের ধারায় তিনিই ব্যক্তি চেতনার সুরটি আরোপ করলেন।

এই সূত্রটি থেকেই বলা যায়, ঈশ্বর গুপ্তের গীতি কবিতায় আংশিক সার্থকতা মধু-সূদনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ

করেছে। এই দ্বিধা-বিভক্ত কবি ব্যক্তিত্বের মৌল উপাদান হ'ল মহাকবি ও গীতি-কবির সত্তা। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' এবং তাঁর মহাকাব্যের অংশবিশেষে এই ধর্মটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। সমকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্য তাই তাঁর কাছে ঋণী।

প্রথম বাংলা সনেট রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের অবদান প্রশ্নাতীত। পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীয়রীয়—দুই ধারায় সনেটও তিনি রচনা করেন— পরে এই সনেট সম্যক পুষ্টি লাভ করে প্রমথ চৌধুরী, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্র সেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফলে। তাই এটিও মধুসূদন প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হ'ল অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে জন্য সমগ্র বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে ঋণী। এর প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল পদ্মাবতী নাটকে পরে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকতম প্রয়োগ হয় মেঘনাদবধ কাব্য ও অন্যত্র। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমীচীন যে, প্রথম সার্থক বাংলা ট্রাজিক নাটকের নাট্যকারও হলেন মাইকেল মধুসূদন।

## ॥ বিহারীলাল ও বাংলা গীতিকবিতা

উনবিংশ শতকের বাংলা গীতি কবিতার ইতিহাসে বিহারীলাল চক্রবর্তীর নামই বিশিষ্টতম। প্রকৃত গীতিকবিতা বলতে আমরা যা বুঝি এবং যার চরম বিকাশ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এর পূর্ব সূচনা মধুসূদনের মধ্যে হয়ে থাকলেও বিহারীলালই গীতি কবিতার প্রকৃত হৃদয় ধর্মটিকে উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন এবং তার স্বভাবধর্ম অনুসারে যথাসাধ্য রূপায়িত করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর গীতি কবির প্রতিভার অধিকারী অবশ্য বিহারীলাল ছিলেন না। কিন্তু কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে তিনি কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি অধিকার করে আছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কাব্য গুরু হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং বিশ্বকবি কাব্য প্রেরণার ব্যক্তি-উৎস হিসাবে একাধিকবার বিহারীলালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করায় তাঁর এই গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বেড়ে যায় এবং পরবর্তী সমালোচকগণ রবীন্দ্র-ভক্তির অমর্যাদা করতে সাহসী হন নি। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিহারীলাল যে মুখ্য প্রেরণাস্থল ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই প্রভাবের ছাপ রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান' প্রভৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও কেবলমাত্র এইসব কাব্যগ্রন্থই রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় জ্ঞাপক নয়। তাছাড়া রবীন্দ্র প্রতিভার সমগ্রতার কথা চিন্তা করলে ও পরবর্তী আত্মপ্রতিষ্ঠ কবি জীবনের কথা বিবেচনা করে দেখলে বিহারীলালের এই প্রভাবকে সুদূর প্রসারী বলা যায় না। বিহারীলালের প্রকাশক্ষমতাও ছিল সীমিত এবং কেবলমাত্র 'সারদা মঙ্গল' ও 'সাধের আসন' ব্যতীত পূর্ববর্তী অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

গুলির প্রকাশভঙ্গীর মান আশানুরূপ উন্নত নয়। বিহারীলালের প্রথম দুখানি কাব্য গ্রন্থের ভাষাভঙ্গীর উপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত—অপর বৈশিষ্ট্যও অনুকৃত হয়েছিল—যার ফলে তাঁর স্বকীয়তা হয়েছিল ব্যাহত।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্যে যে ধরণের বস্তুময়তার প্রাবল্য ছিল তার প্রকাশ হয়েছে স্থূল উপস্থাপনা রীতিকে অনুসরণ করে। ভাব তন্ময়তা এবং ভাবসূক্ষ্মতা তাঁর কাব্যের প্রায় কোথাও লক্ষ্যীভূত নয়। তাই ঈশ্বর গুপ্ত প্রকৃতি ও ঈশ্বর-ভাবনাকে অবলম্বন করে গীতিকবিতা রচনা করলেও তা কোথাও অজ্ঞাতের প্রতি কৌতূহলের স্বাভাবিকতার সীমারেখা অতিক্রম করে গাঢ় জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি। এমন কি একথাও সাহস করে বলা যায় যে, মধুসূদনের মত দুর্লভ প্রতিভাশালী যুগন্ধর কবির চতুর্দশ পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত গীতি কবিতাগুলিও অনেকাংশেই নিতান্ত বস্তুময় এবং সনেটকে ভঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করার সেই বস্তু-তন্ময়তা একটা বিশেষ রূপলাভ করেছে। যদিও রচনার মান অন্য কবির তুলনায় অনেক উন্নত। গীতি কবির তরল ভাবোচ্ছ্বাস ও স্বপ্নময় পক্ষবিস্তার এবং তার কাব্যময় প্রকাশ যে কোন কবির পক্ষেই এক সাধনা-সাপেক্ষ বিষয়। বিহারী-লালের প্রারম্ভিক কাব্য প্রচেষ্টা বস্তুজগতকেন্দ্রিক কৌতূহলেই পর্যবসিত হয়েছে।

বিহারীলালের প্রথম দুখানি কাব্যগ্রন্থের নাম 'বন্ধু বিয়োগ' ও 'প্রেম প্রবাহিনী'। বলা বাহুল্য দুখানি কাব্যগ্রন্থের ভিত্তিই স্মৃতিচারণ। কিন্তু সর্বত্রই একটি বর্ণনাত্মক রীতি অনুসৃত হওয়ায় স্মৃতিচারণের পরিবর্তে কবিতাগুলি কিছু ঘটনা ও ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের পুনঃস্থাপনে পরিণতি লাভ করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব সর্বত্র অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে লক্ষ্যণীয়:

"কেহ যদি কোনখানে পাইত আঘাত,
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত।
তৎক্ষণাৎ উঠিতাম প্রতিকার তরে,
পড়িতাম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা,
সব মিলে করিতাম তাহাকে লাঞ্ছনা।"

—"বন্ধু বিয়োগ"।

অথবা প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থে বিহারীলালের ভাব প্রকাশের স্পষ্ট অক্ষমতার বিষয়টিও আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

"কিছুতেই যখন তোমারে না পেলাম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলাম।"

বিহারীলালের এই পংক্তি দুটির তুলনায় অজ্ঞাত গ্রাম্য কবির রচনা—"ধন পোড়ে তা সবাই দেখে মন পোড়ে তা কেউ ভাখে না"। এই লাইনটিতে অনেক বেশী উন্নতমানের কবিত্ব ও হৃদয়ের উষ্ণতার অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত আর দুটি লাইনের সাহায্যে সহজেই দেখান যায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থূল অমার্জিত রুচির প্রলেপ কেমন করে বিহারীলালের রচনায় অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। নামটি মুছে ফেললে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিকে ঈশ্বর গুপ্তের বলেই মনে হবে।

"এক বস্তু ভালো নাহি লাগে চিরদিন।
নবরসে নোলা তাই ঝোঁকে দিন দিন॥"

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে এ সত্য স্পষ্ট যে, বস্তুও তার সাধারণ সীমারেখা অতিক্রম করে একটা নির্বিশেষ ভাবময় অস্তিত্বে রূপান্তরিত হতে পারে নি। বস্তু, ভাব, কল্পনা, অনুভূতি, স্বপনচারিতা, মনোময়তা, বর্জন ও নবসৃষ্টির যে রহস্যময় লীলাখেলায় কবিতার সৃষ্টি সেখানে কবি যে উপস্থিত হতে পারেননি তা এইসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই এগুলি ঠিক কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি।

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ সত্যটিকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

"কল্পনার বস্তুকে প্রত্যক্ষে, অপ্রত্যক্ষে, তথ্যে, সত্যে, রূপে অরূপের মিলনেই গড়া হয় বাঙ্ময় কাব্যপ্রতিমা। বিহারীলালের সে ক্ষমতা ছিল না। এই কাব্যে (বন্ধু বিয়োগ) তিনি এমন তুচ্ছ ঘটনারও অবতারণা করিয়াছেন যাহা কাব্যের বিষয়-বস্তুরূপে গৃহীত হইতে পারে না।"

বিহারীলালের তৃতীয় ও চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'নিসর্গ সন্দর্শন' ও 'বঙ্গ সুন্দরীর' বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে এ মন্তব্য এতখানি প্রযোজ্য না হলেও আংশিকভাবে প্রযোজ্য। কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির রচনা বৈশিষ্ট্যকে একটা নির্দিষ্ট মানের বলে গণ্য করলে মধ্যবর্তী এই দুটি কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতি কিছুটা উন্নত মানের বলে স্বীকার করতে হয়। তাঁর মানস-চিন্তার পরিধি আরও বিস্তৃতিলাভ করেছে এবং গীতিকবির স্বভাবসিদ্ধ রোমান্টিকতা তাঁর মনকে বেশ লক্ষ্যণীয়ভাবে সংক্রামিত করেছে। সাধারণ মানব-সুলভ ঔৎসুক্যের সঙ্গে মিশেছে তাঁর হৃদয়ের এক অনির্দেশ্য বেদনাজাত হাহাকার। কোথাও বা এক বিস্ময়কর গতিশীলতা আরোপিত হয়েছে বস্তু-অস্তিত্বের মধ্যে এবং এই গতিময়তা যেন কবি মনেরই এক লীলাচাঞ্চল্য।

"হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী
নাচন্ত ঘোড়ায় চড়ে যেন ছুটে যায়।"

— নিসর্গ সন্দর্শন।

কবি এখানে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী ভাবনাপ্রবণ এবং প্রকাশসৌন্দর্যও তার অধিকতর সাধনাজাত নিপুণতার ফল। 'বঙ্গ সুন্দরী' কাব্যে আমরা সর্বপ্রথম 'সারদা মঙ্গলের কবির স্ব-ধর্মটি আবিষ্কার করি। সেজন্য বিবর্তনের ইতিহাসে এই কাব্যের একটি বিশেষ মূল্য আছে। যে রোমান্টিকতা, সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও হৃদয় ব্যাকুলতার শিল্প গুণান্বিত প্রকাশের জন্য আমরা বিহারীলালকে স্মরণীয় কবি ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য

প্রেরণার উৎস স্থল বলে গণ্য করি তার সম্যক নিদর্শন ক্ষেত্র হচ্ছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ 'সারদা মঙ্গল'। 'সাধের আসন' এরই অনুষঙ্গমাত্র, পৃথক কাব্যগ্রন্থ নয়।

যে একখানি মাত্র কাব্য সৃষ্টি করে বিহারীলাল অক্ষয় কবি খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই কাব্যটির নাম 'সারদা মঙ্গল'। এই কাব্যগ্রন্থে কবি প্রতিভা এক চরম উৎকর্ষ লাভ ক'রে বাংলা গীতি কবিতার ইতিহাসে তাঁর নামটি চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অধ্যাত্ম সাধনাধারার মিষ্টি সুরটি যেমন এর মধ্যে আমরা শুনতে পাই, তেমনি প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত স্বার্থকতার জীবনদর্শনের কাব্যিক প্রকাশ হিসাবেও আমরা কাব্যখানিকে দেখতে পারি এবং সর্বোপরি কবি শিল্পীর শাশ্বত ও রহস্যময় সৌন্দর্য সাধনার অনবদ্য নিদর্শন রূপেও আমরা কাব্যখানির ক্ষুদ্র লাবণ্যময় ও পেলব দেহখানিকে হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করে ধন্য হতে পারি। কবিমন এখানে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত, রূপদক্ষতাও এখানে এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যে কবি সহজেই রূপ থেকে রূপাতীতের সন্ধানে ব্রতী হতে সক্ষম হয়েছেন। কবি এই কাব্যে সূক্ষ্ম ভাবময় সৌন্দর্য্যসত্তার এমন এক আলোছায়া ঘেরা রহস্যময় মায়ালোক সৃজন করতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে আমরা সাধারণ পাঠকেরা তার উপযুক্ত আধিকারী না হয়েও সহজেই নিজেদের হারিয়ে ফেলি। ভাবতন্ময়তা এমন একটা সূক্ষ্মতা লাভ করেছে—যা 'চিত্রা' ও 'উর্বশী' কবিতার সৌন্দর্য্যসাধক রবীন্দ্র-নাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ না থাকায় তাঁর রচনা থেকেই উদ্ধৃতি সহযোগে সমাপ্তির রেখা টানা যাক।

(১) উষার আবির্ভাব উপলক্ষে—

"চরণ-কমলে লেখা
আধ আধ রবি রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।"

(২) বিশ্বের মূলীভূত সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদার সঙ্গে বিরহ-মিলনের পরবর্ত্তি স্তরের বিভ্রান্ত-আর্তি :

"ফের একি আলো এল, কই কই কোথা গেল,
কেন এল দেখা দিল,/লুকাল আবার,
কে আমারে অবিরত/ক্ষেপায় ক্ষেপার মত,
জীবন কুসুমলতা কোথা রে আমার।"

## ॥ মহাকাব্যরচয়িতা রূপে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র : তুলনামূলক আলোচনা ॥

ইতিহাসে উনবিংশ শতক রেনেশাঁস বা নবজাগরনের কাল হিসাবে চিহ্নিত। জাতীয় জীবনে সার্বিক সমৃদ্ধি এই কালের পটভূমিতেই সাধিত হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুষ্টিসাধন বিশিষ্ট যুগধর্মকে অবলম্বন করেই সম্ভব হয়েছিল। যে ভাব-ঐশ্বর্য্য ছিল এর মূলে—তা প্রধানতঃ তৎকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকূল সমন্বয়ের ফল। মহাজাগরণের এই ঐতিহাসিক মহালগ্নে আমাদের স্বদেশভূমিতে একাধিক যুগন্ধরের আবির্ভাব ঘটেছিল—যাঁরা শুধু যুগস্রষ্টাই ছিলেন না, পরন্তু তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে তাঁদের সৃষ্টিকে একাধারে যুগবাণীবাহক ও যুগভাবধারা অতিক্রমকারী শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। অন্যবিধ সৃষ্টি-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতকের বাংলা দেশকে আমরা সর্বাধিক সাহিত্যিক সমুন্নতির কাল বলে জানি। নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টির মধ্যে যারা আন্তরিক ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রধান স্থানীয় বলেই বিশেষভাবে আলোচ্য। এই তিন মহাকবিই মহাকাব্যের আধারে যুগের ভাব-বাণীটিকে আত্মারূপে প্রতিষ্ঠাদিতে তৎপর হয়েছিলেন। প্রতিভা ও শক্তিমত্তার পারস্পরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও এবং মাইকেল মধুসূদন সমগ্র কবিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানতম হলেও অপর দুই কবির প্রচেষ্টাগত গুরুত্বের মূল্য হেতু তুলনামূলক সাহিত্য বিচার অপরিহার্য।

এই তিন মহাকবি যে যুগে ও যে পটভূমিতে তাঁদের সাহিত্য-সাধনার ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন তার বৈশিষ্ট্য বিচারের পূর্বেই যুগ-আত্মার মর্মবাণীটির স্বরূপ সন্ধান প্রয়োজন। কারণ, জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির আধারেই নব জীবন চেতনার সত্যকে স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন আলোচ্য কবিবৃন্দ। কবিচেতনার প্রবুদ্ধকারী সেই নবজাগৃতির বৈচিত্রময় মর্মসত্যের আলোচনা তাই সংক্ষেপে এখানে পরিবেশিত হল। নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফল সম্ভবতঃ মানবতাবাদ। ভারতের দীর্ঘকালীন ধর্মভিত্তিক সাহিত্যকেও যেন এই প্রথম সম্পূর্ণ এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা হল। বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা ও সার্থকতাও এরই মানদণ্ডে বিচার করার এক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেল। বহু কালাশ্রিত ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ জীবনে লভ্য দৈব মহিমার অকুণ্ঠ স্বীকৃতির উজ্জ্বলতা এই যুগেই নব্য পন্থীদের চোখে অনেকাংশে নিষ্প্রভ হয়ে এল। এই নবীন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের জীবনদর্শন। মানবজীবন তার আপাত তুচ্ছতা সত্বেও যেন এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল, যাকে অবলম্বন করে হৃদয়মধ্যে আবির্ভাব ঘটল এক কোমল ভালবাসা। চোখের নতুন আলো দিয়ে সবার উপরে সত্য মানুষের সুখ, দুঃখ ভালবাসা—আকীর্ণ জীবনকে এক সুন্দরতর ভাবময় রূপদানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হল। পুরাতন সমাজ

নির্ভর সংস্কার অতিক্রম করে এক নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হ'ল ব্যক্তিজীবন। কিন্তু, তাহলেও গোষ্ঠীজীবনের মূল্য হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে তার স্বল্প রূপান্তর সাধিত হ'ল। আচরণীয় ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও ক্লিষ্টতা থেকে মুক্তিলাভ করে তা এক নতুন মানবিক তাৎপর্যের গৌরবে ধন্য হল। চিরাচরিত জীবনে যেখানে বিশ্বাসই ছিল প্রধান, সেখান থেকে তা নির্বাসিত হল এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করা হ'ল উনবিংশ শতকীয় যুক্তিবাদে। সর্বোপরি বহু যুগব্যাপী সুপ্ত গোপন স্বাধীনতা কামনা হৃদয়ের অন্তরতম আবাস ত্যাগ করে উজ্জ্বল স্বর্ণাভ সূর্যের মত বাংলা কাব্য সাহিত্যের গীতি কবিতা ও মহাকাব্যের আকাশে উদিত হল। একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে মিলন লাভের ঐকান্তিক আকুতিও আত্মপ্রকাশ করল স্বাধীনতা-চেতনার পরিপূরক সত্য রূপে। কেননা, স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্য বস্তুতঃ আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপায়ন। এই বাসনাকে রূপ দিতেই সাহিত্য জগতে একে একে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। শেষোক্ত তিন কবি মহাকাব্যকে মাধ্যম করে তাঁদের যুগলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে হয়ে উঠলেন তৎপর।

**মধুসূদন**ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে এই যুগের সর্বাধিক শক্তি-সম্পন্ন কবি হলেন মাইকেল মধুসূদন। সমকালে আবির্ভূত অপর দুই কবিও মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁদের সাহিত্যিক সাফল্য অবশ্যই পরিমিত। অপর পক্ষে মধুসূদন যুগের বাণীবাহক হয়েও এক কালোত্তীর্ণ মহিমায় ভাস্বর। একথা সত্য যে, নবযুগের অভিনব মানববাদী সংস্কৃতির দ্বারা সকলেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু, আধারের তারতম্য হেতু উক্ত তিন কবির ধারণ, লালন ও প্রকাশ শক্তি সমান ছিল না। নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মধুসূদন রচনা করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য', হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' এবং সবশেষে নবীনচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁর সুবৃহৎ কাব্যত্রয়ী 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক' ও 'প্রভাস' এর মধ্য দিয়ে। ভারতীয় মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীই এঁদের প্রধান রচনা-উৎস। সেই সঙ্গে প্রধানত মধুসূদনের অবলম্বন হ'ল বিশ্বখ্যাত পাশ্চাত্য-মহাকবির রচনা-সমূহ। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত চরম ও আকাঙ্ক্ষিত সফলতা এল একমাত্র মধুসূদনের ক্ষেত্রে।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এই তুলনামূলক সফলতা বা বিফলতার মূল যুগধর্মের মধ্যে নিহিত ছিল না। পক্ষান্তরে প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে কবিদের কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যে। প্রেরণার যাথার্থ্য, ভাবের গভীরতা, কল্পনার অনন্যতা, রূপদক্ষতা, শিক্ষাগত ভিত্তিভূমি এবং সর্বোপরি রূপায়ন কুশলতা বা কবি-কৌশল প্রভৃতির তারতম্যই একজনের সৃষ্টি থেকে অপরের সৃষ্টিকে পৃথক করে তুলেছে। প্রেরণার বিশুদ্ধি সত্ত্বেও রূপায়ন-দক্ষতার অভাব হেতু কিরূপ বিপর্যয় ও

বিফলতার সম্মুখীন হতে হয়—তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই যুগেরই অন্যতম কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

মধুসূদনের ব্যক্তি তথা সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে ধীরে তাঁর কবি-মানসকে গঠন করেছিল এবং কিভাবেই তা এই মহাকাব্যের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার এক অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। মধুসূদনের প্রথম জীবনের প্রভূত পার্থিব সমৃদ্ধি, সাহিত্য-প্রীতি সৃষ্টিতে জননী জাহ্নবীর অবদান, অত্যুজ্জ্বল শিক্ষা-জীবন, অসাধারণ বৌদ্ধিক তীক্ষ্ণতা, জীবনে প্রতিষ্ঠালাভে অপরিমেয় উচ্চাশা, বৈচিত্রময় বিত্তানুরাগ সুগভীর সাহিত্যপ্রেম, বহুভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অর্থ, প্রেম ও সাহিত্য—এই তিন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদালাভের বাসনা, সর্বোপরি এক বিশিষ্ট জীবনবোধ মাইকেল-ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছিল। মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের সাংগঠনিক রূপ এইসব সাযুজ্যসম্পন্ন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের যথার্থ সংশ্লেষণের ফল। শিল্পীয় আত্মভাব যে আত্মভাবনা তথা শিল্পী-ভাবনাকে বিশেষ ভাবে গঠন করে তা বোধ করি সর্বজনস্বীকৃত সত্য। তাই মধু-জীবনের সাহিত্যিক সার্থকতা বা ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে তাঁর ব্যক্তি-সত্তা ও কবি মানসের গভীরে।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের এক সুমহান সৃষ্টি তার অন্যতম প্রধান কারণ হল—ভাবের দিক থেকে এর উৎস হ'ল যুগ-মানস তথা ব্যক্তি ও কবি-মানস এবং রূপায়নের দিক থেকে এটি এক শ্রেষ্ঠ-স্থানীয় রূপকারের সৃষ্টি। ভাব ও বাহ্যিক উপাদানের দুর্লভ মিলন সাধনই অত্যুত্তম সাহিত্যসৃজনের মৌল সত্য। কল্পনার এমন বিশালতা, ভাবের এত গভীরতা, যুগপৎ ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন সত্যের এমন অন্তরঙ্গ নির্দ্বিধ প্রকাশ, এমন অনন্য ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য, এক সার্বিক মহত্ব ও সমুন্নতি, জীবনের মহতী বিনষ্টি জনিত এই আর্ত্তি, হৃদয়ের উষ্ণতা ও আর্দ্রতায় অভিষিক্ত হয়ে আর কোথায় সগৌরবে প্রকাশিত? আর কোথায় স্বয়ং কবিকে এমন করে মহাকাব্যের নায়কের মধ্যে প্রতিভাত দেখি? মহাকবির উদ্দীপিত কবি-কল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন হ'ল স্ব-সৃষ্ট শক্তি সমন্বিত সেই ইতিহাস চিহ্নিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের—যার সমুদ্রকল্লোলের মধ্যে সংস্থাপিত হল এই মহাকাব্যের মহাভাব। যে কবি কাব্যের প্রয়োজনে ছন্দ নির্মাণ করেন তাঁর রূপ নির্মিতির দক্ষতার গভীরতা ও তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়। গগন ব্যতীত সূর্য্যকে ধারণ করবে কে? সমগ্র কাব্যটিই তাই যেন কল্লোলিনী সমুদ্র—যার মন্দ্র কখনও নিঃশেষিত হয় না।

মহাকাব্যটির রচনা-পূর্বকালের তথ্যাদি কবির নিজের চিঠিপত্রের মধ্যেই পরি-বেশিত। মেঘনাদের ভাবমূর্ত্তি কর্তৃক কবির কবি-কল্পনার উদ্দীপন, কালিদাস, হোমার; ট্যাসো, প্রভৃতি দেশী-বিদেশী কবির কাছে ঋণ স্বীকার 'সাহিত্য দর্পণ'-কারের

মতবাদ গ্রহণে অসম্মতি প্রভৃতি তথ্য-সত্য সর্বজন বিদিত। প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীর নব মানববাদী রূপান্তর প্রধানতঃ ঐতিহাসিক যুগপ্রভাবের ফলশ্রুতি। এই মহাকাব্যে রূপায়িত নিষ্ঠুর, অমোঘ নিয়তির প্রতিষ্ঠায় গ্রীক-প্রভাব এবং সর্বোপরি কবির বাস্তব জীবন ইতিবৃত্তের প্রভাব স্বীকৃত। প্রমীলার চরিত্র সৃজনে কবি নব জীবনের ভাবধারা ও ভারত-ইতিহাসের সত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বিষয়টি কাব্যের ভাব-ধর্মের প্রয়োজনেও সৃষ্ট বটে। সব মিলিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে আমরা মহাকবির মহৎ সৃষ্টি রূপেই দেখতে অভ্যস্থ। এই প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত সমালোচকের রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

> "সেই গভীরতম আন্তর-বৈশিষ্ট্যেই মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব, তাহা হইল মহাকাব্যের গৌরব সমুন্নতি। মেঘনাদ বধ কাব্যের গৌরব সমুন্নতি তাহার ভাষায়, উপমায়, ছন্দে, চরিত্রে—ঘটনায়—পটভূমিকায়, ভাবে, রসে, অনুভূতিতে। এই কাব্যে মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টিতে, তীব্র আবেগ-অনুভূতি উদ্বোধনে, উদার চরিত্র কল্পনায়, ঘটনায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে, দৃঢ় পিনদ্ধকায় গঠন নৈপুণ্যে, কল্পনার ব্যাপকতায় ও গভীরতায় আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণে ও স্বতস্ফূর্ত মানবিক রস উৎসারণে। এই কাব্যের মর্মগত মহিমাটুকু যাঁহারা ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই কাব্যের মহাকাব্যোচিত বাহ্য বৈশিষ্ট্য বিচার অনাবশ্যক।"
>
> —ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

**হেমচন্দ্র ঃ** মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ এবং প্রথম দিকে এই কাব্য দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ভূমিকা রচনা করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সমালোচনামূলক এই ভূমিকায় হেমচন্দ্র কাব্যটির মিশ্ররীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমসাময়িক কালে কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই কাব্যের একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন। তাতে তিক্ততার স্বাদই ছিল বেশী। পরবর্তীকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে নিজের সমালোচনার সমালোচনা লিখে আত্মদোষ থেকে মুক্ত হতে হয়েছিল। মাইকেলের মহাকাব্য তাৎক্ষণিক সমাদর লাভে বঞ্চিত হলেও উত্তর কালের সকল প্রথম শ্রেণীর সমালোচক কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান স্থানীয় হলেন মোহিতলাল মজুমদার।

মধুসূদন প্রভাবিত হয়েই হেমচন্দ্র তাঁর সুবৃহৎ মহাকাব্য 'বৃত্রসংহার' রচনা করেন। কাব্যটি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্রের এই দীর্ঘ ২৪টি সর্গ সমন্বিত মহাকাব্যটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সমালোচক ও পাঠকবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসাবাণী লাভে ধন্য হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী কালের সমালোচকেরা পূর্ববর্তী মত সমর্থন করেন নি। তার কারণগুলি এখানে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(১) 'বৃত্রসংহার' কাব্য আকারে সুবৃহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই কাব্য

প্রকৃতিতে ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত নয়। প্রকৃত ক্লাসিক মহাকবির ভাব কল্পনার দার্ঢ্য ও গভীরতা হেমচন্দ্রের ছিল না। এই কাব্য মনে মেঘনাদবধের অনুরূপ রস নিষ্পত্তি ঘটায় না। তাই কবির সমগ্র প্রচেষ্টা যেন কাব্যের বহিরঙ্গ বিন্যাসে ও অলংকরণে ব্যয়িত হয়েছে। মধুসূদনের যে অন্তর্গূঢ় ব্যক্তি-ভাবনা ও কবি মানস সকল কাব্যিক প্রয়াসের আবরণ ভেদ করে তাঁর কাব্যের ভাব-আত্মাকে গঠন করেছে – 'বৃত্রসংহারে' অনুরূপ কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। হেমচন্দ্রের কাব্যের ভাববস্তু নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু কবি তাকে তাঁর কবি-আত্মার অন্তরাশ্রয়ী মর্মবাণীতে পরিণতি দান করতে সক্ষম হননি। তাই আয়তন ও পরিকল্পনায় বিশাল হওয়া সত্ত্বেও এবং মহৎ আত্মত্যাগের সত্য মূল অবলম্বন হলেও কবির হৃদয়ের স্পর্শের অভাবে কাব্যটি শেষ পর্যন্ত বহিরঙ্গ চর্চার স্তরে থেকে গিয়েছে।

(২) হেমচন্দ্র তাঁর মহাকাব্যে চরিত্র পরিকল্পনা ও চিত্রণে আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। আধুনিক সমালোচকের মতে রাবণের তুলনায় বৃত্রাসুর নিতান্তই নিষ্প্রভ। আকাঙ্ক্ষিত বীর্যবত্তায় কোন ভাব বৃত্রাসুর বা ঐন্দ্রিলার মধ্যে পরিস্ফুট হতে পারেনি। অপরপক্ষে প্রমীলার মত বীরাঙ্গনা নিতান্তই দুর্লভ এবং এই চরিত্র কাব্যের মূল উদ্দেশ্য সাধনে যেভাবে অংশ গ্রহন করেছে সেরূপ পরিকল্পনাগত সামগ্রিকতা বৃত্রসংহারে অনুপস্থিত। দধীচির আত্মত্যাগ ঘটনা হিসাবে মহৎ হলেও রূপায়নের দিক থেকে অনেক নিষ্প্রাণ এবং ব্যক্তি হিসাবে তিনি ঋষি বলেই তাঁর আত্মত্যাগের আবেদন আমাদের কাছে অনেক পরিমাণে নিষ্ফল। অপরপক্ষে মেঘনাদের আত্মত্যাগের মহিমা এবং তার পরিণাম সমগ্র কাব্যটির মধ্যে এক সুদুর্লভ বিষাদময়তার সৃষ্টি করেছে।

(৩) হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে শব্দের বিন্যাস ও তজ্জনিত বর্ণচ্ছটা নিতান্ত সামান্য নয় এবং অনেক স্থানেই বর্ণনার মধ্যে, বিশেষতঃ একাধিক সর্গ (চারটি সর্গ) ব্যাপী যুদ্ধ বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এই সকল অংশ একদা সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসালাভ করেছিল। তথাপি, এ সত্য প্রকাশে বাধা নেই যে, মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের রচনাবৈশিষ্ট্যের অনুরূপ হেমচন্দ্রের শব্দ সন্নিবেশ বেশ আভিধানিক, কৃত্রিম, প্রাণহীন ও ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। রচনা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবির প্রাণের যোগের নিবিড়তার অভাবই এর কারণ বলে ধরা যেতে পারে। অপরপক্ষে মধুসূদন প্রভূত সংখ্যক আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করলেও শেষ পর্যন্ত ভাষা বিন্যাসকে হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ভাষা যতক্ষণ না হৃদয়-ভাবের বাহন হচ্ছে—বিশেষতঃ কাব্যের ক্ষেত্রে—ততক্ষণ পর্যন্ত তা রসসঞ্চার করবে কি ভাবে?

**নবীনচন্দ্র সেন :** উনবিংশ শতকীয় বাংলা কাব্য-ইতিহাসের মহাকবি পর্যায়ের শেষ উল্লেখ্য কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র ত্রয়ী মহাকাব্যের কবি

হিসাবে খ্যাত, এই কাব্যত্রয় হ'ল 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক' ও 'প্রভাস'। এ ছাড়া তিনি অপর বহুবিধ ও বহু সংখ্যক কাব্যের রচয়িতা। কবির আত্মজীবনী অনুসারে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজগিরিতে অবস্থান কালে মহাভারত পাঠের ফলে এবং পরিবেশ প্রভাবে কবি ভক্তি-অবনত চিত্তে মহাভারতীয় বিষয় অবলম্বনে বিশাল ভারতের ঐতিহ্যবাহী ভাব সম্পদ উক্ত মহাকাব্যে পরিণতিদানে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর এই পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক জ্ঞাত ও উৎসাহিত হয়েছিল। কাব্য তিনখানি ১৮৮৬ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মহাকাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। কবি মহাভারত পাঠে তার মধ্যে যে নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছিলেন, তাই এই মহাকাব্যে রূপায়নের চেষ্টা করেছেন। কবির চোখে শ্রীকৃষ্ণ মহানায়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত এবং তাঁর আদর্শ ছিল ধর্মসংস্কার ও নবধর্ম সংস্থাপন। শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল গঠনাত্মক। এক বিশাল সংহত আদর্শ-ভারত গঠনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ধর্মাদর্শের দিক থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবকে সমীকৃত ক'রছিলেন যার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল 'অমিতাভ' কাব্য।

মহাভারতের যে নূতন ব্যাখ্যা কবি করেছিলেন, সেজন্য তাঁর চিন্তার মৌলিকতায় গৌরব অবশ্যই প্রাপ্য। তাঁর পরিকল্পনার বিশালতাও অবশ্যই স্বীকার্য। এপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের কাব্যের বিরাটত্ব পরিকল্পনায় ও রূপায়নে অবশ্যই স্মরণযোগ্য। এই তিন মহাকবিই (মধুসূদন সহ) আখ্যায়িকাকে তাঁদের কাব্যের প্রধান অবলম্বন করলেও দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপায়নে অনেক পার্থক্য আছে। মধুসূদন প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের সামান্য ঘটনাংশ মাত্র গ্রহণ করেছেন। তাই কাহিনী সেখানে গৌণ এবং অতিমাত্রিক ভাব-সংহতির ফলে মধুসূদনের কাব্য সবিশেষ দার্ঢ্য সমন্বিত। হেমচন্দ্রের প্লট গঠনকেও যথেষ্ট শিথিল বলা যায় না। কিন্তু, এই দুই কবির সঙ্গে তুলনায় নবীন চন্দ্রের আখ্যায়িকা তথা কাহিনী পরিকল্পনা যথার্থই বিশাল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং প্লট শিথিলবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে পূর্বেই সতর্ক করে লিখেছিলেন—"If executed adequately many will properly consider it as the Mahabharat of Nineteenth century … I warn you, however, not to be too confident of success of popularity" বঙ্কিমচন্দ্র বিচারশীলতার দ্বারা যে রূপায়ন দুরূহতার কথা চিন্তা করেছিলেন, নবীনচন্দ্র উৎসাহ, ভক্তি ও ভাবাতিশয্যে সে সতর্কবাণী গ্রাহ্য করেন নি অথবা আত্ম-অহঙ্কারকে আত্মবিশ্বাস বলে ভুল করেছিলেন। সে মনোভাব যে তাঁর ছিল, তা তাঁর বৃহদায়তন 'আমার জীবন' পড়লেই বোঝা যায়।

কবির কাব্যের বিষয়বস্তু যেরূপ মহৎ, তাঁর রচনারীতি তার অনুরূপ-একথা বলা যায় না। অর্থাৎ প্রকাশের স্থূলতা তাঁর কাব্যের মহিমাকে অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুন্ন করেছে। ক্লাসিক কবির এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে প্রভূত পরিমাণে সংযমী

হতে হয়—যেমন মধুসূদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। নবীনচন্দ্রের এই গুণের অভাব ছিল। তাছাড়া তিনখানি কাব্য একই মহাকাব্যের অংশ হলেও দীর্ঘকালের ব্যবধানে এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ( দশ বৎসর )। সংহতি নষ্ট হওয়ার এটিও এক বড় কারণ।

নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য আকাঙ্খিত প্রসারতা লাভ করে নি। মধুসূদনের কাব্যে ঘটনায় তাৎপর্যগত ভাবাত্মক সম্প্রসারণ এবং তার মানবজীবন সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি সমগ্র কাব্যটিকে এক অভিনব মানবিক তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে ইতিহাসের তত্ত্বকে গ্রহণ করায় কাব্যটি অধিকমাত্রায় তত্ত্বের আশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। এজাতীয় কোন তত্ত্বপ্রাধান্য 'মেঘনাদবধ' বা 'বৃত্রসংহারে' নেই।

মহাকাব্যে থাকবে সঙ্গীত-সুষমা উদাত্ততা ও গঠনপারিপাট্য এবং এর ভাষা হবে সুন্দর, অথচ গম্ভীর, অলংকৃত এবং বেগবতী। এদিক থেকে বিচার করলে উপরোক্ত গুণগুলি নবীনচন্দ্রে নেই। তাই মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে তিনি ব্যর্থ। নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র যুগের প্রভাবে মহাকাব্য রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিন্তু সে ক্ষমতা তাদের ছিল না। এ ব্যাপারে একমাত্র মধুসূদনই সার্থক। অতএব, মধুসূদন প্রশস্তি দিয়েই আলোচনার সমাপ্তিতে আসা যাক—"মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিসহস্রাধিক শ্লোকের মধ্য হইতেই মহাকাব্যর সেই উদাত্ত গম্ভীব সুব ধ্বনিত হইয়াছে যে স্থর মেঘের গর্জনের ন্যায়, সমুদ্রের কল্লোলের ন্যায়, প্রলয়কালের ঝটিকার ন্যায়।"

## ।। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ।।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা হয়। যোগেন্দ্র গুপ্ত এবং তারাচরণ শিকদার একই বছরে তাঁদের নাটক প্রকাশ করেন। যোগেন্দ্র গুপ্ত রচনা করেন 'কীর্ত্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের রচিত নাটকটির নাম 'ভদ্রার্জুন'। বাংলা নাটকেব ইতিহাসে 'কীর্ত্তিবিলাস' এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় এই কারণে যে, এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ট্রাজেডী। মাইকেল মধুসূদনের কাল পর্যন্ত (১৮৫৯) আমাদের প্রধানতঃ সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের উপর নির্ভর করতে হ'ত। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি রচিত ও প্রকাশিত হয় এবং ইতিহাসের তথ্য অনুসারে বাংলা জাতীয় নাটকের অভাবই মধুসূদনের নাট্যরচনার মৌলিক প্রেরণা। অপর দিকে যোগেন্দ্র গুপ্ত বাংলা নাট্য সাহিত্যে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য আঙ্গিক সচেতন নাট্যকার। তিনি সজ্ঞানে সেক্সপীয়রের রচনাদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন। এ্যারিষ্টটলের অলংকার তত্ত্ব

সম্বন্ধেও তিনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এই প্রারম্ভিক নাট্য প্রচেষ্টার মধ্যে বিদেশী আঙ্গিকের অনুকরণ প্রচেষ্টা থাকলেও, জাতীয় নাট্যজীবনকে সমৃদ্ধ করার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা এর পশ্চাতে কার্যাকরী ছিল। তাই যোগেন্দ্র গুপ্ত ও তারাচরণের এই নিষ্ঠা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

নানা কারণে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণকে' উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাটক বলতে হয়। এই নাটকাটির একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। দীনবন্ধু মিত্র সরকারী কর্ম উপলক্ষে সারা বাংলা দেশ পবিভ্রমণ করেছিলন। তাই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ অনুসারে এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছিল তাঁরা সুগভীর সহানুভূতি। এই দুটিকেই প্রধান উপাদান করে তিনি নাট্যরচনার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। নাটকেব মধ্যে দিয়ে তিনি সমকালীন জাতীয় রাজনৈতিক ভাবনাকে এক বিশেষ শিল্পসম্মত উপাযে প্রকাশ করেছিলেন। মধুসূদনেব মধ্যে ক্ল্যাসিক চেতনায় প্রাবল্য থাকায তিনি যেসব নাটক বচনা করেন, সেগুলিব মধ্যে একমাত্র প্রহসন ব্যতীত আব সব ন্যটকেব বিষয়বস্তু ছিল ঐতিহাসিক ও পৌবাণিক। আর একমাত্র নাটুকে বাম নাবায়ণ তাঁব 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে সমাজের দীর্ঘ কালের ক্ষোভকে ভাষা দিয়েছিলেন। অবশ্য মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকা ঘাড়ে বোঁ' ব্যাঙ্গাত্মক সমাজ-সমস্যামূলক নাটক। এবং প্রকারান্তরে মাইকেল এ৫ সব সামাজিক কুপ্রথাব নিবসনই কামনা করেছিলেন।

ইতিহাসেব দৃষ্টিতে, 'ষ্টৌ' বচিত 'আঙ্কল টমস কেবিন, উপন্যাসটির আমেবিকার সমাজ-পরিবর্তনে যে গুরুত্ব, আমাদের গত শতকের সমাজ জীবনেও দীনবন্ধুব নীল দর্পণেব সেই গুরুত্ব। এই নাটকে শিল্প বিষয়ক ত্রুটি যতই থাক না কেন এক বিরাট জাতীয় কর্তব্য পালনে নাট্যকার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিলেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেশের রাজনৈতিক ও সাহিত্যেব ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সারা সারা বাংলা দেশে নীলচাষীদের ধর্মঘট হয় এবং ১৮৬০ এ বসে 'নীল কমিশন'। নীলদর্পণ নাটকটি সমগ্র দেশব্যাপী এই আন্দোলনে সর্বাধিক ইন্ধন যুগিয়েছিল। রাজরোষে পতিত হওয়ার স্বাভাবিকতার কথা মনে রেখেই নাট্যকার হিসাবে নিজের নামটি গোপন রেখেছিলেন "কেন চিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্" লেখকের এই ছদ্মনামে নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। মাইকেল মধুসূদন নাটকটির অনুবাদ করেছিলেন বেনামে। প্রকাশক হিসাবে পাদ্রী লঙ্ সাহেবের নাম মুদ্রিত হওয়ায় তিনি আদালতে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হয়ে ছিলেন।

নীলদর্পণ নাটকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হলেন যথাক্রমে নায়ক নবীনমাধব এবং নীলকর সাহেব উড ও রোগ। ধানচাষের জমিতে বলপ্রয়োগে নীল চাষ কবতে নিবীহ চাষাকে বাধ্য কবা এবং অস্বীকৃতির স্থলে অমানুষিক অত্যাচারে চাষাকে

উৎখাত করাই ছিল নীলকর সাহেবদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে এই অত্যাচারের সীমা প্রধান চাষীর আশ্রিত ও সহকারী চাষার জীবনকেও স্পর্শ করেছে এবং তোরুপ, সাধুচরণ ও ক্ষেত্রমণিকেও পর্যুদস্ত করেছে। নাটকটির নায়ক তৎকালীন বাংলাদেশের সম্পন্ন কৃষিসমাজের প্রতিনিধি স্থানীয়। আদর্শ স্থানীয় দৃঢ়তাসহকারে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে গিয়ে এই সৎ ও সুখী পরিবারটিকে শোচনীয়ভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। নাট্যকারের অসীম কৃতিত্ব এই যে, প্রথমাবধি এক প্রবল উদ্দেশ্যমূলকভাবে আন্তরিকতাসহকারে অনুসরণ করেও তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সর্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁর শিল্পসত্তাকে উজ্জীবিত করেছে এবং নাটকটির মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত কারুণ্য-সিক্ত ঘটনার উপস্থাপনার সাহায্যে সমগ্র পাঠক ও দর্শক সমাজের চিত্তকে জাগ্রত করতে যত্নবান ও সক্ষম হয়েছিলেন। নাটকের চরিত্র, ঘটনা ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে বাস্তবানুগ হওয়ায় নির্মিতির সামান্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি নাটকটিকে যুগ আন্দোলনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাট্যকার হিসাবে তাই দীনবন্ধুর কৃতিত্ব অপরিসীম।

নাটকটির সাধারণ ত্রুটি হিসাবে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে অশ্লীলতা এবং অপরটি মৃত্যু ঘটনার আধিক্য। অভিযোগ দুটির সামান্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শ্রদ্ধেয় সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে দীনবন্ধুর সমালোচনা প্রসঙ্গে উভয় বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করেছেন এবং যুক্তি হিসাবে নাট্যকারের অতিমাত্রিক বাস্তবপ্রিয়তায় উপর জোর দিয়েছেন। "তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন" কেবল চরিত্র প্রণয়ণেই যে তিনি এই নীতি ও রীতির আশ্রয় নিতেন তা নয়—কাহিনী-কল্পনায় ও আঙ্গিক রচনায়ও দীনবন্ধু বাস্তবকে অনুসরণ করতেন।

সর্বোপরি এই নাট্য রচনায়—মানুষ হিসাবে তিনি যে গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন এবং এই বর্বরোচিত অত্যাচারের অবসানের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন—সেই আন্তরিক ভাবটুকু সবটাই তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রভাবিত করেছিল। নাটকের শেষাংশে যে, মৃত্যু দৃশ্যের প্রাচুর্য ও আতিশয্য আছে তার আভ্যন্তরীণ কারণ হিসাবে এই যুক্তিই গ্রাহ্য বলে মনে হয়। এই পদ্ধতি অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ভাবের অনুসরণ করায় নাটকটি পুরোপুরি শিল্পগুণান্বিত হয়ে সার্থক ট্রাজেডীতে পরিণতি লাভ না করতে পারলেও তাঁর উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সমসাময়িক জীবন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রূপে দীনবন্ধু নিজেকে খুব উজ্জ্বল করেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তোরাপের মত এমন গ্রামীণ ব্যক্তি; উড ও রোগ সাহেবের মত এমন যথার্থ অত্যাচারী, আদুরী, সরলা, ক্ষেত্রমণি ও সৈরিন্ধ্রীর মত

গ্রাম্য নারীর সার্থকতর চিত্র আমরা দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত আর কোথায় পাই। নাট্যকার নিজেকে কোন কারণে সঙ্কুচিত করলে তাঁর সৃষ্টি ও অবশ্যই ব্যাহত হ'ত।

দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটকের কাহিনী অনেকটা দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের যে অংশে নায়ক-নায়িকার রোমাণ্টিক প্রেমবর্ণিত হয়েছে সেই অংশগুলি প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে বরং পার্শ্ব চরিত্রগুলি পরিহাস ও অসঙ্গতিব মধ্য দিয়ে দর্শকের অধিকতর প্রীতভাজন হয়েছে। কোন কোন সমালোচকের মতে এই নাটকের দ্বিতীয় অংশটিই অধিকতর নাট্যগুণান্বিত। এই অংশটি অবলম্বনে নাট্যকাব এক অমার্জিত আদিরসাত্মক হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। রুচির দিক থেকে নিম্নমানের হলেও উপস্থাপনা রীতি যে বাস্তবের অনুসারী তা স্বীকার করতে হয়।

দীনবন্ধুব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় বিখ্যাত নাটক 'সধবার একাদশী'র প্রকাশ কাল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। আভ্যন্তবীন সত্যধর্মের দিক থেকে নাটকটি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সেকালেব উন্মার্গগামী এই নব্যবঙ্গ সমাজের অতি বাস্তবযুগচিত্র এই নাটকের মধ্যে যত্নের সঙ্গে উপস্থাপিত। দীনবন্ধুব সংস্কারপন্থী মন এখানে ক্রিয়াশীল থাকলেও চিত্রেব বাস্তবতা ও বক্তব্যেব স্পষ্টতায় নাটকটি সমুজ্জ্বল। অনেকের ধারণা, 'নিমচাঁদে'র চবিত্র মধুসূদনেব অনুকরণে সৃষ্ট। কিন্তু নাটকটি শেষ পর্যন্ত মাইকেলের প্রহসনের অনুরূপ শিল্পগুণান্বিত হতে পাবেনি।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' দীনবন্ধুর অপব একখানি প্রহসন। এটিরও প্রকাশ কাল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটকেরও বিষয়বস্তুব সঙ্গে মধুসূদনের আর একটি প্রহসনের ( বুড়ো শালিকের ঘাডে রোঁ ) সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। ডঃ সুকুমার সেন নাটকটিকে 'নাট্যচিত্র' বলেছেন। 'লীলাবতী' ( ১৮৬৫ ), জামাই বাবিক (১৮৭২) দীনবন্ধু রচিত অপর কয়েকখানি নাটক।

## ॥ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ॥

প্রধানতঃ উনবিংশ শতকের এবং আংশিকভাবে বিংশ শতকের বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি গিরিশচন্দ্র একটি স্মরণযোগ্য নাম। গিরিশচন্দ্র অতি উচ্চমানের নাটক বচনা না করলেও বাংলা সাহিত্যের এই অপুষ্ট শাখাকে তিনি সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর নাট্যমঞ্চকেন্দ্রিক প্রতিভাকে নাটক রচনার কাজে নিয়োজিত করে একটি ঐতিহাসিক জাতীয় কর্তব্য সাধন করেছিলেন। হরচন্দ্র ঘোষ ও তারাচরণ শিকদার উনবিংশ শতকেব মধ্যভাগে ( ১৮৫২ ) বাংলা নাটক রচনার যে সূত্রপাত করেছিলেন, সেই ক্ষীণধারাটি ক্রমে দীনবন্ধু, মধুসূদন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে পুষ্টিলাভ করে এবং অবশেষে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তোলে। গিরিশ প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে,

তিনি এই চলমান নাট্যধারাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জাতির নাট্যতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী এক সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। তাই নাট্যকার হিসাবে তাঁর স্থান খুব উচ্চে না হলেও নাট্য-প্রচেষ্টার ইতিহাস রচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী হিসাবে তাঁর নাম অবশ্যই স্মরণীয়।

ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর জীবনের স্পষ্টতঃ দুটি স্তরবিভাগ রয়েছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের করুণা-লাভের ঘটনা ও সময়কে তাঁর জীবনের নিয়ন্ত্রক মধ্যবিন্দু বলা যায়। বস্তুতঃ তার পূর্ববর্তী গিরিশচন্দ্রকে জীবনের অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরে স্খলন ও পতনের জীবন থেকে তিনি এক ভক্তিরসাপ্লুত বিশুদ্ধ জীবনস্তরে উন্নীত হন এবং তাঁর নাট্যকার জীবনে তার প্রভাবও গুরুতর। বালা নাট্যসাহিত্যে ভক্তি-রসাত্মক নাটকের যে বিশিষ্ট ধারাটি গড়ে উঠেছিল – তা প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রেরই অবদান। পরে অবশ্য এই শাখাটি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাঁর নাট্যসাহিত্যের ওপর তাঁর প্রথম জীবনের ছায়াপাত হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। প্রহসন, সামাজিক এবং পারিবারিক নাটকগুলি রচনার ক্ষেত্রে তাঁর জীবনার্জিত বহু অভিজ্ঞতা খুব সার্থকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের অভিনেতার জীবনকে মুখ্য বলে গণ্য করলে তাঁর নাট্যকারের জীবনকে গৌণ বলে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর জীবন-ইতিহাসের সত্যকে প্রামাণ্য হিসাবে ধরলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই তিনি অভিনেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। পরে অবশ্য নাটক রচনা ও স্বরচিত নাটকে অভিনয়ের ফলে এই খ্যাতি বহুগুণ বেড়ে যায়। অভিনয় ও নাট্যমঞ্চ তাঁর প্রাণস্বরূপ ছিল। থিয়েটার জগতে প্রবেশের পূর্বে যাত্রাদলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পরে অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দু মুস্তাফি, মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ দিকপাল অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। এবং এর ফলে বাঙ্গালীর নাট্যপ্রচেষ্টা ঐতিহাসিক স্থায়িত্বলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ অভিনয় জগতকে প্রাণস্পন্দিত রাখার জন্যই নাট্যরচনায় কাজে হাত দিয়েছিলেন। নাট্যজগতের চাহিদা ও গতি-প্রকৃতির ওপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেই তিনি নাটকের বিন্যাসরীতি স্থির করতেন। এক্ষেত্রে অভিনয় মঞ্চই হয়ে উঠে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণাভূমি।

গিরিশচন্দ্র বিপুল সংখ্যক নাট্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কয়েকখানি অসমাপ্ত নাটকসহ তিনি প্রায় ৭৯ খানি নাটকের রচয়িতা। এত বৈচিত্র্যসম্পন্ন এবং অধিক-সংখ্যক নাটক সে যুগে এক গিরিশচন্দ্র ব্যতীত অপর কোন নাট্যকার রচনা করেন নি। তাঁর নাটকগুলিকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) গীতিনাট্য (২) প্রহসন (৩) ধর্ম ও ভক্তিমূলক (৪) ঐতিহাসিক (৫) সামাজিক ও পারিবারিক নাটক। এই পাঁচশ্রেণীর নাটকেব মধ্যে ভক্তিমূলক ও সামাজিক নাটকগুলিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

এখানে গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি নাটকের নাম শ্রেণী অনুসারে উল্লেখ করা হল :—

(১) গীতিনাট্য—(ক) আগমনী (খ) অকালবোধন গ) দোললীলা (২) প্রহসন—(ক) বেল্লিক বাজার (খ) য্যায়সা কা ত্যায়সা ইত্যাদি (৩) ভক্তিমূলক (ক) বুদ্ধদেব চরিত (খ) চৈতন্য লীলা (গ) প্রভাস যজ্ঞ (ঘ) বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি

(৪) ঐতিহাসিক—(ক) রাণা প্রতাপ (খ) সিবাজদ্দৌলা (গ) মীর কাসিম (ঘ) ছত্রপতি শিবাজী ইত্যাদি। (৫) সামাজিক—(ক) প্রফুল্ল (খ) হারনিধি ইত্যাদি।

পূর্বেই বলা হযেছে, গিবিশচন্দ্র যাত্রাদলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তার প্রভাবও তাঁর নাট্যজীবনে নিতান্ত স্বল্প ছিল না। মানসপ্রকৃতিব দিক থেকে তাঁর মধ্যে ভাবপ্রবণতার প্রাবল্য ছিল। যাত্রার পালার মধ্যেও আমবা হৃদয়ভাবেব প্রাধান্যই লক্ষ্য করি। গিরিশের জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ ভাবপ্রাবল্যকে কেন্দ্র করেই। লক্ষ্য কবতে হবে যে, তাঁর প্রথম দিকের নাটকগুলি গীতিনাট্য। এইসব গীতিনাট্যে যাত্রায প্রভাবই ছিল সমধিক এবং তাঁব কৃতিত্ব এই যে তিনি যাত্রাব বিষয়কে কালের আকাঙ্খা অনুসারে থিয়েটারের উপজীব্য কবে তুলেছিলেন।

প্রহসনে তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকার মধুসূদন ও দীনবন্ধু যে কৃতিত্ব প্রদর্শন কবেছিলেন তা তাঁর আয়ত্তেব বাইবে ছিল। ফলে এক নিম্নমানের রুচি সেগুলোকে আবিল করে তুলেছিল। মধুসূদনেব মধ্যে যে শিল্পীজনোচিত সংযম ছিল তা গিবিশচন্দ্রেব কাছে ছিল দুর্লভ। এ বিষয়ে প্রধান অন্তরায় ছিল তাঁর ব্যক্তি-প্রকৃতি। ভাবেব আধিক্য তাঁর অনেক লোকখ্যাত নাটককে উপযুক্ত শিল্পগুণ থেকে বঞ্চিত করেছে। তাছাড়া প্রহসন রূপায়নের মূলে যে সূক্ষ্ম জীবনদৃষ্টি এবং গোপন সংস্কার কামনা থাকে তা গিবিশচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের উপাদান হয়ে উঠতে পারেনি। সেজন্য স্থূল জীবন-চরিত তাঁর অনেক নাটকের বিনষ্টির কারণ হয়ে উঠেছে।

গিরিশচন্দ্র অধিক সংখ্যায় পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। এগুলির আশ্রয় ভক্তিরস ও পৌরাণিক জীবনচেতনা। ঈশ্বর বিশ্বাসের গভীরতা, অলৌকিকত্ব, অবতারবাদ প্রভৃতি এইসব নাটকের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এজন্য তিনি এই জাতীয় কিছুসংখ্যক নাটক লিখেছেন যায় প্রধান অবলম্বন জগদ্বিখ্যাত ধর্মগুরুগণ। এভাবেই 'নিমাই সন্ন্যাস' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' 'বুদ্ধদেব চরিত' প্রভৃতি নাটক গড়ে উঠেছে। আবার 'শঙ্করাচার্য' 'অশোক' প্রভৃতি নাটকের মূল অবলম্বন এইসব ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেও এগুলি পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত। এইসব পৌরাণিক নাটককে কেন্দ্র করেই গিবিশচন্দ্র অপরিমিত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর অনেক পৌরাণিক

নাটকে নানাবিধ ত্রুটি থাকলেও, কিছুসংখ্যক নাটকে উন্নতমানের রচনাশৈলী, বিন্যাস কৌশল এবং নাতিদীর্ঘ সার্থক সংলাপ ব্যবহারের ফলে যাত্রার পালায় দুর্বলতা ও ক্লিষ্টতা থেকে . সেগুলো মুক্ত হতে পেরেছিল এবং সর্বোপরি ভক্তিরসপিপাসু বাঙ্গালী দর্শকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল।

কোন কোন সমালোচক 'বিল্বমঙ্গল' নাটককে গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন। এই নাটকের চরিত্র-চিত্রণ ও রচনা কৌশল যথার্থ শিল্পসম্মত। নাট্যাঙ্গিকে সেক্সপীয়রের অনুসরণ চিহ্ন পরিস্ফুট। চরিত্রগুলির কার্যকলাপও মনস্তত্ত্বসম্মত। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের যে শিল্পকৌশল তা একপ্রকার অনবদ্য বললেই হয়। চিন্তামণির জন্য বিল্বমঙ্গলের সর্বগ্রাসী প্রেম তাকে বারবার দুর্বল করে ফেলেছে এবং ফলস্বরূপ তার মনোমধ্যে সঙ্কল্পচ্যুতির বিষয়টি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গভীরতা তাকে অসহায় করে তুলেছে এবং ভিক্ষুকের গানের মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ভাবটি পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। নাটকের অন্তরাশ্রয়ী প্রেমচেতনা ভিক্ষুকের গানে ভাষারূপ লাভ করেছে। এই নাটকে কিছু কিছু অসঙ্গতি ও ত্রুটি থাকলেও কয়েকটি বিশেষ গুণে নাটকটি অবিস্মরণীয়। এই নাটকে পাশ্চাত্য নাট্য-শিল্প ধারার সঙ্গে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট জীবনধর্মের যথার্থ সংমিশ্রণ ঘটান হয়েছে। এই নাটকে প্রতিফলিত সত্য জাতীয় জীবনের দীর্ঘকালাশ্রিত আধ্যাত্মিক সত্য। ইহলৌকিক জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং শাশ্বত প্রেমের জন্য আর্তি এই নাটকের মৌল ভাবসত্য।

এবার গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষ ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারা সে যুগে গড়ে উঠেছিল। এবং সেটি যে স্বল্পোজ্জ্বল—তা নয়। মধুসূদন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যার পুষ্টিসাধন করেছিলেন, তা শেষ পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল। গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ অবলম্বনে এই নামের নাটক রচনা করেন। এটিকে খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক বলতে কোন বাধা নেই। মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র, মানিকচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা শেষ পর্যন্ত নবাবের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এই নাটকে দু-একটি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা থাকলেও নাট্যকার মোটামুটি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের রূপায়ন ও সার্থকতার ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিহার্য সর্ত। এই নাটকে সংলাপ সৃষ্টির দক্ষতাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এইসব নাটককে সামাজিক নাটক না বলে পারিবারিক নাটক বলাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, এই জাতীয় নাটকে সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর সমাজের যে প্রতিচ্ছবি

আছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অপরপক্ষে অধিকাংশ স্থলেই প্রধানতঃ পারিবারিক জীবনচিত্র অঙ্কিত করা এবং ব্যক্তিজীবনের শোচনীয় পরিণাম বা বিপর্যয়কে প্রকাশ করাই নাট্যকারের প্রকৃত লক্ষ্য। 'প্রফুল্ল' তাঁর সর্বাধিক খ্যাত নাটক। এই নাটককে কেন্দ্র করে একদা তিনি 'বিল্বমঙ্গলের' অনুরূপ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু, নাট্যশাস্ত্র—অনুসারী বিচারে এই নাটক প্রভূত পরিমাণে ত্রুটিপূর্ণ। এই নাটকের আরম্ভ থেকে পরবর্তী সামান্য অংশে নাট্যকারের কুশলতার সাক্ষ্য থাকলেও সমগ্রভাবে প্লটের গঠন ও চরিত্রের রূপায়নে নাট্যকার উপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। নাটক শিল্প হিসাবে অধিকমাত্রায় বাস্তব জীবনধর্মী হওয়ায় উপস্থাপিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে যৌক্তিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এই নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্রের মধ্যে যোগেশ ও সুরেশ বিশ্বাসের সীমারেখা স্পর্শ করে থাকলেও রমেশের চরিত্র ও তার ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ও যুক্তিহীন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, পারিবারিক নাটকে অর্থহীন ষড়যন্ত্র ও হত্যার প্রাবল্য নাটকের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেছে। যে 'প্রফুল্ল' এর নামে নাটকের নামকরণ--তাকেও আমরা কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখতে পাই না। তাই 'প্রফুল্ল' তাঁর অন্য সমশ্রেণীর নাটক 'হারানিধির' মত অতিনাটক' হয়ে উঠেছে। অথচ, শিল্পসম্মতরূপে বিন্যস্ত হলে এই নাটক হয়ে উঠতে পারত এক অনবদ্য সৃষ্টি।

## ॥ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একাধিক শ্রেণীর নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁরে আমরা প্রধানতঃ 'হাসির গান' এর রাজা হিসাবে জানি। কবি ও সংগীত রচয়িতা হিসাবেও তিনি বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর নাট্যখ্যাতি ও কবিখ্যাতি যেন পরস্পর প্রতিষ্ঠা-সংগ্রামে রত হয়েছে। তাঁর জনপ্রিয় নামও দ্বিজেন্দ্রলাল নয়—ডি. এল. রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রাণতা তাঁর বিখ্যাত গানগুলিকে অবলম্বন করে প্রায় ঐতিহাসিক প্রবাদে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করেন নি—এমন বাঙ্গালীও খুব কমই আছেন। এসব নাটকের সংলাপও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অনেক উক্তির মত বহু ব্যবহৃত প্রবাদের সমকক্ষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

যেমন প্রতিভাধর সাহিত্যের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের কয়েকটি বড় ঘটনা তাঁর সাহিত্যিক জীবন, মত ও ভাবকে পুষ্ট, গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। একদিকে ছিল তাঁর স্বল্পস্থায়ী উজ্জ্বল পারিবারিক জীবন, অপরদিকে তাঁর সমুন্নত প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী বিচারশীল অথচ ভাবপ্রবণ ব্যক্তিত্ব এবং স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিন্দাবাদ জনিত গ্লানিবোধ।

এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে যেভাবে সমাজপতিদের দ্বারা সমালোচিত হতে হয়েছিল, তার ফলে তাঁর চিত্তে জেগেছিল এই দুরপনেয় ক্ষোভ। বলা বাহুল্য, এই ক্ষোভ নিতান্ত অযৌক্তিক ছিলনা। হাসির গানের মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং সুস্থ জীবনচেতনার প্রকাশ দেখি। প্রহসনগুলিতে তাঁর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রতিফলন হয়েছে। সমাজের চিন্তাভাবনা ও অসুস্থ মানসিকতাকে তিনিও কঠিন আঘাতে বিধ্বস্ত করে এবং সুস্থ মানসিকতাকে ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রধানতম উপাদানই ছিল নির্ভীকতা। তাঁর পৌরুষ প্রভাবিত বিচারবোধ স্থির ও স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সহায়ক ছিল। বিদেশ প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রায় বিনা কারণে যে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছিল তার ফলে তাঁর স্বদেশপ্রাণ চিত্তে দেখা দিয়েছিল সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। ১৮৯৫ এ প্রকাশিত 'কল্কি অবতার' নাটকে তিনি নব্যহিন্দু, গোড়া পণ্ডিতসমাজ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সুতীব্র আঘাত করেছিলেন। তাঁর আভ্যন্তরীণ ক্ষোভকে তিনি উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন এই নাটকে। 'কল্কি অবতার'-এর ভাষা ছিল এক জাতীয় ভগ্ন মিত্রাক্ষর। ব্যঙ্গের তীব্রতাও নাটকটিকে এক বিশেষ রূপদানে সাহায্য করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের রুচি ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের। প্রহসনগুলিতেও এই রুচির প্রকাশ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য :—

"প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই।"

তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ'তে (১৮৯৭) এই রুচিবোধ আরও লক্ষ্যণীয়ভাবে স্থানলাভ করেছে। 'বিরহ' নাটকটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। উৎসর্গ পত্র থেকে জানা যায়— নাট্যকার এই নাটকে মানুষের প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্যকে রূপায়িত করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ত্র্যহস্পর্শ' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। 'পুনর্জন্ম' ও 'আনন্দ বিদায়' প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯১১ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। আনন্দ বিদায় নাটকটিতে তাঁর রুচির উচ্চমান এবং চিত্তের পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। কারণ, রবীন্দ্রবিদ্বেষের কলুষতা এই নাটকে অনাবৃত হয়ে তাঁর ব্যক্তি-গৌরবকে কলঙ্কিত করেছে।

প্রহসন রচনার যুগ শেষ হলে নাট্যকার দুখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। এই গীতিনাট্য দুটির নাম সীতা (১৯০০) এবং পাষাণী (১৯০৮)। সীতা গীতিনাট্য 'নবপ্রভা' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কোন কোন সমালোচক 'সীতা'কে গীতিনাট্য না বলে নাট্যকাব্য বলতে উৎসুখ— কারণ এর অভ্যন্তরে কাব্যধর্মই প্রধান। এই রচনাটির মূলে ছিল বাঙ্গালীর সহজ ও সুস্থ

গার্হস্থ্য জীবনচেতনা। 'পাষাণী' গীতিনাট্যে রামায়ণের অহল্যা বৃত্তান্তকে উনবিংশ শতকীয় জীবনদৃষ্টির আলোকে রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা সমধিক পরিস্ফুট হয়েছে তাঁব ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে। স্বদেশপ্রাণতাই ছিল তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও শিল্পীমনের কেন্দ্রীয় ভাবনা। সেই ভাবনাই উৎকর্ষের সঙ্গে শিল্পান্বিত হয়েছে তাঁর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে। তাছাড়া কালগত পটভূমিতে স্বাদেশিকতাই ছিল জাতীয় মন্ত্র। জাতীর জীবন-গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে যুগের সব স্বদেশভক্ত ব্যক্তিই। দ্বিজেন্দ্রলালও একই ভাবের ভাবুক হয়ে ভারত ইতিহাসের নানা পর্যায়কে অবলম্বন করে অসংখ্য ঐতিহাসক নাটক রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকগুলির খ্যাতি আজও অম্লান রয়েছে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা এগুলি থেকে এখনও রসপ্রত্যাশী।

নাট্যকারের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। টডের রাজস্থান থেকে এর কাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করতে পারি, মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' এর কাহিনী চয়ন করেছিলেন এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ থেকেই। রচনাভঙ্গী অনুসারে 'তারাবাই' একটি ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী রচনারীতির প্রভাব তিনি তখন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি গদ্যে রচিত হয়েছিল।

'প্রতাপসিংহ' ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সামান্য মাত্র কল্পিত রোমাণ্টিক উপকাহিনী ব্যতীত এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে এক বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক কাহিনী। প্রতাপসিংহের জীবনের সফল রূপায়নই এর উদ্দিষ্ট হলেও ভারত ইতিহাসের বিংশ শতকীয় ঘটনা-নির্ভর জীবনসত্য যেন অনেক পরিমাণেই এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য ঐতিহাসিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে তিনি যে একেবারেই সফল হননি এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। এই নাটক প্রকাশের পরবর্তী বৎসরেই 'দুর্গাদাস' প্রকাশিত হয় এবং তার দুই বৎসর পরেই 'নূরজাহান' প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় নূরজাহান নাটকেই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়। নূরজাহান চরিত্রটির অস্বাভাবিক জটিলতাকে নাট্যকার সযত্নে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। নূরজাহানের মনের বহুমুখিতা বিস্ময়সৃষ্টিকারী নানা বিপরীতমুখী ঘটনার মধ্যে রূপায়িত করেছে। চরিত্রটির জটিলতার মূলে রয়েছে তার উচ্চাশা ও রূপ-প্রেমময়তা। নূরজাহানের প্রথম জীবন ও পরবর্তী সময়ের দ্বন্দ্বকে নাট্যকার যথাসাধ্য রূপায়িত করেছেন। যদিও সেই উপস্থাপনার ধরণ হয়ত ঠিকমত বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এর কারণ বোধকরি এই যে, কথাসাহিত্যে যে জাতীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে মানসিক রহস্যের জটিলতার দ্বার উন্মোচন করা হয় —নাটকে বিশিষ্ট শিল্পরীতির জন্যই তার অবকাশ নেই। যাইহোক, নাট্যকার মূল

চরিত্রকে রূপায়িত করতে গিয়ে চরিত্রটির পরস্পর-বিরোধী দুই ভাবসত্য-প্রেম-কামনা ও প্রতিষ্ঠা বাসনাকে অবলম্বন করেছেন। এই নাটকটি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর-বহনকারী হলেও স্থানগত ঐক্যের অভাব, আত্যন্তিক কাহিনী ব্যাপ্তি এবং চরিত্রানুগ ভাষার অভাব প্রভৃতি ত্রুটি যে কোন নাট্যসমালোচকের চোখে সহজেই পড়বে।

'মেবার পতন' এ নাট্যকার বিশ্বপ্রেম-এর নীতিকে নাট্যরূপায়িত করতে অভিলাষী হয়েছিলেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি ; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম, এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।" ইতিহাসের মেবারের জীবনপটে যে জলন্ত দেশপ্রেম, দুর্লভ আত্মত্যাগ প্রবলতম সংযম এবং সংগ্রামসর্বস্বতা দেখা যায়—নাট্যকারের আত্যন্তিক ভাবাতিশয্যের জন্য অনেক স্থলেই সেসব যেন লঘু ও তরল ভাবপ্রবাহে পরিণত হয়ে পড়েছে। ফলে নাটকোচিত ভাবসংহতির অভাব এই নাটককে অনেক দুর্বল করে ফেলেছে। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকে উনবিংশ শতকীয় দেশপ্রেমের আবহাওয়ায় সঞ্চারিত হওয়ায় মূল কালগত ঐক্য অনেক ক্ষেত্রেই বিনষ্ট হয়েছে।

সাজাহান (১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত হয়। নাট্যকারের স্বভাবসিদ্ধ আবেগময়তা এই নাটকে সংহত হয়ে মানবমনের বেদনা সংঘাতকে এক বিশেষ উদ্দীপ্ত অথচ সংযত ভাষায় নাট্যকার প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। সর্বোপরি সাজাহান চরিত্রের গভীর বেদানার্ত্তি যেন শিল্পীর অন্তর্জীবনের ভাবানুভূতির রসে জারিত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়ে সরাসরি আমাদের মনকে স্পর্শ করেছে। বহির্দ্বন্দ্ব এই নাটকে সুষমভাবে প্রায় সেকস্পীয়রীয় নিপুণতায় রূপায়িত হয়ে এক রসঘন রূপ লাভ করেছে। তাই 'সাজাহান'ই দ্বিজেন্দ্র প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন। যে ঐশ্বর্যশালী গভীর ভাববাহী ভাষার জন্য আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাও এই নাটকে সমনিপুণতায় ব্যবহৃত।

## ॥ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ॥

তারাচরণ শিকদার ও হরচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে সূচনা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে করেছিলেন, তার ক্রমোন্নতি-পর্ব চিহ্নিত হয়েছিল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার অবদানে। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র এই নাট্যধারাকে আরও সমৃদ্ধি দান করেন। সামান্য উত্তরকালে নাট্যকার হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবের ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের অধিকতর পরিপুষ্টি সাধিত হয়। আমরা অবশ্য কোন অবস্থাতেই অমৃতলালের দানের কথা

বিস্মৃত হতে পারি না। ইনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের ভাবশিষ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক ছিলেন—তাই নয়, দুজনেই একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে)। অধিকন্তু, এই দুই নাট্যকারের প্রথম ঐতিহাসিক প্রকাশ কাল একই অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাঈ' নাটক প্রকাশিত হয়। ক্ষীরোদ-প্রসাদের উপর একদিকে যেমন গিরিশচন্দ্রের, অপরদিকে তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব লক্ষিত হয়। পৌরাণিক নাট্যরচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিভাবোজ্জ্বল হৃদয়বত্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবনার উদ্দীপনা এবং উচ্চশ্রেণীর সংলাপের জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন। তথাপি একথা সত্য যে, ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূরণ হয়েছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর নাটক রচনা করেছিলেন—(১) পৌরাণিক (২) রোমান্টিক এবং (৩) ঐতিহাসিক। এখানে তাঁর রচিত নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

(ক) পৌরাণিক নাটক

(১) নর-নারায়ণ, (২) ভীষ্ম, (৩) উলুপী, (৪) সাবিত্রী (৫) বভ্রুবাহন (৬) রঙ্গাবতী। (অপৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক)

(খ) রোমান্টিক নাটক—

(১) আলিবাবা, (২) কিন্নরী, (৩) রক্ষঃরমণী, (৪) কুমারী, (৫) ফুলশয্যা (৬) প্রেমাঞ্জলি।

(গ) ঐতিহাসিক নাটক—

(১) নন্দকুমার, (২) আলমগীর, (৩) অশোক, (৪) চাঁদবিবি, (৫) বাঙ্গালার মসনদ, (৬) পদ্মিনী।

এই তিন শ্রেণীর নাটক ব্যতীত তিনি কিছুসংখ্যক গীতিনাট্যও রচনা করেছিলেন। কিন্তু, এই জাতীয় নাটক সংখ্যায় এত অল্প এবং বৈশিষ্ট্যের দিক এত তাৎপর্যহীন যে, সেগুলির পৃথক আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

নাট্যকার হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের শিল্পীমানস গঠিত হয়েছিল উনবিংশ শতকের কিছু বিশ্বাস ও ভাবপ্রাধান্য এবং বিংশশতকীয় বাস্তবতা ও যুক্তিমত্তা—এই উভয়বিধ সত্তার সামঞ্জস্যবিধানের দ্বারা। তবে তুলনামূলকভাবে তাঁর মধ্যে পৌরাণিক চেতনা ও ভক্তিভাব এবং রোমান্টিকতা যে অধিকমাত্রায় ছিল তা তাঁর নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য বিচার করলেই প্রমাণিত হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যপ্রতিভার বিশিষ্টতা নিরূপণে বিভিন্ন সমালোচক ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এখানে দুটি পরস্পর বিরোধী মন্তব্য উদ্ধৃত হ'ল :—

(১) "ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে রোমান্স এতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে, তাহার জন্য তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া কষ্ট। রোমান্টিক নাটকে আখ্যায়িকার আকস্মিক পরিবর্তন ও অসংযত গতিবেগ কর্মকে গোপন করিয়াছে।..... পরিস্থিতি হইতে পরিস্থিতিতে সংক্রমণকালে ঘটনার যে ক্রমাগতি থাকার প্রয়োজন, চরিত্রের সংঘাত ও বিকাশের মধ্য দিয়া কর্মকে রূপায়িত করিবার যে প্রয়াস, ক্ষীরোদ-প্রসাদের অনেক নাটকেই তাহা নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক, রোমান্টিক কাল্পনিক, সমস্ত নাটকেই একই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র ইতিহাস নয়, পুরাণ নয়, রোমান্স বৈদ্যনাথ শীল।"

(২) "ঐতিহাসিক নাট্যরচনাতেই তাঁহার প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ...তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকমাত্রই অতিরিক্ত রোমান্টিক ধর্মী। তাঁহার ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকও প্রধানতঃ রোমান্টিকধর্মী।" — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

উপরের দুটি উদ্ধৃতির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা দেখা যায়- প্রথম সমালোচক ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য-বিচারে তাঁর রোমান্স-ধর্মিতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন নিঃসংশয়ে। কিন্তু, দ্বিতীয় সমালোচকের উক্তির মধ্যে স্ববিরোধিতার ভাব বিদ্যমান। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন—এই মতকে স্বীকার করে নিলে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠত্বও মেনে নিতে হয়। কিন্তু, তা যে সত্য নয়, তা সমালোচক একটু পরেই নাট্যকারের রোমান্সধর্মিতার প্রাধান্য স্বীকারের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। কারণ, ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান গুণ তার ইতিহাসনিষ্ঠা এবং তৎসংক্রান্ত বাস্তবতা। কল্পনা প্রাধান্য থাকলেই প্রথম মন্তব্যটিকে কিছুতেই স্বীকৃতি জানান যায় না। এক্ষেত্রে বৈদ্যনাথ শীলের মন্তব্যটিই গ্রহণযোগ্য। ঠিক একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত ইতিহাস-অবলম্বী গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র "রাজসিংহ"কেই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

ঊনবিংশ শতক নবজাগরণের কাল। পাশ্চাত্য জীবনভিত্তিক যুক্তি-সারবত্তা আমাদের দেশের তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু, সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনধারার সত্য যে ভাবাবেগপ্রাধান্য —তা সমাজের অধিকাংশ স্তরে একইভাবে বর্তমান ছিল। এটি সত্য না হলে গিরিশ-চন্দ্রের মত ভাবোদ্বেল-হৃদয় নাট্যকার এবং 'আলিবাবা'র ক্ষীরোদপ্রসাদ এত অধিক মাত্রায় জনপ্রিয়তালাভে সক্ষম হতেন না। বস্তুতঃ এঁদের জনপ্রিয়তায় মধ্য দিয়েই জাতীয় মানস বৈশিষ্ট্যটি উত্তমরূপে প্রকাশিত। সমসাময়িক নাট্যমঞ্চের ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে 'আলিবাবা' নাট্যকারের সর্বাধিক বিখ্যাত রোমান্টিক নাটক। এটি

একটি বিশুদ্ধ রোমান্স এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। এই নাটকে অবলম্বিত ঘটনাক্রমের যুক্তিহীনতা আমাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক অবিশ্বাসের সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষের মাঝে বর্তমান চিরন্তন শিশুমনকে স্পর্শ ও আন্দোলিত করে। যার ফলে, আমাদের হৃদয় এক বিশুদ্ধ আনন্দরসে অভিষিক্ত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য আমরা বস্তুময়তাকণ্টকিত জগৎ থেকে এক বিশেষ কল্পনাব স্বর্গে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করে নিই। নাটকটি হাস্য ও গীত সমৃদ্ধ এক অনাবিল রসের জগৎ সৃষ্ট করে। নাটকে মৃত্যুর ভয়াবহতা থাকলেও তা যেন চলমান এক লঘু মেঘখণ্ডের মত জীবনের উপর ক্ষণিক ছায়া বিস্তার ক'বে প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দেব নির্মল সৌব-কিবণ পাতের প্রসন্নতার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে যায়। মর্জিনা-আবদাল্লাব নৃত্যগী- যেন ক্ষয়শীল জীবনের উপব দিয়ে মানুষের শাশ্বত সঞ্জীবনী সত্তাব জয়ধ্বজা উড়িয়ে যায। 'অপেবা' শ্রেণীভুক্ত এই নাটকটি তাই এই বিংশশতকেব শেষাংশেও সমানভাবেই জনপ্রিয়। সম্ভবতঃ 'আলিবাবা'ই ক্ষীরোদ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান।

নাট্যকাবেব 'ফুলশয্যা' নাটকটিব উপাদান ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও আভ্যন্তরীণ ধর্মবিচাবে এটি বোমান্টিক নাটক। এটি অমিত্রাক্ষব ছন্দে রচিত। বোমান্টিক নাটক হিসাবে 'কিন্নবী' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল। এবি অবলম্বন মর্ত্য ও কিন্নরলোকেব প্রেম কাহিনী। নাটকটিব রসমাধুর্য যথার্থই উপভোগ্য। 'রক্ষঃ রমণী' নাট্যকারেব আব একটি বোমান্টিক নাটক। এই নাটকে কালিদাসেব শকুন্তলা এবং শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট নাটকের প্রভাব আছে বলে মনে হয়।

ক্ষীবোদপ্রসাদ অসংখ্য পৌবাণিক নাটক রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের ভাবধারায় দ্বাবা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বামকৃষ্ণের দেহান্তব ঘটে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। গিরিশচন্দ্রেব ব্যক্তিজীবন এবং শিল্পীমানসের উপব ঠাকুর রামকৃষ্ণের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। এবং ঐতিহাসিক বিচারে একথাও সত্য যে, তৎকালীন বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয়। অবতারবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বামকৃষ্ণের প্রভাবের তাৎপর্যও স্মবণীয়। এমনি এক প্রভাবের প্রত্যক্ষ সাহিত্য-চর্যারূপ প্রতিফলন হিসাবে নাট্যকারের 'নর নারায়ণ' নাটকটিকে গ্রহণ করা যেতে পাবে। এটির নাট্যকার প্রদত্ত নাম ছিল 'কর্ণ'। প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা শিশির ভাদুড়ী মহাশয় উক্ত পরিবর্তিত নামে নাটকটিকে মঞ্চস্থ কবেন। কর্ণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণভক্তিব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই এই নাটকেব প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কাবণ, কর্ণেব অন্তিম মুহূর্ত্তেব প্রার্থনা এই ভাবে ধ্বনিত ঃ—

"বাসুদেব – বাসুদেব
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর !
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ।"

এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর নাট্যকার 'কৃষ্ণ' নামে আর একটি নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন কিন্তু, সহসা শোকপ্রাপ্তির জন্ম রচনার কাজ শেষ করতে পারেন নি। সেজন্য 'নর নারায়ণ' নাট্যকারের সবশেষে পূর্ণাঙ্গ রচনা—যেহেতু এই ঘটনার পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নাট্যকারের অপর বিখ্যাত পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম' নাটকটি সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছিল। ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবন এর অবলম্বন। একটি নাটকেই জীবনেব দীর্ঘতা চিত্রিত হওয়ায নির্দিষ্ট কোন ঘটনা বা বিষয়ের উপরেই নাটকীয় সংঘাত কেন্দ্রীভূত হতে পাবে নি। ফলে নাটকটি ভীষ্মের দীর্ঘ জীবনের বৃত্তান্তসমূহের উপস্থাপনামাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ভীষ্মেব জীবন পর্যায় পূর্ব নির্দিষ্ট হওয়ায় ঔৎসুক্যের অভাবহেতু নাটকীয় বিস্ময়সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালও একই বিষয় অবলম্বনে একটি নাটক বচনা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে নাট্যকারের প্রভূত পাণ্ডিত্যহেতু তাঁর কোন কোন নাটকে তার প্রভাব বড হয়ে দেখা দেওয়ায় ঠিক নাট্যরসমণ্ডিত হতে পারেনি।

বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক পূর্বেই 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক 'পদ্মিনী' উক্ত কাব্য অবলম্বনে রচিত হলেও সর্বাংশে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। দেশাত্মবোধ ও জাতীয় জাগরণের দিনে নব পর্যায়ে ভারতীয় ইতিহাসের চর্চা একটি বিশিষ্ট ধর্ম হয়ে উঠেছিল। সকল নাট্যকারই অল্পবিস্তর জাতীয় ইতিহাসের খ্যাত চরিত্র অবলম্বনে নাটক রচনায় আত্মনিযোগ করেছিলেন। এই প্রবণতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথে শুরু হয়ে দ্বিজেন্দ্র-লালে চবম পরিণতি লাভ করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদেও একই ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এই ধাবার আরও নাটক—'নন্দকুমার' 'চাঁদবিবি' 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

নাট্যকারের সর্বাধিক খ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'আলমগীর'। মুঘলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবনচিত্র যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে এই নাটকে পরিবেশিত। সম্রাটের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যকার কৃতিত্বের সঙ্গে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সূক্ষ্মতাও লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকে অন্যবিধ ক্রটি থাকলেও ক্ষীরোদ-প্রসাদের বিশিষ্ট রচনা হিসাবে এটি চিহ্নিত।

## ॥ বাংলা ছোট গল্প : সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

### ॥ ভূমিকা ॥

গল্প শোনার নেশা মানুষের চিরকালের। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগ যখন মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মানুষ ভাষার আবিষ্কার করেনি—তখন থেকেই গুহাচিত্রের মধ্য দিয়েই মানুষ হয়ত তার শিকারের রোমাঞ্চ, আনন্দ ও বৈচিত্র্যকে প্রকাশের জন্য যত্নবান হয়েছিল। ছবিতে লেখা সে গল্প এখনও নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের কৌতূহলকে জাগ্রত করে। গল্প ভাষাভিত্তিক শিল্পকলা হিসাবে ছোটগল্পে রূপান্তরিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক আমলে। কিন্তু সু-প্রাচীন কাল থেকে মানুষের সভ্যতার উন্মেষ ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ছোট গল্পেরও প্রসার ও ক্রমবিবর্তন হতে থাকে। পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে জীবনের যে বিচিত্র গতিধারার বিস্ময় ও অপরিসীম বৈচিত্র্য—তাই-ই ছোট গল্প ও কথা সাহিত্যের মৌল উপাদান। কাহিনী ও গল্পের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের আকর্ষণ মানুষের কাছে ক্রমে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। ক্রমে মানুষ উন্নততর জীবে পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক সূক্ষ্মতা এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে সে চিন্তার গভীরতা থেকে জীবন-তত্ত্বের রাজ্যে পৌঁছেছে। মানুষ তখন এই তত্ত্বের সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে যার আশ্রয় নিয়েছে—আমরা তাকে গল্প বা কাহিনী বলেই জানি।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থগুলিকে তাই একজাতীয় অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গল্পের সংকলন বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। বাইবেল Old Testament বা New Testament-এ অসংখ্য গল্পের কথা আমরা সকলেই জানি। পৌরাণিক গাথা কাব্যের যুগে ও মহাকাব্যের উদ্ভব কালে এরকম কাহিনীর ব্যবহার ক্রমবর্ধিত হয়। গ্রীক মহাকাব্যগুলিতে এবং সাহারের আমলের রোমের সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সময়ে নানাবিধ গল্পের প্রচলন ও ব্যবহার প্রায় সর্বজন-পরিজ্ঞাত সত্য। ভারতীয় প্রাচীনতম মহাকাব্য মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে সংখ্যাতীত উপকাহিনীর সংযুক্তি সাধনের ফলে গ্রন্থের আয়তন যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তেমনি এই অনন্য সাধারণ মহাকাব্যের ভাবাত্মক পুষ্টিসাধনও হয়েছে। বৌদ্ধ সভ্যতাকে কেন্দ্র করে জাতক কাহিনীর মত বিশাল কথা-সাহিত্য গড়ে ওঠে। সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পও যথেষ্ট প্রাচীন। সাহিত্যিক গুণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওয়ার ফলেই এগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বহুপূর্বেই অনূদিত এবং এবং বৃহত্তর পাঠকসমাজ কর্তৃক সাদরে পঠিত হয়ে আসছে। আরব্য ও পারস্য উপন্যাসও প্রধানতঃ গল্পের আকর্ষণের ফলেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাতেও এগুলির একাধিক অনুবাদ দৃষ্ট হয়। ইটালীয় বোক্কাচিও (বা বোকাশিও) বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ রচয়িতা। তাঁর প্রভাব একদা সারা ইউরোপে পরিব্যাপ্ত

হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে আলফাঁস, দোদে, শেকভ, ডি. এইচ. লরেন্স গোগোল ও পুশকিনের আবির্ভাবের ফলে গল্প শিল্পসম্মত ছোট গল্প হয়ে ওঠে। পরে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ক্রমে ফ্রান্সের মোপাসাঁ, ইংলণ্ডের সমারসেট মম, আমেরিকার এডগার এ্যালেন পো, রাশিয়ার গোর্কী ও টলষ্টয় এবং ভারতে রবীন্দ্রনাথের মত বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাবের ফলে ছোট গল্পের এক সমৃদ্ধ জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।

**সূচনা পর্ব ঃ** বাংলা গল্পের প্রকৃত লক্ষ্যণীয় আরম্ভ রবীন্দ্রনাথ থেকে হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রায় মধ্যযুগ থেকে বাঙ্গালীর নানা কাহিনীপ্রীতি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্প ও উপন্যাস রূপকল্প ও প্রযুক্তির দিক থেকে আধুনিক হলেও কাব্য-কবিতাকে আশ্রয় করে তা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। দেবদেবীকে অবলম্বন করে মঙ্গলকাব্য রচিত হলেও, সেখানে মানুষের কথাই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্যলাভ করেছে এবং মঙ্গলকাব্যে যে সব বৈচিত্র্যময় কাহিনী কবিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে—তা আধুনিক যুগের উন্নত গদ্যের মাধ্যমকে অবলম্বনরূপে পেলে যে আধুনিক কথা-সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করত—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরামকে যে অনেক সমালোচক আধুনিক কথা সাহিত্যের পথিকৃৎ বলে অভিনন্দিত করেন তা অযৌক্তিক নয়। কারণ, সেখানে মুখ্য বিষয় সুখ-দুঃখ বেদনাময় পার্থিব মানব-জীবন যাকে অবলম্বন করে কাব্যটি গড়ে উঠেছে। মধ্য যুগীয় বাংলা কাব্য সাহিত্যের যে আকর্ষণ—তা যে কাহিনীভিত্তিক, সে সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যের বিপুল পরিসরের মধ্যে চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে যেসব ঐতিহাসিক ও কল্পিত কাহিনার অবতারণা করা হয়েছে—পাঠক মনে তার প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুত এই সব কাহিনীর মধ্যে তাঁর জীবনের অলৌকিক মহিমার বিস্ময়বোধের দ্বারা পাঠক মন অভিভূত হয়। মানবদেহকে আশ্রয় করে যে অলৌকিক রসের জগৎ গড়ে উঠেছিল—চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে সাধারণ পাঠকের কাছে তাই অবশ্য মুখ্য বিষয়। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' খ্যাতির মূল কারণ দুটি—(১) কবির অভিনব রচনা শৈলী (২) বিদ্যা-সুন্দরের জীবন-কেন্দ্রিক প্রেম-কাহিনীর বৈচিত্র্য। উনবিংশ শতকের বাংলা খণ্ডচিত্র সমন্বিত গ্রন্থ কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সে কালের কলকাতার চলমান জীবনের বর্ণনা ব্যতীত আর কি? প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রধানতঃ কাহিনীপ্রধান। এও সেই চিরাচরিত গল্পেরই আর এক দিক।

উনবিংশ শতকের সূচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন প্রধান সাহিত্যমাধ্যম গদ্যের সূচনা হ'ল, অপরদিকে তেমনি গল্প ও কথা সাহিত্যের প্রসারের পথ সুগম হ'ল। উইলিয়ম কেরীর নামে প্রচলিত 'ইতিহাসমালা' প্রকৃতপক্ষে কোন ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থের মধ্যে মোট চারটি ঐতিহাসিক

কাহিনী আছে বাকি সবই কল্পিত কাহিনী - যেগুলি ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। ফাদার ছতিয়েন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা'য় এর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য কাহিনীর রসসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। বাস্তবজীবন-চেতনাকে গল্পের মূল অবলম্বনীয় সত্য বলে গ্রহণ করলে কেরীর 'ইতিহাস মালা' ও 'কথোপকথন'কে প্রথম বাংলা গল্পগ্রন্থের মর্যাদা দিতে হয়। তাছাড়া ভাষা ব্যবহারের দিক থেকেও চলিতের সুপ্রচুর ব্যবহার এগুলোকে অধিকতর বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নকশা জাতীয় রচনার প্রচলনের দ্বারা নতুন ধরণের কাহিনী-সাহিত্যের সূচনা হ'ল বলা যায়। পরে কালীপ্রসন্ন বা প্যারীচাঁদ মিত্র ভবানীচরণের দ্বারাই অনুপ্রাণীত হন বলে আমরা অনুমান করতে পারি। উনবিংশ শতকের নানা সাময়িকপত্রের পাতায় যে সব কাহিনী-জাতীয় রচনা প্রকাশিত হ'ত সেগুলিও বাংলা ছোট গল্পের সূচনা-পর্যায়ের সৃষ্টি বলে চিহ্নিত হতে পারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই শ্রেণীর নানা কাহিনী প্রকাশিত হ'ত। ডঃ শিশির দাশ বলেছেন—"বিবিধার্থ সংগ্রহে' এজাতীয় ছোট ছোট কাহিনী বেরুত। যেমন—'এক হাজার টাকার পা', 'ভৌত বিচার'। প্রায় প্রত্যেক মাসে এ ধরণের কাহিনী থাকত। উনবিংশ শতকে বাংলা দেশে নানা ধরণের আখ্যান, উপাখ্যান, নীতি সন্দর্ভে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। এদের চারভাগে ভাগ করা চলে—(১) হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনূদিত গল্প (২) আরব্য উপন্যাস জাতীয় রোমান্টিক গল্প (৩) খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা লিখিত বা সংকলিত নীতিগল্প (৪) মানুষের জীবন নিয়ে রচিত, অবাস্তব, পটভূমি-বর্জিত গল্প।

## ॥ প্রথম পর্যায় ॥

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' এবং বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশ'তির মধ্যে প্রথম পূর্ণ কাহিনীর স্বাদ পাওয়া গেল। পরে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে এর উন্নততর প্রকাশ ঘটল। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' সার্থক 'নভেলেট' জাতীয় রচনা। গঠন কৌশল ও আঙ্গিকের দিক থেকেও এই রচনার মান যথেষ্ট উন্নত। বঙ্কিম পূর্ব যুগে তাই উপন্যাসিক হিসাবে বা তার প্রারম্ভিক প্রচেষ্টায় নিদর্শন হিসাবে এর গুরুত্ব অসাধারণ। তাছাড়া, এর দ্বারা সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এরপর ১৮৭৪ এর বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনা হ'ল। কারণ, প্রথম প্রকাশে 'ইন্দিরা' আয়তনের দিক থেকে বেশ ছোট ছিল। তৎকালীন সমালোচকবৃন্দও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' প্রকাশিত হয়।

অতঃপর 'ভ্রমর' পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনী' ও "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এবং ১৮৭৭ এর 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিনী' গল্প প্রকাশিত। বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে এগুলি প্রারম্ভিক পর্যায়ের প্রচেষ্টা হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

## ॥ প্রাক্-রবীন্দ্র যুগ ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥

কালের বিচারে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তাছাড়া এঁদের গল্পগ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথও গল্পকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ। কারণ, ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। স্বর্ণকুমারীর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকাহিনীর' প্রকাশকাল ১৮৯২। তবে, তিনি বহু পূর্ব হতেই ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রদত্ত তথ্যের সাহায্যে জানা যায় যে, স্বর্ণ কুমারী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব থেকে ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থে 'কুমার ভীমসিংহ' 'ক্ষত্রিয় রমণী' ইত্যাদি মোট দশটি গল্প সংকলিত। ১৮৮৮খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী ও হিরণ্ময়ীদেবী 'গল্প-সল্প' নামে শিশুদের উপযোগী একটি গল্প সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের পূর্ব থেকেই সচেতনভাবে ছোটগল্পকে বিশিষ্ট শিল্পরীতির উপযোগী করে তোলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টাকে একটা ঐতিহাসিক মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে অনন্য সাধারণ প্রতিভার বলে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করার উপযোগী করেছিলেন স্বর্ণকুমারীর বা নগেন্দ্রনাথের মধ্যে সে জাতীয় প্রতিভা ছিলনা। তবে, রীতির কথা মনে রাখলে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীকে পথিকৃৎ এর গৌরব দিতেই হয়। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের সগৌরব আবির্ভাবের দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্যের সর্বাধিক গৌরবময় অধ্যায় তখন সূচিত হয়েছে। স্বভাবতঃ তৎকালীন ছোটবড় অনেক সাহিত্যিকই বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর গল্পগ্রন্থে ঐতিহাসিক রচনায় সংখ্যাধিক্য দেখে মনে হয় তিনিও বঙ্কিমপ্রভাবকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। রচনারীতি স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব হলেও, কোথাও কোথাও বঙ্কিম-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর রচনারীতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য। ভাষার উপর তাঁর আধিপত্য নিতান্ত স্বল্প ছিলনা এবং সে কারণেই মানবমনের সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব প্রকাশের উপযোগী বলেই সেই ভাষাকে মনে করা যায়। আভ্যন্তরীণ ভাবময়তার দিক থেকেও গল্পগুলি ছিল উন্নতমানের রুচিসম্পন্ন। একটা

স্বতঃস্ফূর্ত আভিজাত্যের সৌকুমার্য যেন সেখানে সহজেই সৃষ্ট হ'ত। তবে তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও বা এক অনির্দেশ্য বিষাদ থাকত যা পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আকুল করে তুলত। স্বর্ণকুমারী তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষপর্যায়ে প্লটরচনার কুশলতার পরিচয় দিলেও অধিকাংশ স্থলেই তা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাসের অভাবে ঠিক শিল্পোৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। তবুও 'গহনা' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে তিনি প্রকৃত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

যে সমস্ত লেখক রবীন্দ্র যুগে জন্মগ্রহণ করেও রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁদের অন্যতম। গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই নগেন্দ্রনাথ সযত্নে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রকাশের পূর্বে তাঁর রচিত কিছুসংখ্যক গল্প এই দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেকালের এক বিচিত্র ক্ষমতাশালী লেখক। বিষয়বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে তিনি স্বর্ণকুমারী অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। তিনি অসংখ্য ছোটগল্প ও উপন্যাসের রচয়িতা। তিনি কখনও বা ঐতিহাসিক, কখনও বা রোমান্টিক ও সামাজিক বিষয় অবলম্বন করেছেন সম্ভবতঃ নগেন্দ্রনাথই বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক গোয়েন্দা কাহিনীর রচয়িতা। তাঁর প্রথম দিকের গোয়েন্দাগল্প 'চুরি না বাহাদুরি' যথেষ্ট আকর্ষণীয়। নগেন্দ্রনাথের কোন কোন গল্পে রবীন্দ্রনাথের গল্পের পদধ্বনি শোনা যায়। কোন এক সমালোচকের মতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভৈরবী' গল্পটি রবীন্দ্র পূর্বযুগের শ্রেষ্ঠস্থানীয় গল্প।

রহস্যকাহিনী রচনায় নগেন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়বস্তুব নির্বাচনে তিনি অতীত জীবনকেই আশ্রয় করেছেন। তাঁর রহস্য কাহিনীতে প্রতিফলিত অতীত ইতিহাসকেন্দ্রিক অথবা কল্পিতজীবন তার সমগ্র অপরিচয়ের রহস্য ও স্বপ্নময়তাসহ উপস্থাপিত। এই প্রসঙ্গে এযুগের শ্রেষ্ঠস্থানীয় সমশ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমাদের স্বতঃই মনে হয়। এমন কি নগেন্দ্রনাথের ভাষার উৎকর্ষও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে—

"গৃহের একদিকে ক্ষুদ্র উপবনের ন্যায়, ক্ষুদ্র তমাল ও লতাকুঞ্জের মধ্যে স্ফটিকের সরোবর। তাহার মধ্যে চীনদেশীয় মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। পরীর মুখের ন্যায় একটি উৎস রহিয়াছে, হীরকের দন্তপংক্তি, নীলকান্তমণির চক্ষু, সুবর্ণনির্মিত বাহু তাহার রন্ধ্র হইতে জল ঊর্ধ্বে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আলোকে শতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সূক্ষ্ম বারিকণা স্ফটিকের সরোবরে পতিত হইতেছে। গৃহের ঊর্দ্ধদেশে মুকুরমণ্ডিত, প্রাচীরে দিল্লীর প্রধান চিত্রকরদিগের নির্মিত চিত্র দেখিয়া রমণীর মুখ লজ্জায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।"

## ॥ গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ॥

বিশ্বকবির স্ব-স্বীকৃতি অনুসারে, জগৎসভায় কবিরূপে প্রতিষ্ঠালাভই তাঁর আত্মার কামনাস্বরূপ। তাঁর সে বাসনা পূর্ণতালাভ করেছে। তাঁর কবিসত্তাই পুরস্কৃত। যদি এ রূপটিই তাঁর পরিপূর্ণতার প্রতীক হয় তবে অন্যবিধ রূপময়তাকে এই মৌল ভাবঅস্তিত্বের পরিপূরক বলেই গণ্য করতে হয়। তাই নাট্যকার ও ছোটগল্প রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের কোন স্ব-বিরোধিতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃত রূপকার। তাঁর হাতেই বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃতমুক্তি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে জীবনের শেষতম বৎসর ১৯৪১ পর্যন্ত তিনি অন্য সহস্রবিধ কাজের সঙ্গে ছোটগল্প রচনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আঙ্কিক হিসাবে গল্পরচনার সময়সীমা মোট ৫৭ বৎসর এবং রচিত মোট গল্পের সংখ্যা ১১৮। গল্পগুচ্ছের তিনখণ্ডে মোট ৮৪টি গল্প, 'সে' গল্পগ্রন্থে ১৪টি, 'গল্পসল্প' গ্রন্থে মোট ১৬টি গল্প, 'তিন সঙ্গী'তে ৩টি এবং 'মুকুট' এ ১টি গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে 'সে' 'গল্পসল্প' ইত্যাদি গ্রন্থের গল্পগুলি গল্পগুচ্ছের গল্প থেকে কিছুটা পৃথক।

রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার যুগবিভাগও করা সঙ্গত। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় তাঁর গল্প রচনার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির প্রায় অর্ধেক সংখ্যক গল্প এই সময়সীমায় মধ্যেই রচিত। রচনার আঙ্গিক ও ভাবধর্মের দিক থেকেও এই কালের গল্পগুলি শ্রেষ্ঠস্থানীয় অন্ততঃ - 'সোনার তরী' কাব্যে 'বর্ষাযাপন' এ কবি ছোটগল্পের যে আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন — সেই আদর্শ অনুসারেই এই মন্তব্য করা চলে। মধ্যবর্তী সময়ে ( ১৮৯৭ ) ছোটগল্প রচনায় বিরতি ঘটে। কারণ, 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছোটগল্প রচনায় প্রত্যক্ষ প্রেরণার অভাব অনুভূত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালেও মোট ১২টির বেশী রচনা আমরা পাইনা। এই সময়ে সাহিত্যের অন্য শাখা উপন্যাস রচনায় তিনি তখন হাত দিয়েছেন 'চোখের বালি' 'গোরা' এবং 'নৌকাডুবি' এইকালে প্রকাশিত। পরে ১৯২৫ এর পর কিছুসংখ্যক ছোটগল্প রচিত হয়। পূর্ব মন্তব্যের সূত্র অবলম্বনে বলা যায় 'সে' 'গল্পসল্প' এবং 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল।

বাংলা গল্প সাহিত্যের ইতিহাসের সূচনা ও সহসা সমৃদ্ধি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতেই। রবীন্দ্র পূর্ব যুগে বিক্ষিপ্তভাবে যা কিছু রচিত হয়েছে তা সংখ্যায় যেমন স্বল্প, ছোটগল্পের যথার্থ বৈশিষ্ট্য থেকে তেমনি দূরবর্তী। যে প্রভাতকুমারের নাম ছোটগল্পের ক্ষেত্রে খুব গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর আবির্ভাবও পূর্ণ রবীন্দ্রযুগে এবং তিনিও রবীন্দ্র প্রভাবিত - যদিও এসত্য স্বীকার্য্য যে, স্বকীয়তা তাঁর অবশ্যই ছিল এবং পরবর্তী গল্পকারদের তিনি প্রভাবিত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যখন অসংখ্য ছোটগল্প লেখা শেষ হয়েছে এবং তাঁরই কৃতিত্বে বাংলা ছোটগল্প যখন

যৌবনে উপনীত তখনই প্রভাতকুমারের গল্পকার হিসাবেপ্রথমআবির্ভাব হল 'নবকথা' গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্প ও উপন্যাসে বঙ্কিমপ্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেক স্বনামখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচক। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কবি জীবনের গাঢ় অনুভূতি, ব্যাপক পল্লীবাংলার জাবন অভিজ্ঞতা, মানব হৃদয়ের ভাবসত্যের সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয় তাঁর প্রথম দিকের গল্প-গুলির উপাদান হয়ে উঠেছে। কবিজীবনের সমৃদ্ধতম যুগ হিসাবে এই পর্যায় চিহ্নিত হতে পারে। কারণ ছিন্নপত্রের সুমিষ্টতম চিঠিগুলি ও 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা' কাব্যের কবিতাগুলি এযুগেই রচিত। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার যে জীবনদৃষ্টি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে সমকালীন ছোটগল্পগুলির মধ্যে সেই জীবনতন্ময়তা ভাষারূপ লাভ করেছে। জীবন-সাযুজ্য ও প্রাসঙ্গিক আবিষ্কারই গল্পগুলির অবলম্বনীয় সত্য।

এই যুগের রবীন্দ্রসাহিত্য জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রেরণা ও উৎস বিষয়ে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচক শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

> "পল্লীবঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আছে মানুষ ও প্রকৃতি ; জনপদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ; একদিকে গ্রাম ও ছোটখাট সব শহর আর একদিকে নদনদী, বিলখাল, শস্যহীন ও শস্যময় প্রান্তর ; আর সবচেয়ে বেশী করিয়া আছে রহস্যময়ী পদ্মা। মোটের উপরে বলিলে অন্যায় হইবে না যে, এই পর্বে লিখিত কাব্যকবিতার রসের উৎস এই প্রকৃতি, আর ছোটগল্পগুলির রসের উৎস এইসব জনপদ। ......ছোটগল্পগুলিতে পাই সুখ দুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্খা।"

রচনা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির ভাষা গীতিধর্মী হলেও বিষয়-বস্তু ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে সেগুলি যথার্থই বাস্তবধর্মী। এরকম একটা মত রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। প্রাক্ রবীন্দ্রযুগে যে সব মানুষ ও পটভূমি আমাদের সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভে অসমর্থ হয়েছে, কবি-গল্পকার তাদেরই সযত্নে চয়ন করে এক একটি গল্পের মালা গেঁথেছেন। 'ছুটি' গল্পের ফটিক অথবা 'পোস্টমাষ্টার' গল্পের পোস্টমাষ্টার, 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কাবুলিওয়ালা' 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের' রাইচরণ এরা সকলেই তাঁরা নিজের চোখে দেখা মানুষ এবং এদের জীবনের সুখদুঃখ সরাসরি তাঁকে স্পর্শ করেছিল। শিলাইদহে এবং সাজাদপুরে জমিদারীর কাজে অবস্থানের সময় পল্লীবাংলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। এসব গল্প তারই ফলশ্রুতি। এর সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য :

"গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য শ্রেণীর ছোটগল্প লিখেছেন। আপাত-তুচ্ছ পল্লীবাংলার মানুষের ব্যক্তিসত্তার সুখ দুঃখের যে আলোড়ন—গল্পকার তাকে মমতার সাথে রূপায়িত করেছেন। 'অতিথি' ও 'শুভা' গল্প ব্যক্তিজীবনসত্য কেন্দ্রিক। কাবুলিওয়ালা ব্যক্তিজীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডী। আবার কিছু সংখ্যক গল্পে সমাজ মানসের প্রতিফলন থাকলেও এবং গল্পরসের হানি না ঘটলেও কেমন যেন তত্ত্বধর্মী হয়ে উঠেছে—যেমন 'স্বর্গমৃগ' ও 'গুপ্তধন'। গল্প দুটি যেন বলতে চায়—জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখের মধ্যেই চরম সার্থকতা, অপর কোন অলীক তৃষ্ণার মোহে লিপ্ত হলেই জীবনে সর্বনাশ আসন্ন হয়ে ওঠে। ছিন্নপত্রের একটা চিঠিতে কবি বলেছিলেন—অসংখ্য ঘাস যে রাতারাতি বটগাছ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে না। তাতেই প্রকৃতির রাজ্যে একটা সঙ্গতি ও শান্তি বজায় থাকছে। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প সমাজসমস্যামূলক। সমাজের নানা জটীল সঙ্কীর্ণ মনোভাব মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দেওয়ায় বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 'দেনা পাওনা' 'রাম কানাই এর নির্বুদ্ধিতা' এই জাতীয় গল্প। বাংলা দেশের সমাজে দাম্পত্য জীবনের সমস্যা অনেক সময়েই বেশ জটিল আবার যখনও বা মাধুর্য সমন্বিত। উক্ত বিষয়টি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ একাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। শেষের রাত্রি' 'প্রতিহিংসা' 'দুরাশা' নিশীথে' 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্প। পারিবারিক সম্পর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট জটিলতা কিছুসংখ্যক গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। 'নষ্টনীড় গল্পে দেবর ও ভ্রাতৃবধুর সম্পর্ক, 'রাজটীকা' গল্পে শালী ও ভগ্নীপতির সম্বন্ধ 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে শাশুড়ী ও পুত্রবধুর সম্পর্ক ছোটগল্পের শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই সব গল্পে মানবমনের রহস্যময় জটিলতা, সমাজমনের অমোঘ প্রতিফলন, সুখ দুঃখের সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। গল্পকারের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এইসব গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

'তিনসঙ্গীর' গল্পগুলি, এবং 'সে' গ্রন্থের গল্পসমষ্টি গল্পগুচ্ছের গল্প থেকে অনেকাংশেই পৃথক ধর্মসমন্বিত। রচনাকালের দিক থেকেও এগুলো গল্পকারের শেষজীবনে রচিত। কি ভাষাভঙ্গী, কি পরিবেশন কৌশল ও বিষয়বস্তু—সবদিক থেকেই এই সব গল্পে একটা স্বাতন্ত্র্যের ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ যুগে আরও গভীর মননশীলতা সমৃদ্ধ এবং দৃষ্টিভঙ্গীতেও আধুনিক। তাছাড় প্রথম জীবনের ভাবালুতা গম্ভীর অচঞ্চল চিন্তায় পর্যবসিত। তাই এই সব গল্পের রচনা বৈশিষ্ট্য অনেক পরিশীলিত, বাগ্ভঙ্গী তীক্ষ্ম, সরস ও নিপুণ। তিনসঙ্গীর গল্পগুলিতে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—প্রধান স্থানীয় চরিত্রগুলি সকলেই বৈজ্ঞানিক।

তাছাড়া যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং আলাপ আলোচনায় যে সব সূত্র উপস্থাপিত—সেগুলোও বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিষয়ক। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রমনে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় ফলে বিজ্ঞানপ্রিয়তায় উদ্ভব হয়েছিল—এই তিনটি গল্প তারই ফলশ্রুতি। 'রবিবার' ও 'ল্যাবরেটরি' গল্প দু'টিতে কলকাতার এক বিশেষ শিক্ষিত সমাজের অনুচিত্র পরিবেশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আলোচনায় অনেক প্রসঙ্গের সঙ্গে যেমন তার পরিবেশন কৌশল আলোচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়—তেমনি তাঁর তুলনারহিত ভাষার কথা আলোচনা না করলে সবকিছু যেন অসমাপ্ত থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে গদ্য ও কবিতায় কত না ভঙ্গীর অনুশীলন করেছেন। বিভিন্ন সুরে রচিত বিভিন্নধর্মী গদ্য আমাদের অন্তহীন বৈচিত্রের স্বাদ দিয়েছে। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর মত এমন ঐশ্বর্য্যশালী, লাবণ্যময় গদ্য তিনি অন্যত্র রচনা করেছেন কি?

> "হঠাৎ গুমোট ভাঙ্গিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরার কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।"

## ।। রবীন্দ্রযুগ : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ।।

পূর্ব পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে মোটামুটি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেজন্য উক্ত বিষয়টি এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল না। রবীন্দ্রযুগে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারও গল্প সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। এই ক্ষমতাকে তাঁর প্রতিভা বলে স্বীকার করতেই' হয়। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি শেষ পর্যন্ত এমন একটা মানে উন্নীত হয়েছিল যে, তাঁকে বাংলায় মোপাসাঁ বলা হত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিস্মৃত ও অবহেলিত হলেও তিনি যে একজন শক্তিশালী ও প্রতিভাবান কথাকার সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসংখ্যক গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথর মোট গল্প সংখ্যা ১১৯ এবং প্রভাতকুমারের গল্পসংখ্যা ১১৮। এযুগে একমাত্র বনফুল ব্যতীত এত বেশীসংখ্যক গল্প আর কোন সাহিত্যিক রচনা করেন নি। প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা মোট ১২। গ্রন্থগুলির প্রকাশ কাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১। নামগুলি এখানে উল্লেখ করা হ'ল— নবকথা', 'ষোড়শী' 'দেশী ও বিলাতী'; 'গল্পাঞ্জলি', 'গল্পবীথি' 'পুত্রপুষ্প', 'গহনার বাক্স' 'হতাশ প্রেমিক', 'বিলাসিনী', 'যুবকের প্রেম' 'নূতন বৌ', এবং 'জামাতা বাবাজী',।

প্রভাতকুমারের জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তাঁর জীবনের একটি বৃহৎ পর্যায় কেটেছিল বিহারে। তিনি ইউরোপেও গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এইসব অভিজ্ঞতার ছাপ নানাভাবে কথাসাহিত্যের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধিবিস্তার তাঁর দ্বারা সাধিত হয়েছিল। এযুগে অনুরূপ কাজ সতীনাথ ভাদুড়ী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও আরও অনেকেই করেছেন।

শরৎচন্দ্রের রচনা যদি চরিত্রপ্রধান এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প যদি ভাবপ্রধান হয়, তবে প্রভাত কুমারের রচনা কাহিনী বা আখ্যানপ্রধান বলে মানতেই হয়। জীবনের অনিবার্য জটিলতা ও গভীর সমস্যা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। জীবনের স্রোত যেখানে স্বাভাবিকভাবে বহমান, তিনি তার তরঙ্গভঙ্গের মাধুর্যকে ঠিক সেইভাবেই উপভোগ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত দৃষ্টিভঙ্গী ও মত-প্রকাশের বলিষ্ঠতা তাঁর ছিল না। তাই জীবনের সহজ সুখ দুঃখকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তার মাধুর্য ও বেদনাকে তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করেছিলেন। মনোভঙ্গীর দিক থেকে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী—সহসা কোথাও রুচি বা কোমলতার সীমা অতিক্রম করতেন না। যে সব গল্পে কিছু তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ হয়েছে সেখানে তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন।

তাঁর গল্পগুলিকে যে ফরাসী গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে ধরা হয়—তার কারণ এই যে, গঠনরীতির দিক থেকে তিনি ফরাসীভঙ্গীকেই অবলম্বন করেছেন। একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সরসতার গুণেই প্রভাত কুমারের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। 'রসময়ীর রসিকতা' একটি বিশিষ্ট গল্প যার মধ্যে গল্পকারের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গীটি পরিস্ফুট। অনন্যসাধারণ কুশলতায় তিনি এই গল্পে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ নিপুণতায় তিনি তার নিরসনও করেছেন। আমাদের দেশের পরিচিত জীবন-কেন্দ্রিক গল্প 'আদরিণী'র কারুণ্য সহজেই পাঠক-মনকে আবিষ্ট করে। 'বলবান জামাতা' গল্পকারের এক বহুপঠিত সরস গল্প। এ-জাতীয় কৌতুকপ্রধান গল্পের সংখ্যা প্রভাত-সাহিত্যে নিতান্ত স্বল্প নয়। 'প্রণয় পরিণাম', 'ধর্মের কল' প্রভৃতি সমশ্রেণীর গল্প। প্রভাত কুমারের কোন কোন গল্পে ব্যঙ্গ বা উপহাসের ভাব প্রকাশিত। এইসব গল্পে গল্পকার প্রধানতঃ সমাজের তথা-কথিত সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের হৃদয়হীনতা ও বলিষ্ঠতার অভাবকেই আঘাত করেছেন—তবে কোথাও নির্মম হয়ে ওঠেন নি।

## ॥ প্রমথ চৌধুরী ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চলিত ভাষার প্রধান প্রচারক হিসাবে প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল একটি উজ্জ্বল নাম এবং এই উজ্জ্বলতা তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভা ও জীবন-দর্শনকে কেন্দ্র করেই। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ সাহিত্য- সব দিকেই তাঁর কুশলতার প্রকাশ হয়েছিল। উনিও রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন। উচ্চাশিক্ষার আলো, আভিজাত্য-সৃষ্ট মানসিকতা ও অনন্য জীবনবোধ তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। তাঁর সাহিত্যিক মানসের উপাদান ছিল বলিষ্ঠতা, স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য এবং ভাবালুতা বিহীন বুদ্ধিদীপ্ত এক তীক্ষ্ণ জীবনচেতনা।

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম গল্প 'ফুলদানী'। তৎকালীন সমালোচকবৃন্দ এই গল্পে প্রকাশিত নৈতিক মনকে মেনে নিতে পারেন নি। পরে প্রকাশিত হয় একে একে 'চার-ইয়ারী কথা' ( ১৯১৬ ), 'নীললোহিত' ( ১৯৩২ ), 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭ ) এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ 'গল্প সংকলন' ( ১৯৫১ )। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে একটা মজলিশী ভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক গল্পেই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তা এবং অপর সকলে শ্রোতা। এই রীতির ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখো পাধ্যায়ের বেশ মিল আছে। তবে পার্থক্য এই যে, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রাম্য পরিবেশের পরিবর্তে বীরবলে আমরা নাগরিক বাতাবরণ দেখতে পাই। বাক্‌চাতুর্য্য, বৌদ্ধিক দীপ্তি, জ্ঞানময়তা প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট রচনাগুণ। প্রমথ চৌধুরীর অনেক গল্পে তীব্র সৌন্দর্যতৃষ্ণার কথা আছে—যথা 'প্রবাস স্মৃতি'। তাঁর 'চারইয়ারী কথা' গল্প গ্রন্থের কাহিনীর ভিত্তিভূমি ইংলণ্ড। বিদেশী পরিবেশে বিদেশী মানুষদের মধ্যে যে সহৃদয়তা—তিনি তাকেই প্রকাশ করেছেন মাধুর্য সহকারে। প্রেমই গল্পগুলির প্রধান উপজীব্য। প্রমথ চৌধুরী ভাবাবেগ-জর্জর বাংলাদেশে একটি স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ঋজু মননের ধারা প্রবাহিত করে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

## ॥ আধুনিক গল্পকারগণ ॥

বাংলা ছোটগল্পে আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। বিংশ শতকীয় জীবনের নবীন ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বারা এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী বিশেষভাবে প্রভাবিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তার সঞ্চারণের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। রাজনৈতিক মতবাদে সমাজবাদের চিন্তাধারা এবং নরনারীর চিরাচরিত সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব এঁদের ওপর

বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারের পথ থেকে তাই তাঁরা বেশ সচেতনভাবে সরে এসে একটি মনোভাব ও আদর্শসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শৈলজানন্দ এমন সমাজের মানুষদের নিজের সাহিত্যের অবলম্বন করে তুললেন যাঁরা এতদিন যাবৎ সমাজে অবহেলিত হওয়ায় ব্রাত্যের জীবনযাপন করছিলেন। এই পথেই শৈলজানন্দ দ্রুত খ্যাতিলাভ করলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সমাজের বৃহত্তর জীবনের দিকে তাঁর বিশেষ দরদভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র উচ্চাঙ্গের গঠন-শৈল ও উপস্থাপনা রীতি এবং বৌদ্ধিক ঔজ্জ্বল্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন।

সামান্য পরের দিকে আবির্ভাব ঘটল সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বনফুল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা কথা-শিল্পীদের। এযুগের অন্যতম শক্তিশালী কথাশিল্পী সমরেশ বসুর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই প্রতিভাবান এবং বাংলা সাহিত্যে সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যকে এঁরা যে পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন, সংক্ষেপে তার সম্যক্ পরিচয় দান অসম্ভব বলেই কেবলমাত্র তাঁদের নাম উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

# ॥ উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ॥

## ॥ বাংলা শব্দ সম্পদ ॥

বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় এই ভাষার উৎস এবং তার উৎপত্তির কাল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার গঠনে আর্য ও অনার্য উভয় প্রভাবই দেখা যায়। অষ্ট্রিয়, মঙ্গোলীয় বা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর আদি ভাষাপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রধানতঃ প্রাকৃতকেই উৎস হিসাবে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে এই ভাষা পরিবর্তনের স্তর ধরে অগ্রসর হয়েছে। উৎসটিকে প্রামাণ্য বলে গণ্য করলে এই ভাষার ইতিহাস মোটামুটি হাজার বছরের। আমরা জানি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অনুসারে প্রাকৃত ভাষাও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, এই বিভাগ হচ্ছে শৌরসেনী, মাগধী, মহারাষ্ট্রী ও পৈশাচী। শৌরসেনী ও মাগধী পূর্বী প্রাকৃত নামেও পরিচিত। তবে মাগধী ছিল অশিক্ষিত ইতরজনের ব্যবহৃত ভাষা। পরে শিক্ষিতজনেরা তাঁহাদের সাহিত্যকর্মে শৌরসেনী অপভ্রংশ ব্যবহার করতেন। আর অর্ধ মাগধী ব্যবহৃত হ'ত প্রধানতঃ জৈনগণের রচনায়। অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ও ভারবহনক্ষম ভাষা হিসাবে শৌরসেনী অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামীর মতে—

"মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষার অভ্যন্তর অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষারূপে বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাটি, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, সিন্ধী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ঘটিল।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাদেশিক ভাষা বাংলা প্রধানতঃ প্রাকৃতজ এবং এই ভাষা উৎস হচ্ছে শৌরসেনী প্রাকৃত। অবশ্য, অপর অপভ্রংশ ভাষা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষা হিসাবে কিছু পরিমাণে পূর্ব ভারতে প্রচলিত থাকায় এই ভাষার কিছু শব্দ বাংলার মধ্যে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠে 'কীর্তিলতা' রচনা করেছিলেন।

হাজার বছর পূর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় চর্য্যাপদের মধ্যে। চর্য্যাপদের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। পুনরুক্তির সম্ভাবনায় তাই অনুরূপ অলোচনায় বিরত থাকছি। এই চর্য্যাপদের রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতক হলে বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরের মত।

রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যে কোন দেশেরই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রূপান্তরের ধারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে যখন হিন্দু যুগ ও হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, মুসলমান যুগ, ইংরাজ যুগ ইত্যাদি বিবিধ রাজনৈতিক কালপ্রভাবের

মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল—তখন স্বভাবতঃই সেইসব সভ্যতার ভাষাভিত্তিক প্রভাব আমাদের ভাষার উপর পড়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। পৃথিবীর যে ভাষার যত বেশী বিজাতীয় প্রভাব পড়ে, সেই ভাষার সর্বাঙ্গীন পুষ্টি ঠিক সেই পরিমাণেই সাধিত হয়। একারণেই ইংরেজী বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা এবং এই ভাষাটি পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে নির্বিচারে ও নির্দ্বিধায় প্রভূত সংখ্যক শব্দ আত্মস্থ করে এক আদর্শস্থানীয় পুষ্টিলাভ করেছে। বর্তমান যুগের বাংলা শব্দ সংগ্রহও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমায় ক্ষতি যাই হোক না কেন, ভাষাপুষ্টিই আমাদের চরম লাভ। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা' এবং এ যুগের নজরুল ইসলাম এবং সৈয়দ মুজতবা আলির রচনাবৈশিষ্ট্য ও ব্যবহৃত শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ সত্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

আধুনিক যুগের বাংলা ভাষায় শব্দভাণ্ডার কমবেশী প্রায় সত্তর হাজার শব্দ সমন্বয়ে গঠিত। এর অধিকাংশই তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ। তবে বৈশিষ্ট্যের বিচারে প্রকৃত বাংলা হিসাবে আমরা তদ্ভব শব্দগুলিকে গ্রহণ করতে পারি। কারণ, বাংলা ভাষার নিজস্ব ধরণ-ধারণ তদ্ভব শব্দের সাহায্যেই সমধিক প্রকাশযোগ্য। বিদেশী সভ্যতার দীর্ঘকালীন সংস্পর্শে থাকায় অসংখ্য বিদেশী শব্দ বাংলা অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এইসব বিদেশী শব্দের মধ্যে ইংরেজী ও আরবী-ফারসী অন্যান্য বিদেশী শব্দের তুলনায় অনেক বেশী।

বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা যেতে পারে:— (১) তৎসম. (২) তদ্ভব, (৩) দেশী, (৪) বিদেশী এবং (৫) মিশ্র। সংক্ষেপে এগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

১। **তৎসম**—পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলায় তৎসম শব্দের সংখ্যাই সর্বাধিক। পূর্ব ভারতীয় সকল ভাষা যথা, বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, নেপালী প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রজোয্য। সরাসরি সংস্কৃত থেকে যে সব শব্দ অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে সেগুলিই 'তৎসম' নামে পরিচিত। এই সব শব্দের বিপুল সংখ্যক অবস্থিতিই বাংলাকে এত মিষ্ট এবং ধ্বনিগম্ভীর ভাষায় পরিণত করেছে।

উদাহরণ—কৃষ্ণ, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, অন্ন ইত্যাদি।

আর কিছু সংখ্যক শব্দ রয়েছে যেগুলি পরিবর্তিত হতে গিয়ে কিঞ্চিৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেইরূপেই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। পরিবর্তন সামান্য বলে সংস্কৃতের সঙ্গেই শব্দগুলির সাদৃশ্য বেশী। উদাহরণ:—

কৃষ্ণ>কেষ্ট। সূর্য্য>সুয্যি। মিথ্যা>মিথ্যে। চন্দ্র>চন্দর।

২। **তদ্ভব শব্দ**—সংস্কৃত ভাষার শব্দ সম্পদ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত

হতে হতে ক্রমে একটা নির্দিষ্ট রূপলাভ করেছে এবং বাংলা ভাষার মধ্যে স্থানলাভ করেছে। সংস্কৃত থেকে জাত বলে এর নাম 'তদ্ভব'। এর আর একটি নাম 'প্রাকৃতজ'।

উদাহরণ

| সংস্কৃত | | প্রাকৃত | | তদ্ভব |
|---|---|---|---|---|
| কৃষ্ণ | > | কণ্‌হ | > | কানু |
| পুস্তক | > | পোত্থিআ | > | পুথি/পুঁথি |
| হস্ত | > | হত্থ | > | হাত |
| কার্য্য | > | কজ্জ | > | কাজ |
| রাজ্ঞিকা | > | রন্নিআ | > | রাণী |

৩। **দেশী** – ভাষা ও সংস্কৃতির জগতে উচ্চনীচ উভয়বিধ, সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাব অনিবার্য। এভাবেই বহু অনার্য শব্দ আর্যভাষার মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছিল। বাংলা শব্দ ভাণ্ডার প্রধানতঃ সংস্কৃতকে ভিত্তি করে গঠিত হলেও কিছু আদি শব্দ এর অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। এত পরিবর্তনের যুগেও সেগুলো অবিকৃত থেকে গেছে। এই শব্দ-গুচ্ছই দেশী শব্দ হিসাবে পরিচিত। বৈয়াকরণিকরা অধিকাংশ স্থলেই এগুলির বুৎপত্তি নির্ণয়ে সক্ষম হননি। যথা – ডাব, ডাহা, ডাঁসা, ঢোল, ঢেঁকি, কুলো, ঝাঁটা ইত্যাদি।

৪। **বিদেশী** – ভারতে নানা সময়ে নানা সভ্যতার আগমন হয়েছে। সেইসব সভ্যতা-অন্তভু ক্ত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে অনিবার্য কারণেই বেশ কিছু সংখ্যক শব্দ বাংলার মধ্যে গৃহীত হয়েছে। এগুলোই বিদেশী শব্দ। উল্লেখযোগ্য ভাষা-উৎস হচ্ছে ইংরাজী, আরবী, ফারসী, চীনা, পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ। এদের মধ্যে ইংরাজী, আরবী ও ফারসী শব্দের সংখ্যাই সর্বাধিক। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল :

ইংরাজী – চেয়ার, টেবিল, স্কুল, সার্ট, প্যাণ্ট, ট্রেণ, কোর্ট, কলেজ, হোটেল ফটো, টেলিগ্রাফ, থিয়েটার।

ফারসী – (ক) রাজদরবার ও যুদ্ধবিষয়ক – মালিক, হুজুর, শিকার, তোপ, দুশমন বেতার, দরবার।

(খ) আইন আদালত সংক্রান্ত – তালুক, দপ্তর, পিয়াদা, মোকদ্দমা, বাজেয়াপ্ত সনাক্ত, সালিশ, আদালত, কানুন।

(গ) ধর্মবিষয়ক – কোরবাণী, জুম্মা, দরবেশ, ইমাম, কবর, মোল্লা, দোয়া।

(ঘ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি - বেআদব, কেচ্ছা, এলেম, সহবৎ, সেতার।

(ঙ) প্রসাধন বিষয়ক – আয়না, আতর, গোলাপ, পাজামা, রোশনাই।

(চ) দৈনন্দিন জীবন – চাকর, খোরাক, খবর, হপ্তা, হুজুগ, আবহাওয়া।

আরবী শব্দ—আইন, কেতাব, তাজ্জব, নমাজ, খুন, মুহুরী, জিলা, জবাব, খাজনা।

চীনা শব্দ—চা, চিনি,

ওলন্দাজ শব্দ—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ।

পর্তুগীজ শব্দ—আলমারি, বালতি, আনারস, আলপিন, পেঁপে, সাবান, তামাক, তোয়ালে, বোমা, পিস্তল, পাঁউরুটি।

৫। **মিশ্র শব্দ (Hybrid)**—দীর্ঘদিনের প্রভাবের ফলে এমন কিছু সংখ্যক বাংলা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে যেগুলির প্রধান ও অপ্রধান অংশ হয় বাংলা ও বিদেশী, না হলে বিদেশী ও বাংলা। বিদেশী শব্দ সহযোগে যেমন নতুন বাংলা শব্দের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি বিদেশী প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ দেওয়া হল—

(ক) বিদেশী প্রত্যয় ব্যবহারে গঠিত শব্দ—

দার—বাজনদার, ঝাড়ুদার, দোকানদার।

গিরি—মাষ্টারীগিরি, বাবুগিরি, বামুনগিরি।

খোর—গাঁজাখোর, ঘুষখোর।

ওয়ান—দ্বারোয়ান, গাড়োয়ান।

ওয়ালা—ফেরিওয়ালা, নকশাওয়ালা, বাড়ীওয়ালা।

(খ) বিদেশী শব্দ ও বাংলা প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ—

শহুরে, বেহায়াপনা, ফকিরালি ইত্যাদি।

(গ) বিদেশী শব্দ এবং দেশী শব্দের মিশ্রণজাত শব্দ—

হেড+পণ্ডিত=হেডপণ্ডিত। হাফ+হাতা=হাফহাতা।

ডাক্তার+বাবু=ডাক্তারবাবু। টিকিট+ঘর=টিকিটঘর।

(ঘ) বিদেশী ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণে—

জিলা+বোর্ড=জিলাবোর্ড। প্রাইমারী+স্কুল=প্রাইমারীস্কুল।

হেড+মাষ্টার=হেডমাষ্টার। ফুল+সার্ট=ফুলসার্ট।

পুলিস+সাহেব=পুলিসসাহেব।

## ॥ বাংলা বর্ণের উচ্চারণ বৈচিত্র্য ॥
## ॥ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা ।

### ॥ স্বরধ্বনি ॥

বাংলা বর্ণমালাকে মোট দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরবর্ণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের

উচ্চারণে স্বরবর্ণের সহযোগিতা অপরিহার্য। অপরপক্ষে ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অনুসারে স্বরবর্ণের উচ্চারণে স্ব-নির্ভরতার বিষয়টি আমরা ভালভাবেই জানি। তাই স্বরবর্ণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—যা স্বতঃই উচ্চারিত হতে পারে—তাই হচ্ছে স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চারণ নানা কারণে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন যেমন প্রত্যেক শ্রেণীর স্বক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় তেমনি পারস্পরিক প্রভাবেও হতে পারে।

ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তনের মূলে অসংখ্য বিষয় রয়েছে। ভাষা যেহেতু জীবন-কেন্দ্রিক, সেজন্যই পরিবর্তনশীল। কারণ, সজীবতা, চাঞ্চল্য ও নতুনত্বের চর্চা জীবনেরই ধর্ম। জীবনের ভৌগোলিক অবস্থানও ঠিক এককেন্দ্রিক নয়। সেজন্য বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব দৈহিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রভাবকে সম্ভব করে তোলে। কথা বলায় বিবিধ ঢঙ সংস্কৃতিগত ও স্থানগত সত্য প্রভাবিত। কখনও বা বিশেষ কালের প্রভাবও দেখা যায়। সাধারণ কথাবার্তা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, পুস্তক-পাঠ, ভাবের অনুরূপ আদান প্রদান ইত্যাদি বিবিধ মানবিক প্রক্রিয়াগুলির ধরণ-ধারণ ভিন্নধর্মী। কার্যাবলীর চরিত্র-পার্থক্যহেতু শব্দ ও বর্ণের উচ্চারণের মধ্যে তারতম্য লক্ষিত হয়। সাধারণভাবে আর কয়েকটি কারণের কথাও আমাদের মনে হতে পারে। বিভিন্ন বয়সের মানুষের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। তাছাড়া শিক্ষা ও অশিক্ষাও স্বাতন্ত্রধর্মী উচ্চারণের উৎপাদক। শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তির উচ্চারণ এবং গ্রাম ও শহরের উচ্চারণে সমানতা আশা করা যায় না। উচ্চারণ পার্থক্যের মূলে দৈহিক বৈশিষ্ট্যও থাকে।

এক ভাষার উপর পার্শ্ববর্তী অপর ভাষার উচ্চারণগত প্রভাবসৃষ্টি খুবই সাধারণ ঘটনা। প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গী থাকলেও কোন শক্তিশালী সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার উচ্চারণ ও শব্দ সংক্রান্ত প্রভাবের সংক্রমণ স্বাভাবিক। এর মূলে একটি সামাজিক মূল্যবোধের মনোভাব ক্রিয়াশীল থাকে। ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে কোন ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তবে, অতীতে যেসব পরিবর্তনের বিষয়গুলি ঘটেছে তার একটা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া অবশ্যই সম্ভব।

বাংলা স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে—এগুলি প্রধানতঃ দু'শ্রেণীর। 'ঌ' (লি)কে বাদ দিলে ( ব্যবহার না থাকায় অপ্রচলিত বলে গণ্য এবং স্বাভাবিক ভাবেই বর্জিত ) স্বরবর্ণের মোট সংখ্যা এগারটি। শ্রেণীবিভাগ করলে মৌলিক ও যৌগিক এই দুরকমের স্বরধ্বনি পাই। 'অ' 'ই' 'উ' ইত্যাদি মৌলিক স্বরধ্বনি এবং 'ঔ' 'ঐ' যৌগিক স্বরধ্বনি। 'ঔ' ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে আমরা পাই অ+উ এবং 'ঐ' ধ্বনি বিশ্লেষণে ও+ই এই দুটি মৌলিক স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। লিখিত বাংলা ভাষায় এই দুটি রূপেরই ব্যবহার প্রচলিত আছে, যদিও উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। কবিতা

আবৃত্তির সময় অবশ্য 'ঐ' বা 'ওই' এর স্থান বিশেষে বিলম্বিত উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়, যথা :—

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে—বর্ষামঙ্গল

এখানে 'ঐ' উচ্চারণ বিলম্বিত লয়ে হওয়াই কাম্য, কারণ, বর্ষা-মেঘের সাড়ম্বর, সুন্দর-গম্ভীর মন্থর গমনটি ব্যঞ্জিত করাই কবির উদ্দিষ্ট। অনুরূপভাবে 'সৌরভ' শব্দটির অন্তবর্তী 'ঔ' ধ্বনিও দীর্ঘ উচ্চারণযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার, ক্ষেত্র বিশেষে কোথাও বা যুগ্ম-স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারণের পরিবর্তে হ্রস্ব উচ্চারণের ধর্মকেই অনুসরণ করে যথা—গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ/আমার মন ভুলায় রে' পংক্তির অন্তর্গত 'ঐ' হ্রস্ব উচ্চারণ সমন্বিত।

ই-ঈ—সাধারণ ভাবে 'ই' ও 'ঈ' এই দুটি স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্য মেনে চলা হয় না। তাই বানানের ক্ষেত্রে এদের পৃথক ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও এই পার্থক্য কার্যকরী হয় না। কিন্তু, বিস্ময়ের বিষয় এই যে ব্যবহারের বৈচিত্র সম্পাদনে 'ই' ধ্বনি কখনও কখনও 'ঈ' এর মত রূপধারণ করে; যেমন 'তুমিই ত একাজ করেছিলে'—এখানে 'তুমিই' শব্দের 'ই' অবশ্যই 'ঈ' এর মত উচ্চারিত হবে। 'কি' কথাটি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ক্ষেত্রবিশেষে 'কী' লিখতে শুরু করেন। তার ফলে ভাবপ্রকাশেও অনেক পরিমাণে নাট্যধর্মিতার ভাব পরিস্ফুট হয়।

(ক) 'এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
হে কৌরব ?—গান্ধারীর আবেদন

(খ) 'কী দিবে তোমারে ধর্ম ?'—ঐ

দুটি উদ্ধৃতির 'কি' ও 'কী' উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই পৃথক গুণান্বিত।

অ—'অ' ধ্বনির দুটি উচ্চারণই আমরা পাই—স্বাভাবিক ও বিকৃত। দুটি রীতিই প্রচলিত আছে। 'অতুলনীয়' শব্দের 'অ' এর উচ্চারণ স্বাভাবিক এবং 'অম্লান' শব্দের 'অ' চলিত ভাষায় 'ও' এর মত উচ্চারিত কিন্তু কবিতায় থাকলে 'অ' এর মত।

আ—বর্ণ বৈশিষ্ট্যে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হ্রস্ব কবিতায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুটি উচ্চারণই ব্যবহৃত :—

"সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।"—আহ্বান (পূরবী)

উদ্ধৃতিটির মধ্যে দ্বিতীয় পংক্তির 'যাই' শব্দের 'আ' হ্রস্ব এবং তৃতীয় পংক্তির 'হারায়ে' শব্দের 'রা' এর 'আ' অবশ্যই বিলম্বিত উচ্চারণ যুক্ত।

এবার স্বরধ্বনির পরিবর্তনের অপর দিকগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

## ॥ শ্রুতিধ্বনি ( Vowel Glide ) ॥

বাংলা ভাষার কথাবার্তা, বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তির সময় শ্রুতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। পরস্পর সন্নিবিষ্ট দুটি স্বরধ্বনি মিলে যৌগিক স্বরধ্বনিতে পরিণত না হয়ে অর্ধস্বরে রূপান্তরিত হলে (য়, ও) এই প্রক্রিয়াকে শ্রুতিধ্বনি বলে। সাধারণতঃ উচ্চারণেব দ্রুততার জন্য এমন হয়। এই শ্রুতিধ্বনি দুরকমের—'য়' শ্রুতি' এবং 'ব' শ্রুতি।

'য়' শ্রুতি -

কে এলো ? =কে য়েলো ? মা আমার= মা য়ামার।

গো পাল>গো আল>গোয়াল।

মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় বানানের অনেকগুলি 'য়' শ্রুতি প্রভাবে নতুন রূপ পরিগ্রহ কবেছে।

'ব' শ্রুতি

ধো আ>ধোওয়া। খা আ>খাওয়া।

পি আনো>পিয়ানো।। শূকর>শূয়র।

### স্বরাগম ( Prothesis )

শব্দেব প্রাবম্ভে উচ্চাবণেব স্ববিধাব জন্য যুক্তব্যঞ্জনেব পূর্বে স্বরধ্বনির ব্যবহাবকে স্ববাগম বলে।

স্কুল>ইস্কুল। স্ত্রী>ইস্ত্রী। স্পষ্ট>এসপষ্ট। ষ্টেশন<ইষ্টিশান।

### স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ ( Anaptyxis )

উচ্চারণকে মধুর করার জন্য যুক্তব্যঞ্জনকে স্বরের আগম দ্বারা দীর্ঘায়িত করার প্রক্রিয়াকে বলে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। 'অ' 'ই', 'ও', 'এ' প্রভৃতি বিবিধ স্বরের আগম দেখা যায়। উদাহরণগুলি শ্রেণী অনুসারে বিন্যস্ত হল—

অকারের আগমন

কর্ম>করম। ধর্ম>ধরম। জন্ম>জনম। পূর্ব>পূরব।

ব্যবহার—

জনম জনম হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।" - বিদ্যাপতি

ই-কারের আগম—

স্নান<সিনান। শ্রী>ছিরি। মিত্র>মিত্তির। ক্লিপ>কিলিপ।

উ-কারের আগম -

মুক্তা>মুকুতা। বামন>বামুন। দুর্যোগ>দুরুযোগ। পুত্র>পুত্তুর।

এ-কারের আগম—

গ্রাম>গেরাম। প্রাণ>পেরাণ গ্লাস>গেলাস। শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ

ও—কারের আগম –

শ্লোক>শোলোক।

## স্বরসঙ্গতি ( Vowel Harmony )

বিষয়টির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, এটি সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য বিধানের প্রশ্ন। উচ্চারণ বৈচিত্র বা সরলতা সম্পাদনের জন্য শব্দ মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির পারস্পরিক প্রভাবে সাদৃশ্যবাচক স্বরধ্বনির ব্যবহার হয়। তবে স্বরসঙ্গতির বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ চলিত বাংলার ক্ষেত্রেই বেশী দেখা যায়। ব্যাকরণের সূক্ষ্ম রীতিনীতিকে অস্বীকার করাই হ'ল চলিত ভাষায় প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বরসঙ্গতি তারই ফল।

(ক) পরবর্তী অক্ষরে 'আ' থাকলে 'ই' কার 'এ' কারে রূপান্তরিত হয়।

বিড়াল>বেড়াল। শিয়াল>শেয়াল। জিলা>জেলা।

(খ) 'এ' কারের বিকৃত উচ্চারণের প্রভাব –

দেখে>দ্যাখে। একে একে>এ্যাকে এ্যাকে।

(গ) 'ই' কারের প্রভাবে 'এ' কারের 'ই' কারে রূপান্তর –

দেশী>দিশি। দেই>দিই

(ঘ) পরবর্তী 'ই' বা 'উ' এর প্রভাবে 'ও' ধ্বনি – 'উ' তে পরিবর্তিত হয় –

পুরোহিত>পুরুত। পোষ্য>পুষ্যি।

(ঙ) অন্ত্যধ্বনি 'ই' বা 'ঈ' হলে শব্দ মধ্যস্থ 'অ' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।

তেন্তলী>তেঁতুল। উড়ানী>উড়ুনী। শেফালিকা>শিউলী। এখনি>এখুনি।

(চ) শব্দের আদিতে 'ই' কার থাকলে, শব্দমধ্যস্থ 'আ' কার 'এ' কারে পরিবর্তিত হয়।

বিকাল>বিকেল। ভিক্ষা>ভিক্ষে। বিলাত>বিলেত। মিথ্যা>মিথ্যে।

(ছ) শব্দের আদিতে 'উ' বা 'ঊ' থাকলে শব্দের পরবর্তী 'আ' কার 'ও' কারে রূপান্তরিত হয়।

পূজা>পূজো। মূলা>মূলো। ছুতার>ছুতোর। কুমার>কুমোর।

## অপিনিহিতি ( Epenthesis )

শব্দমধ্যস্থ 'ই' কার বা 'উ' কার যথাস্থানে উচ্চারণের পূর্বেই উচ্চারিত হওয়ার নাম অপিনিহিতি। অপিনিহিতি পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার এক বৈশিষ্ট্য।

রাখিয়া>রাইখ্যা। করিয়া>কইর্যা কাল>কাইল। আজ>আইজ

শুনিয়া>শুইন্যা। নারায়ণ>নারাইণ্যা

## অভিশ্রুতি ( Umlaut )

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ভাষায় যেমন অপিনিহিতি, পশ্চিম বাংলায় চলিত ভাষায় তেমনি অভিশ্রুতির আধিক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ এই রীতি অনুসারে ক্রিয়াপদ গুলির ব্যবহারিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়। একজন ভাষাতাত্ত্বিক এই প্রক্রিয়াকে 'আভ্যন্তর সন্ধি' বলেছেন।

করিয়া>কইর‍্যা>ক'রে। রাখিও>রাইখ্যো>রেখো।

করিয়াছি>কইর‍্যাছি>করেছি। শহরিয়া>শহুরে ইত্যাদি।

## স্বরলোপ

প্রবল শ্বাসাঘাত হেতু শব্দের আদি মধ্য অংশের স্বরধ্বনির লোপ হয়।

অভ্যন্তর>ভিতর। উদ্ধার>ধার। অলাবু>লাউ। উডুম্বুর>ডুমুর।

## ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

পারস্পরিক প্রভাবের ফলে স্বরধ্বনির মধ্যে পরিবর্তন যেমন স্বাভাবিক, ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এরূপ প্রধানস্থানীয় কয়েকটি পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হল।

## সমীভবন ( Assimilation )

দুটি অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে উচ্চারণের সময় একটি অপরটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে সমীভবন বলে। সমীভবন তিন শ্রেণীর—

(ক) প্রগত ( Progressive ) (খ) পরাগত ( Regressive ) এবং (গ) অন্যোন্য (Mutual )।

### প্রগত সমীভবন ( Progressive Assimilation )

ব্যঞ্জন ধ্বনিসাম্য পূর্ববর্তী ধ্বনিপ্রভাবে সাধিত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে।

পক্ব>পক্ক। বিল্ব>বিল্ল। বৃহস্পতিবার>বিষ্যুদবার। পদ্ম>পদ্দ।

### পরাগত সমীভবন ( Regressive Assimilation )

পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে।

ধর্ম>ধম্ম। কর্ম>কম্‌ম। পাঁচসের>পাঁশসের। সৎ+জন>সজ্জন।

### অন্যোন্য সমীভবন ( Mutual Assimilation )

দুটি ব্যঞ্জনের প্রভাবে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনির উদ্ভব হলে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

উৎ+শ্বাস>উচ্ছ্বাস। উৎ+শৃঙ্খল>উচ্ছৃঙ্খল।

### মহাপ্রাণতা ( Aspiration )

অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণের মত উচ্চারিত হলে তাকেই মহাপ্রাণতা বলে।

পুকুর>পুখুর। কাঁটাল>কাঁঠাল। নিবানো>নিভানো।

### ঘোষীভবন ( Vocalisation )

অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হওয়ার নাম ঘোষীভবন।

কাক>কাগ। শাক>শাগ। ধোপা>ধোবা।

ডাকঘর<ডাগঘর। বাক্‌বিতণ্ডা>বাগবিতণ্ডা। অগ্রহায়ন>অঘ্রাণ।

### ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব ( Doubling of Consonant )

জোর দিয়ে কথা বলার সময় স্বভাবতই আমরা একটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাধান্য দিই এবং তার ফলে ব্যঞ্জনটি দুবার উচ্চারিত হয়।

বড়>বড্ড। ছোট>ছোট্ট। সবাই>সব্বাই।

### নাসিক্য ভবন ( Nasalisation )

ঙ ঞ, ন; ণ, ম এই নাসিক্য ব্যাঞ্জনগুলির উচ্চারণকালে যদি লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে তোলে তবে তাকে বলা হয় নাসিক্যভবন। যেমন সন্ধ্যা>সাঁঝ। চন্দ্র>চাঁদ। বন্ধ>বাঁধ। কানা>কাঁনা।

## ॥ বাংলা শব্দার্থতত্ত্ব ( Semantics ) ॥

মানুষের জীবন ও ভাষা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। পরিবর্তনশীলতা জীবনের অন্যতম প্রধান বলে তার প্রভাবটুকু ভাষার মধ্যেও ধরা পড়ে। এই পরিবর্তন যে শুধু বর্ণের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য বা শব্দের আকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। দিন যত এগিয়ে চলে, কিছুসংখ্যক শব্দ, ততই অর্থ পরিবর্তনের নানা চিহ্নকে বহন করে চলে। একটি ভাষা একটি জাতির জীবনকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকলেও জাতীয় জীবনে অন্যবিধ ভাষায় প্রচলন ও প্রভাবও বাস্তব কারণে অবশ্য স্বীকার্য সত্য হয়ে দেখা দেয়। আর এর অনিবার্য প্রতিফলন দেখা দেয় মূলভাষার নানা অঙ্গে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের পরিধিও ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। তারফলে কোন ভাষার নির্দিষ্ট প্রভাবশালী শব্দ, বাক্যাংশ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্যগঠন-রীতির প্রভাব অন্যভাষার মধ্যে সংক্রামিত হয়। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ যত বেশী বেড়েছে শব্দার্থগত প্রভাবও তত বেড়েছে। এইভাবে অর্থের মধ্যে নানা নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

একই সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে শব্দের অর্থের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। আমরা দেখতে পাই কখনও অর্থের প্রসার ঘটেছে। কখনও বা অর্থ সঙ্কুচিত বা নিম্নমানগামী হয়েছে। শব্দের অর্থ পরিবর্তন কোন একটি কারণ দ্বারা হয় না। বস্তুতঃ মানুষের জীবনের নানাবিধ মানসিক ও সমাজ-

কেন্দ্রিক বৈচিত্র অর্থপবিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে অনুরূপ কতকগুলি কারণ উল্লেখ কবা হ'ল।

(১) জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক ধারার পরিবর্তন।
(২) ভাষায় উপর অন্যভাষার প্রভাব।
(৩) আলঙ্কারিক প্রয়োগধর্মিতাব বাহুল্য।
(৪) ভাষায় কালানুক্রমিক ক্রমবির্তনের প্রভাব।
(৫) ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণ ইত্যাদি।

শব্দের অর্থপরিবর্তনে মানসিকতার বিশিষ্টতার কথা পূর্বেই উল্লেখিত হযেছে। উর্দু ভাষায় এবং জাপানী ভাষায় শিষ্টাচার বাচক শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে অর্থের বিশিষ্টতার কথাই সবচেয়ে বড। উর্দুতে নিজের বাডীর উল্লেখ করতে 'গরীবখানা' এবং অতিথি অভ্যাগতেব বাডীর বিষযে বলতে গিয়ে 'দৌলতখানা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বাংলাতে ব্যঙ্গার্থে এবং লক্ষ্যার্থে অনেক শব্দের বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। অসংখ্য বাগ্ধারা ও প্রবচনে এইসব বিশিষ্টতাব নিদর্শন বয়েছে। 'টাকাটা জলে গেল' বলতে আর্থিক লোকসাননেই বোঝান হচ্ছে। 'নেডা ক'বার বেলতলায় যায় ?' বলতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে জড়িত হয়ে পডা সম্পর্কে সতর্কতা বোঝাচ্ছে। আমরা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পরিচায়ক শব্দ হিসাবে 'মাথামোটা' শব্দটি ব্যবহার করি।

সাধারণ সামাজিক সংস্কার মানুষকে খুবই প্রভাবিত করে। বলাৎবাহুল্য এগুলো সবই কুসংস্কার। এব মানসিক প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে মুক্ত হতে গিয়ে আমরা অমঙ্গলসূচক ঘটনা বা প্রসঙ্গেব উপস্থাপনা বা বর্ণনাকে ঠিক বিপরীতধর্মিতার সঙ্গে প্রকাশ করি। প্রধানতম খাদ্য চাল ফুরিয়ে যাওয়া পারিবারিক জীবনে অকল্যাণকর বলে, আমরা বিষয়টিকে 'আজ চাল বাড়ন্ত'—এইভাবে প্রকাশ করি। এখানে 'বাড়ন্ত' শব্দটি কল্যাণসূচক এবং অভাবজনিত শঙ্কার প্রতিষেধক। 'মৃত্যু' কথাটি সরাসরি না বলে আমরা আনুষ্ঠানিক প্রকাশভঙ্গী হিসাবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্ত' বা গঙ্গাপ্রাপ্তি' কথা দুটি ব্যবহার করি। অনুরূপ অন্য শব্দও অবশ্য একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলায় 'আ' প্রত্যয়যোগে অর্থের পরিবর্তন ঘটান যায়। যথা—ভাত—ভাতা এবং ছাত—ছাতা ইত্যাদি।

কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের সত্য তাঁর ভাষার নানা অঙ্গে ইতস্ততঃ ছডিয়ে থাকে। প্রাচীনকালে অতিথির আর একটি নাম ছিল 'গোঘ্ন'; শব্দটির মৌল অর্থ ছিল 'নিহত গোশাবকের মাংসে যার পরিতুষ্টি সম্পাদন কবা হয়। সংস্কৃতে 'দুহিতৃ' শব্দ থেকে 'দুহিতা' শব্দটি এসেছে। অতীতে কন্যাই গোদোহন কার্যে নিযুক্ত থাকত। পরে দুহিতা অর্থে সাধারণ কন্যাকেই বোঝায়। 'গবাক্ষ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ

'গোরুর চোখ'। প্রাচীন জীবনধারায় গোরুর চোখের মত স্বল্প পরিসরের বায়ু চলাচলের পথ রাখা হ'ত। এবং সেকারণেই জানালা বোঝাতে গবাক্ষ কথাটি এখনও ব্যবহার করা হয়।

শব্দের অর্থ পরিবর্তনের বিষয়টিকে মোট পাচটি বিভাগে ভাগ করে দেখান যেতে পারে :—

(১) অর্থের প্রসার (২) অর্থের সঙ্কোচন (৩) অর্থ-সংশ্লেষ (৪) অর্থের উন্নতি এবং (৫) অর্থের অবনতি।

**(১) অর্থের প্রসার—**

কালি – মূল অর্থ – তরল কৃষ্ণবর্ণ লিখন সামগ্রী। কিন্তু বর্তমানে যেকোন রঙ-এর লিখন উপাদানকেই কালি বলে ; যথা লাল কালি, সবুজ কালি। 'বর্ষ' শব্দের মূল অর্থ বর্ষাকাল-বর্তমানে বৎসর অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'গবেষণা' শব্দের মূল অর্থ 'গোরুর অন্বেষণ'। এখন যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধানের বিশিষ্ট রীতিকেই গবেষণা বলে। 'গাঙ' শব্দটির মূল হচ্ছে 'গঙ্গা'। বর্তমান বাংলায় যে কোন নদী থেকে আগত সংকীর্ণ জলধারা বা 'খাল' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পূর্বে তৈল' বলতে তিলজাত দ্রব্য বিশেষকে বোঝাত। আধুনিক বাংলায় এই জাতীয় যে কোন তরল পদার্থকেই 'তৈল' বলা হয় , যথা 'সরষের তেল', 'খনিজ তেল' ইত্যাদি। 'গুণ' শব্দের মূল অর্থ 'গো-সম্বন্ধীয়'। অর্থ প্রসারিত হয়ে 'দড়ি' বোঝায় যথা 'নৌকার গুণটানা।'

**(২) অর্থের সঙ্কোচন –**

এক্ষেত্রে আমরা অর্থপরিবর্তনের পূর্বতন ধারার বিপরীতগামিতা দেখতে পাই। অনেক শব্দ মৌলিক অর্থব্যাপ্তি হারিয়ে খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সংস্কৃত 'মৃগ' শব্দের অর্থ ছিল 'যেকোন পশু'। বর্তমানে শব্দটির অথ হরিণ'। 'অন্ন'' শব্দটির সংস্কৃত অর্থ 'যে কোন খাদ্যসামগ্রী'। প্রদীপ শব্দটি সাধারণ দীপ অর্থে ব্যবহৃত হ'ত ; বর্তমান অর্থ তৈলদ্বারা প্রজ্জ্বলিত দীপ।'

**(৩) অর্থ-সংশ্লেষ –(Transference of meaning)**

শব্দ কখনও কখনও মূল অর্থ থেকে দূরে সরে গিয়ে একটি নূতন অর্থ গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়াকে অর্থ-সংশ্লেষ বলে। মিছরীর প্রকৃত অর্থ মিশরে উৎপন্ন দ্রব্য— বর্তমান অর্থ চিনিজাত দ্রব্য বিশেষ। 'সন্দেশ' শব্দের মূল অর্থ -'সংবাদ'। এখনকার অর্থ ছানা ও চিনিজাত খাদ্য। 'পাত্র' শব্দের মূল অর্থ 'আধার' পরে পরিবর্তিত অর্থ 'বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট পুরুষ'।

**(৪) অর্থের উন্নতি—**

'মন্দির' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'গৃহ' কিন্তু আধুনিক বাংলায় আমরা 'দেবালয়' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করি। 'সম্ভ্রম' শব্দের মূল অর্থ 'ভীতি', এখন শব্দটির অর্থ 'ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা' ইত্যাদি।

(৫) **অর্থের অবনতি—**

অনেক প্রাচীন শব্দ তাদের অর্থের বিশিষ্ট মর্যাদা হারিয়ে খুব সঙ্কীর্ণ এবং নিম্ন-শ্রেণীর অর্থ পরিগ্রহ করেছে। 'ঠাকুর' শব্দটি 'দেবত্ব' থেকে বিচ্যুত হয়ে 'রাঁধুনী বামুন' এ পরিণত হয়েছে। মহাজন শব্দের গঠনগত অর্থ 'মহৎ মানুষ' বা 'সাধক ভক্ত' হারিয়ে 'সুদের জন্য টাকা ধার দেওয়ার ব্যক্তি'—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

## ॥ সমাস ও তার শ্রেণীবিভাগ ॥

সমাসকে বিশিষ্ট ভাষা-রীতি বলে গণ্য করা যায়। বাংলা ভাষার সমাস অনেকাংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুগামী। তবে কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সমাসের সংখ্যা ও রীতিকে কেন্দ্র করেই। লিখিত সাধু বাংলায় দুই এর অধিক শব্দযুক্ত সমাস দেখা গেলেও তাকে সংস্কৃতের অনুসারী বলে গণ্য করতে হবে এবং সাধারণভাবে বাংলাতে আমরা দুই পদ বিশিষ্ট সমাসের প্রাধান্য দেখতে পাই। সাধু-ভাষায় এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাষায় কখনও কখনও সংস্কৃত রীতির সমাস লক্ষ্য করি, যথা —'জন-গন-মন-অধিনায়ক' ( সাধু ) 'নাম-না জানা গন্ধ' অথবা 'মন-কেমন করা বাতাস' ইত্যাদি। সংস্কৃতের মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদের ব্যবহারিক রীতি জার্মাণ ভাষায় অনুসৃত হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সমাস চার শ্রেণীর—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি। দ্বিগু ও কর্মধারয় তৎপুরুষের অন্তর্গত। কখনও বা 'সহসুপা' সমাসকে চার শ্রেণীব সঙ্গে যুক্ত করা হয়। নানা বৈয়াকরণিক সমাসের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে নানা মত প্রকাশ করেছেন শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে জটিলতায় উদ্ভব হয়েছে। আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাসের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন।তা বেশ দীর্ঘ ও জটিল। সমাসের মূল ধর্ম অনুসারে তিনি সমাসকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, পরে প্রয়োজনীয় উপবিভাগগুলি দেখিয়েছেন। এই বিভাজনের একটি সংক্ষিপ্ত ছক এখানে দেখান হ'ল :—
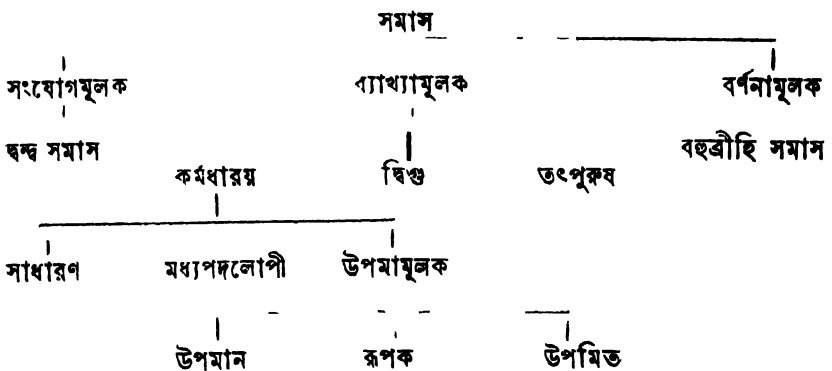
সমাসের শ্রেণীগত আলোচনার পূর্বে ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলি নিরূপনের প্রয়োজন আছে। সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে দুই বা বহুপদের একপদে পরিণত হওয়ার নামই সমাস। বাংলা সমাসে দুই পদের বিষয়টি প্রধান হলেও ব্যাখ্যামূলক বা বর্ণনামূলক সমাসে বহু পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সমাসনিষ্পন্ন সামগ্রীক পদটির নামই 'সমস্তপদ'। যে পদগুলির সাহাযে সমাস নিষ্পন্ন হয় তার নাম 'সমস্যমান পদ'। সমাসবদ্ধ পদ যখন বিশিষ্ট আকারে দেখান হয়, তখন তার সমগ্র রূপকেই 'ব্যাসবাক্য' 'সমাসবাক্য' বা 'বিগ্রহবাক্য' বলা হয়। সমাসে ব্যবহৃত প্রথম পদটির নাম 'পূর্বপদ' এবং পরবর্তী পদটির নাম 'উত্তরপদ'। সমাসের আলোচনায় এগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

## ॥ সংযোগমূলক সমাস ঃ দ্বন্দ্ব সমাস ॥

(১) সাধারণ দ্বন্দ্ব—

মাছ ও ভাত=মাছভাত। রাত ও দিন=রাতদিন

লাল ও নীল=লালনীল। জায়া ও পতি=দম্পতি।

(২) সমার্থক দ্বন্দ্ব—

গড়ি ও ঘোড়া=গাড়িঘোড়া। চিঠি ও পত্র=চিঠিপত্র

রাজা ও বাদশা=রাজাবাদশা। শাক্ ও সব্জী=শাকসব্জী।

(৩) অলুক দ্বন্দ্ব—

হাটে ও বাজারে=হাটে বাজারে।

দুধে ও ভাতে=দুধে ভাতে।

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়ের অর্থ ও তাৎপর্য সমপর্যায়ী বলে গণ্য করা হয়।

## ॥ ব্যাখ্যামূলক সমাস ঃ কর্মধারয় ॥

কর্মধারয় সমাসে সর্বদাই দ্বিতীয় পদ বা উত্তর পদের অর্থ প্রধানরূপে গণ্য হয়। বিশেষ্য ও বিশেষণ দুটি মিলে বা সমধর্মী পদের মিলনে কর্মধারয় সমাস হয়।

কর্মধারয় সমাসকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

(১) সাধারণ কর্মধারয় (২) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (৩) উপমান কর্মধারয় (৪) রূপক কর্মধারয় এবং (৫) উপমিত কর্মধারয়।

(১) সাধারণ কর্মধারয়—

(ক) বিশেষ্য+বিশেষ্য—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সর্দার-পড়ুয়া।

(খ) বিশেষণ+বিশেষণ—নীল-লোহিত, রুদ্র-সুন্দর।

(গ) বিশেষ্য+বিশেষণ—ঘননীল, হলুদ-বাটা।

(২) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়—

এই সমাসে ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত ব্যাখ্যামূলক পদগুলি লুপ্ত হয়।

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
কীর্ত্তি প্রকাশক মন্দির = কীর্ত্তিমন্দিব
ঘি মিশ্রিত ভাত = ঘিভাত
ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু

(৩) উপমান কর্মধারয় —

দুটি বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যহেতু পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা হ'তে পারে। তখন প্রধান আলোচ্য বস্তুটিকে বলে 'উপমেয়' এবং যে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে 'উপমান' বলে। উপমাবাচক কর্মধারয় সমাসগুলি এভাবেই গড়ে উঠেছে।

উপমান কর্মধারয় সমাসে উপমেয়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপমানের ধর্মের সাহায্য নেওয়া হয়। যথা—কুসুম-কোমল দেহ। এখানে সমস্ত পদ 'কুসুম কোমল'। এখানে কুসুমের মৌলধর্ম দেহের উপর আরোপিত অর্থাৎ দেহের কোমলতা কুসুমের অনুরূপ ধর্মের দ্বারা ব্যাখ্যাত।

(৪) রূপক কর্মধারয় -

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য উপমা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। যথা – শোকসিন্ধু, জ্ঞানালোক।

(৫) উপমিত কর্মধারয় –

উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য ততখানি স্পষ্ট না হলেও অন্তর্নিহিত কোন ধর্মের সমানতা লক্ষ্য করা গেলে উপমিত কর্মধারয় সমাস হয়।

মন রূপ র = মনোরথ। কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব।

## ॥ দ্বিগু সমাস ॥

দ্বিগু সমাসকে সংখ্যাবাচক সমাস বললেই সম্ভবতঃ ঠিক বলা হয়। সংখ্যাবাচক শব্দটি পূর্বপদ হিসাবে বসে।

তিন মাথার সমাহার = তেমাথা। পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী।
সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ। শত অব্দের সমাহাব = শতাব্দী।

## ॥ তৎপুরুষ সমাস ॥

পূর্ব পদের বিভক্তি লুপ্ত হয়ে সমস্তপদ গঠিত হলে এবং পরপদ বা উত্তর পদের প্রাধান্য সূচিত হলে তৎপুরুষ সমাস হয়। বিভক্তির বিভিন্নতা অনুসারে তৎপুরুষের বিভিন্নতা নিরূপিত হয়। তাছাড়া অপর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাগও আছে, যথা—(১) প্রথমা তৎপুরুষ, (২) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, (৩) তৃতীয়া তৎপুরুষ, (৪) চতুর্থী তৎপুরুষ, (৫) পঞ্চমী তৎপুরুষ, (৬) ষষ্ঠী তৎপুরুষ, (৭) সপ্তমী

তৎপুরুষ, (৮) নঞ্ তৎপুরুষ, (৯) অলুক তৎপুরুষ, (১০) প্রাদি সমাস, (১১) অব্যয়ীভাব সমাস।

(১) প্রথমা তৎপুরুষ=দাগ-লাগা, বাজ-পড়া।

(২) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ=ভুঁই-ফোঁড়, সাহায্য প্রাপ্ত।

(৩) তৃতীয়া তৎপুরুষ=হাতে-কাটা, ঢেঁকি ছাটা।

(৪) চতুর্থী তৎপুরুষ=ডাকমাশুল, (ডাকের জন্য মাশুল)

দেবদত্ত ( দেবকে দত্ত )

(৫) পঞ্চমী তৎপুরুষ—

জন্ম হইতে অন্ধ=জন্মান্ধ। স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট=স্বর্গভ্রষ্ট।

বিলাত হইতে ফেরৎ=বিলাত ফেরৎ। কারা হইতে মুক্ত=কারামুক্ত।

(৬) ষষ্ঠী তৎপুরুষ—

হংসের রাজা=রাজহংস। ঠাকুরের পো=ঠাকুরপো।

চায়ের বাগান=চা বাগান। মাতার স্নেহ=মাতৃস্নেহ।

(৭) সপ্তমী তৎপুরুষ—

গাছে পাকা=গাছ পাকা। জলে জাত=জলজাত।

(৮) নঞ্ তৎপুরুষ—

'নঞ' কথাটি নাস্তিবাচক। 'না' বাচক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে।

ন কাতর=অকাতর। ন আচার=অনাচার।

আইনের অভাব=বে-আইনী। নয় ঘাট=আঘাট।

(৯) অলুক তৎপুরুষ—

পূর্বপদের বিভক্তি বর্তমান থেকে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে অলুক তৎপুরুষ বলে।

ঘিয়ে ভাজা=ঘিয়েভাজা। চোখের বালি=চোখের-বালি।

পরের নিমিত্ত পদ=পরস্মৈপদ। ঘানি হইতে তেল=ঘানির তেল।

(১০) প্রাদি সমাস—

প্র—আদি উপসর্গ এবং পরে কৃদন্ত পদযোগে এবং অব্যয়ের সঙ্গে নাম যোগে এই সমাস হয়।

প্র ( প্রকৃষ্টরূপে ) ভাত ( উদ্ভাসিত )=প্রভাত।

সু ( সুন্দর ) পুরুষ=সুপুরুষ।

(১১) অব্যয়ীভাব সমাস—

অব্যয়পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে অব্যয়ীভাব সমাস হয়

লের সমীপে=উপকূল। ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ।

## বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি সমাসকে বর্ণনামূলক সমাস বলা যেতে পারে। এই সমাসে ব্যাস-বাক্যস্থিত পদগুলির অর্থ প্রধানরূপে গণ্য হওয়ার পরিবর্তে, তাদের মিলিত তাৎপর্য উদ্দিষ্ট বলে মনে হয়। এবং তৃতীর এক অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। সমাসবদ্ধ, পদটি হয় বিশেষণ। শ্রেণীবিভাগ - (১) ব্যধিকরণ, (২) সমানাধিকরণ, (৩) ব্যতিহার-ও (৪) মধ্যপদলোপী, (৫) অলুক্ বহুব্রীহি ইত্যাদি।

(১) **ব্যাধিকরণ** -

যে বহুব্রীহি সমাসে উভয় পদই বিশেষ্য কিন্তু তাদের একটি পদ অধিকরণ (সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত) তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে।

পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ বাক্ দত্ত হয়েছে যার = বাক্‌দত্ত

(২) **সমানাধিকরণ**—

ব্যাধিকরণের বিপরীতধর্মী অর্থাৎ পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ্ বিশেষ্য।

কালো বরণ যার = কালোবরণ পীত অম্বর যার = পীতাম্বর

(৩) **ব্যতিহার**—

কানে কানে যে কথা = কানাকানি

লাঠিতে লাঠিতে সংঘর্ষ = লাঠালাঠি

(৪) **মধ্যপদলোপী**

মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যার = মীনাক্ষী

মৃগের ন্যায় সুন্দর নয়ন যার = মৃগনয়না

(৫) **অলুকবহুব্রীহি** – এই সমাসে বিভক্তি লুপ্ত হয় না।

হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি

ছড়ি হাতে আছে যার = ছড়ি হাতে।

## ।। সন্ধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ।।

সন্ধি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের একটা দিক। সন্ধির দ্বারা যেমন বাহ্যিক সংহতিসাধন সম্ভব, তেমনি ধ্বনিগত মাধুর্যেব স্টিও সন্ধির মাধ্যমে সাধিত হয়। বুৎপত্তির দিক থেকে সন্ধি কথাটির অর্থ মিলন। ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে, সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকেই সন্ধি বলে। ভাষা উচ্চারণে দ্রুততা, ভাবপ্রকাশে বৈচিত্র্যসৃষ্টি, ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা ভাষার মধ্যে একটি বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যও আনতে চাই এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির দিকেও আমাদের লক্ষ্য থাকে। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা ভাষার এই বিশেষ প্রবণতার দিকটি আলোচনা করেছি। পারস্পরিক বর্ণ ও ধ্বনিগত প্রভাব, পূর্ব বা পববর্ণের লোপ, অথবা পবিবতন, নতুন ধ্বনির আগম ইত্যাদি সন্ধির বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য হতে পারে। বাংলা সন্ধিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত

করা যায়—**স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।** স্বরধ্বনির মিলন সাধন স্বরসন্ধির উদ্দিষ্ট এবং ব্যঞ্জনসন্ধিতে পাই স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন-সাধন। বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয় এবং সৎ+চরিত্র=সচ্চরিত্র—যথাক্রমে স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ। এছাড়া **বিসর্গসন্ধিও** রয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির বিস্তৃত আলোচনায় সমশ্রেণীর বর্ণের মিলনসূত্রে উদ্ভূত সাধারণ সূত্রের বাইরেও কিছু সংখ্যক সন্ধি-সৃষ্ট শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম বা সূত্র প্রযুক্ত হয় নি। সেই সন্ধিকে **'নিপাতনে সিদ্ধ'** বলা হয়। এই সন্ধিকে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক 'নিয়ম বহির্ভূত সন্ধি' বলেছেন। বিসর্গ সন্ধিও তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই দুটি শ্রেণীর সন্ধির উদাহরণ এখানে দেওয়া হল :—

| **নিপাতনে সিদ্ধ** | **বিসর্গ সন্ধি** |
|---|---|
| বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি | পুনঃ+জন্ম=পুনর্জন্ম |
| হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র | দুঃ+অবস্থা=দুরবস্থা |

## ॥ সন্ধি ও সমাসের তুলনামূলক আলোচনা ॥

সন্ধির আলোচনা থেকে তার প্রধান বিশেষত্বসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্ণ বা ধ্বনিগত মিলন সাধনই সন্ধির প্রধানতম সত্য। সমাসের সঙ্গে তার পার্থক্যের বিচার প্রসঙ্গেও এটিই প্রথমে আলোচ্য। সমাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বর্ণ নয়—শব্দ এবং তার অর্থই অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। তাই সন্ধিতে যেখানে বর্ণ প্রাধান্য, সমাসে সেখানে পদ প্রাধান্য।

| **সন্ধি** | **সমাস** |
|---|---|
| সিংহ+আসন=সিংহাসন | সিংহ চিহ্নিত আসন=সিংহাসন |

এখানে 'সিংহাসন' শব্দটিতে তাহার দেহের গঠনগত বৈচিত্র সম্পাদনে 'অ' এবং 'আ' এই দুটি স্বরধ্বনির মিলন সাধিত হয়েছে। অপরপক্ষে, সমাসে শব্দটির অর্থগত তাৎপর্য বিচারই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদের সৃষ্টি হয়। সমাসে যখন সমস্তপদে নতুন পদ গঠিত হয়, তখন অলুক সমাস ব্যতীত অন্য সব সমাসেই বিভক্তি লুপ্ত হয়ে নতুন পদ গঠিত হয়। কখনও বা বিগ্রহবাক্যের মধ্যস্থ কোন পদের বিলুপ্তি ঘটে—যেমন 'চিহ্নিত' শব্দটির লোপ হয়ে সমাস হয়েছে।

সন্ধিতে অর্থের পরিবর্তন সাধন উদ্দেশ্য নয়। ধ্বনির সাহায্যে ধ্বনিসৃষ্টিই সেখানে প্রধান। কিন্তু সমাসে কয়েকটি পদের একপদে পরিণত হওয়ার সময় একটা অর্থগত ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন কোন সমাসে শব্দের সাধারণ অর্থ পরিত্যক্ত হয়ে বিশেষ অর্থটি পরিস্ফুট হয়। বহুব্রীহি সমাসের এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

সন্ধির মিলন বহিরঙ্গের ; সেই তুলনায় সমাসের মিলনের ব্যাপারটি অন্তরঙ্গের। অন্তর-ধর্মের উদ্ঘাটনই সেখানে লক্ষ্যীভূত।

## ॥ কারক ও বিভক্তির আলোচনা ॥

কারক ও বিভক্তি ব্যাকরণের আলোচনায় মুখ্য বিষয়। বাক্যগঠনরীতির বৈশিষ্ট্য এবং অর্থগঠন ও অর্থপ্রতীতি কারক ও বিভক্তির সাহায্যেই সুচিত হয়। বাচ্যপরিবর্তনে পদের যে হেরফের ঘটান হয় এবং তার ফলে বাক্যের অঙ্গে যে পবিবর্তন দেখা দেয়—তাও প্রধানতঃ কারক ও বিভক্তির প্রয়োগবৈচিত্রের ব্যাপার।

বাক্যের গঠনরীতি এবং অর্থ উপলব্ধি বাক্যমধ্যস্থ ক্রিয়াপদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাছাড়া ক্রিয়াপদের অস্তিত্ব পদসমষ্টিকে বাক্যে পরিণত করে। ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের সম্পর্কের প্রকৃতিও বিভিন্ন। কারক এই সম্পর্ককেই স্পষ্ট করে তোলে। তাই ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যমধ্যস্থ অন্য পদের যে সম্পর্ক —তাকেই কারক বলা হয়েছে।

আবার বিভক্তির চিহ্ন ব্যতীত কারকের উপলব্ধি অসম্ভব। তাছাডা বিভক্তির সাহায্যে আমরা সংখ্যা বা বচনের বিষয়টিও বুঝতে পারি। এজন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে – যে চিহ্নের সাহায্যে সংখ্যা ও কারকের বোধ জন্মায়—তাকেই বিভক্তি বলে। এজন্য কারক ও বিভক্তির যৌথ আলোচনা [illegible]রূপ অপরিহার্য।

উদাহরণ—আমি তোমাকে বইটি দিলাম। এখানে 'দিলাম' ক্রিয়াপদ এবং এর বিশিষ্ট রূপটি 'আমি' এই সর্বনাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজটির সঙ্গে 'আমি' এর ঘনিষ্ঠতম অর্থাৎ অনুষ্ঠানকারীর সম্পর্ক রয়েছে, এজন্য এটি 'কর্তা' সম্পর্কযুক্ত এবং সেই কারণে 'আমি' কর্তৃকারক। 'বইটি'এবং 'তোমাকে' পদ দুইটির সঙ্গে 'কর্ম' সম্পর্ক হওয়ায়—এ দুটি কর্মকারক ( মুখ্য ও গৌণ )। 'বইটি' পদের 'টি' একটি নির্দেশক প্রত্যয় এবং 'তোমাকে' পদের 'কে' বিভক্তির সাহায্যে সংখ্যা ও কারক উভয়ই দ্যোতিত হচ্ছে। বচন অনুসারে বিভক্তির একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল :—

### শব্দ-বিভক্তি ও বিভক্তি-চিহ্ন

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| প্রথমা—অ ( বা শূন্য ), এ, য়, তে, এতে | রা, এরা, গণ, গুলি, সমূহ, সকল |
| দ্বিতীয়া—কে, রে, এরে, এ | দিগকে, দের, দিকে গুলিকে, গুলোকে |
| তৃতীয়া দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, এ, করিয়া ( ক'রে ) | দিগের দ্বারা, গণকর্তৃক দের, দ্বারা |
| চতুর্থী – দ্বিতীয়ার অনুরূপ | |

পঞ্চমী—হইতে ( হ'তে ), থেকে, চেয়ে — দের থেকে, দিগের হইতে
ষষ্ঠী—র, এর, কার, কের — দের, গুলোর, দিগের
সপ্তমী—এ, তে, এতে — গুলোতে; দিগেতে

শব্দের উত্তর কোন বিভক্তি যুক্ত হবে—তা নির্ভর করবে বিশিষ্ট কারকের ওপর। কারকের সম্যক ধারণা ব্যতীত বিভক্তির প্রয়োগের বিষয় নির্ধারণ করা যায় না। তাছাড়া বিভক্তি-বিষয়ে আর একটি জটিলতা এই যে, অনেক সময় একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হয়। সব বিভক্তির ব্যবহার সব সময় হয় না। কয়েকটি প্রধান স্থানীয় বিভক্তি যথা - এ, কে, র, এর, তে, এতে প্রভৃতির সাহায্যেই আমাদের মোটামুটি কাজ চলে। বহুবচনে অবশ্য দের, দিগের প্রধান বিভক্তি। বিভিন্ন কারকের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ তাৎপর্য নির্দেশে অবশ্য 'অনুসর্গের, ( Post-Position ) ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী—এই তিন রকমের অনুসর্গই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

## ॥ কর্তৃকারক ॥

যার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় সেটিই কর্তা এবং প্রথমা বিভক্তি যোগে কর্তৃকারকের পদ গঠিত হয়। যথা :—ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

এখানে 'রা' বিভক্তি যোগে 'ছেলেরা' কর্তৃকারকের পদ। ফুটবল খেলার কাজটি ছেলেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হওয়ার কর্তৃকারক হিসাবে নির্দিষ্ট।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে—যথা, "রূখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাই" আধুনিক বাংলায়ও এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—'কুকুরে ভাত খেয়ে গেল'। আধুনিক বাংলায় 'এ' বিভক্তি অনির্দিষ্ট কর্তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়—'লোকে বলে', 'পাগলে কি না বলে ?'

সংস্কৃতে 'এন' বিভক্তিজাত 'এ' বিভক্তি বাংলার কর্তৃকারকে প্রযুক্ত 'এ' বিভক্তির সঙ্গে মিশে এক হয়েছে—

পুত্রেন>পুত্তেনং>পুত্তেঁ>পুর্তে>পুতে।

'তে' এই সপ্তমী বিভক্তি কখনও বা কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হয়—"গরুতে কেন খায় ?" "প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে" ( বঙ্কিমচন্দ্র )।

"রাখাল কেন চরায় না ?"—বাক্যে রাখাল 'অ' বা শূন্য বিভক্তিযোগে কর্তৃকারকের পদ।

## ॥ কর্মকারক ॥

ক্রিয়া যাকে উদ্দেশ্য করে সাধিত হয় তাকেই কর্ম বলে। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কর্ম—মুখ্য ও গৌণ—এই দুই শ্রেণীর হতে পারে। বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণকর্ম বলে।

'বিমল অঞ্জনকে তার কলমটি দিচ্ছে'—এই বাক্যে 'কলমটি' মুখ্যকর্ম এবং 'অঞ্জনকে' গৌণকর্ম। লক্ষ্য করতে হবে, এখানে 'কলমটি' শব্দে 'টি' এ নির্দেশক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে।

আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট মুখ্যকর্মে বিভক্তি যুক্ত হয় না।

হরি গান শুনছে। ফেরিওয়ালা ফল বিক্রী করছে।

উপরের দুটি বাক্যে 'গান' ও 'ফল' বিভক্তিশূন্য শব্দ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার গৌণকর্ম বিভক্তিবিহীন অবস্থায় দেখা যায়—

"গুরু পুচ্ছিঅ"। "চতুর্দশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাও।" দুটি বাক্যে 'গুরু' এবং 'কৃষ্ণ' শব্দে বিভক্তি যুক্ত হয় নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় কর্মকারকে বিশেষতঃ মুখ্যকর্মে 'ক' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। যথা

(১) "মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা" (২) "বাধাক বুলিল নিঠুর বাণী"

এখানে ঠাকুরক=ঠাকুরকে এবং 'রাধাক'=রাধাকে বুঝতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে, আধুনিক উড়িয়ায় মধ্যযুগের বাংলার মত 'ক' বিভক্তির ব্যবহার রয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

"কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।"

আধুনিক বাংলাতেও গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়—

"কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস।"--রবীন্দ্রনাথ।

**॥ করণকারক ॥**

যার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাই করণ। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

সুনীল ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটে।

এই বাক্যে 'দিয়ে' বিভক্তিযোগে ( 'ছুরি দিয়ে' ) করণকারক হয়েছে।

আধুনিক বাংলায় একাধিক বিভক্তি যোগে করণকারকের পদগুলি গঠিত হয়-- 'হাতে মাথা কাটা' এখানে হাতে' বলতে 'হাত দ্বারা' বুঝতে হবে। করণে 'এ' বিভক্তির অন্য উদাহরণও দেওয়া যায়। যথা -

(১) 'তেলে ভাজা' অর্থাৎ তেল দ্বারা ভাজা। (২) 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো' অর্থাৎ গঙ্গা জল দ্বারা। (৩) 'আনন্দে চোখে জল এল' আনন্দে=আনন্দ হেতু। (৪) 'পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে' —'ধনে'=ধন দ্বারা।

করণে বিভক্তি শূন্যতাও দেখা যায়।

'লোকটিকে চাবুক মারা হ'ল।' এখন 'চাবুক' শব্দটি বিভক্তিবিহীন।

মধ্য বাংলায় করণকারকে 'ত' বিভক্তি ব্যবহার করা হয়েছে—

"হাথত ধরিয়া মোর দগধ পরাণে।"

**॥ সম্প্রদান কারক ॥**

স্বার্থ ত্যাগ করে কোন কিছু কোন ব্যক্তিকে দান করা বোঝালে সম্প্রদান কারক হয়।

(১) ভিক্ষুককে অন্ন দাও। (২) শীতার্তকে বস্ত্র দেওয়া হ'ল।

সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং চতুর্থী বিভক্তি দ্বিতীয়া বিভক্তির অনুরূপ।

**॥ অপাদান কারক ॥**

যা থেকে কোন কিছু পতিত, নির্গত, উৎপন্ন হয়, তার নাম অপাদান। অপাদান কারকে সাধারণতঃ পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

(১) কৃষ্ণনগর থেকে সরভাজা আনা হ'ল।

(২) "বাবা গেলেন মুনশীগঞ্জে
রাণাঘাটের থেকে।"—রবীন্দ্রনাথ

এদু'টি উদাহরণ স্থানবাচক অপাদান নির্দেশক। অন্যবিধ অপাদানের উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

কালবাচক অপাদান—১৯৪৭ থেকে ভারতে নবযুগের সূচনা হয়।

দূরত্ববাচক অপাদান—দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব ৪৮ মাইল।

অবস্থাবাচক অপাদান—সমীর কঠিন রোগ থেকে মুক্ত হ'ল।

তারতম্যবাচক অপাদান- জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতেও বড়।

**॥ অধিকরণ কারক ॥**

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। অধিকরণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—কালাধিকরণ ও আধারাধিকরণ।

কালাধিকরণ—"নিশীথে যাইও ফুল-বনে"

আধারাধিকরণ—

(১) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ" (২) "সঙ্গীতে মাধুর্য আছে।"

প্রাচীন বাংলায় অধিকরণে 'হি' এবং 'এ' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়

(১) হৃদয়ধি>হিঅহি। (২) নিয়ড্ডী>নিয়ড়ী>নিকটে

'ত' বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে প্রাচীন বাংলায়। এটি সংস্কৃত 'অন্তঃ' থেকে আগত। যথা: (ক) 'সাঙ্কমত' (খ) 'বাটত'

'এতে' বিভক্তির প্রাচীন ব্যবহার--'সিথতে সিন্দুর' অধিকরণে 'কে' বিভক্তির বিচিত্র ব্যবহার—

"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।"

**॥ সম্বন্ধ পদ ॥**

সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

(ক) 'আজিকার বসন্তের কোন গান' (খ) 'আজ আমাদের ছুটি ও ভাই। (গ) আজকের খবর।

প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধ পদে 'রি' বিভক্তির ব্যবহার—

'কাহারি নাবেঁ' ( স্ত্রী প্রত্যয় )।

পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার 'গো' বিভক্তি সম্বন্ধপদে ব্যবহৃত—

(ক) তোমাগো বাড়ী যামু না। (খ) আমাগো দ্যাশে হক্কলে সুখে আছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'এর' বিভক্তির প্রয়োগ—

'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ'

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ —

"হাথক দরপণ মাথক ফুল;
নয়নক মৃগমদ মুখক তাম্বুল॥"

॥ অনুসর্গ ॥

কারক ও বিভক্তির আলোচনায় অনুসর্গের আলোচনা অপরিহার্য। কারণ অনুসর্গ বিভক্তির উদ্দেশ্য সাধন করে। অনুসর্গ হিসাবে পরিচিত শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে অব্যয়। এগুলি প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত ঃ—

(ক) নাম অনুসর্গ এবং (খ) অসমাপিকা অনুসর্গ। কয়েকটি অনুসর্গের ব্যবহার দেখান হ'ল ঃ -

বিনা —'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে'
প্রতি তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই।
ব্যতীত মৃত্যু ব্যতীত জীবনের তাৎপর্য কোথায়?
লাগি—'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি কাড়াকাড়ি।'
তরে—'তোমার তরে একতারাতে
বেঁধে নিলেম গান।'

## ॥ কৃৎ প্রত্যয় ॥

**প্রত্যয়ের সংজ্ঞা**—শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে যেটি যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ গঠিত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দকে প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা সাধিত শব্দ বলাই সমীচীন। বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে দুই জাতীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে —'কৃৎ প্রত্যয়' এবং অপরটি 'তদ্ধিত প্রত্যয়'। ধাতুর উত্তর কৃৎ এবং শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। কৃৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দকে কৃদন্ত শব্দ' এবং তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী বলে

সংস্কৃত এবং বাংলা—উভয় শ্রেণীর প্রত্যয়ের ব্যবহার বাংলায় প্রচলিত। প্রথমতঃ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। পরবর্তী অংশে বাংলা প্রত্যয়ের আলোচনা করা হবে।

## বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কৃৎ প্রত্যয়ের সঙ্গে 'চ' 'ন' 'ক' 'ঞ' প্রভৃতি বর্ণ যুক্ত থাকলেও প্রত্যয়ান্ত শব্দের মধ্যে সেগুলি বর্তমান থাকে না; অর্থাৎ পূর্বেই লোপ পায়। যে অংশটুকু লুপ্ত হয়, তার নাম 'ইৎ'। প্রত্যয়ের স্থায়ী অংশটুকু ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃদন্ত শব্দ গঠিত হয়। প্রত্যয়ের আলোচনায় বাচ্যেরও একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য বা ভাববাচ্য—কোন বাচ্য অনুসারে সাধিত শব্দটি পাওয়া গেল—সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

### কর্তৃবাচ্য প্রত্যয়

(১) **ণিন্**—ণইৎ—ইন্।

স্থা+ণিন্=স্থায়ী। আ-গম্+ণিন=আগামী।
সত্য—বদ্+ণিন্=সত্যবাদী। ভূ+ণিন=ভাবী।

(২) **ইন্**= পরি—শ্রম+ইন=পরিশ্রমী। রক্ষ+ইন=রক্ষী। মন্ত্র+ইন =মন্ত্রী।

(৩) **তৃচ ও তৃণ**—'চ' ও 'ন' ইৎ—স্থায়ী 'তৃ'=দা+তৃন=দাতা। মা+তৃন =মাতা। পা+তৃন=পিতা। গ্রহ+তৃন=গ্রহীতা।

(৪) **ণক**—'ণ' ইৎ—স্থায়ী- অক=পচ্+ণক=পাচক। দৃশ+ণক=দর্শক। কৃষ্+ণক=কৃষক। চালি+ণক=চালক।

(৫) **অন**= মধু—সূদি+অন=মধুসূদন। শোভি+অন=শোভন। সাধি +অন=সাধন।

(৬) **ড**—ড ইৎ স্থায়ী অ= পাদ—প+ড=পাদপ। পঙ্ক—জন+ড=পঙ্কজ। সরস—জন+ড=সরোজ। বি—জ্ঞা+ড=বিজ্ঞ।

(৭) **ঘিণ**—ঘ ও ণ ইৎ, স্থায়ী—ইন= ত্যাজ+ঘিণ=ত্যাগী। প্রতি—যুজ +ঘিণ=প্রতিযোগী।

(৮) **শান**—'শ' ইৎ—আন= শী+শান=শয়ান। বৃৎ+শান=বর্তমান। বিদ্+শান=বিদ্যমান। বৃধ্+শান=বর্ধমান।

(৯) **ইষ্ণু**= সহ+ইষ্ণু=সহিষ্ণু। বৃধ্+ইষ্ণু=বর্ধিষ্ণু। ক্ষি+ইষ্ণু=ক্ষয়িষ্ণু।

### সংস্কৃত ভাববাচ্য কৃৎপ্রত্যয়

(১) **তব্য**— কৃ+তব্য=কর্তব্য। জ্ঞা+তব্য=জ্ঞাতব্য। বচ্+তব্য= বক্তব্য। দা+তব্য=দাতব্য।

(২) **অনীয়—** দৃশ+অনীয়=দর্শনীয়। কৃ+অনীয়=করণীয়। প্র—অর্থি +অনীয়=প্রার্থনীয়।

(৩) **য—** লভ্+য=লভ্য। সহ+য—সহ্য। ভূ+য=ভব্য। গদ্+য=গদ্য।

(৪) **ক্যপ্—**'ক' ও প ইৎ, স্থায়ী অংশ 'য':—ভৃ+ক্যপ=ভৃত্য বা ভার্যা (স্ত্রী—আ)। চর+ক্যপ=চর্যা (আ)। শী+ক্যপ=শয্যা (আ)।

(৫) **ক্ত—**'ক' ইৎ—ত: গ্রহ+ক্ত=গৃহীত। পত্+ক্ত=পতিত। ভূ+ক্ত =ভূত। ধাব+ক্ত=ধৌত।

(৬) **ঘঞ্—**'ঘ' ও 'ঞ' ইৎ—অ:—নি—বস+ঘঞ=নিবাস। বি—অব—সো+ঘঞ্=ব্যবসায়। প্র—সদ+ঘঞ্=প্রসাদ।

(৭) **অনট—**'ট' ইৎ—অন:—লিখ্+অনট=লিখন। গম্+অনট=গ[illegible]ন সম—গঠ+অনট=সংগঠন। নী+অনট=নয়ন। চব+অনট=চরণ।

(৮) **অন:—** প্র—অর্থি+অন (আ)=প্রার্থনা। মন্ত্রি+অন (আ)—মন্ত্রণা।

(৯) **ক্তি—**'ক' ইৎ—তি:— প্র—গম্+ক্তি=প্রগতি। গৈ+ক্তি গীতি।

### বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

(১) **অ—** (আধুনিক বাংলায় উচ্চারিত হয় না।) বাড্+অ=বাড়। চল্ +অ=চল। হার্+অ=হার। ছাড+অ=ছাড।

(২) **তি:—** বাড্+তি=বাড়তি। চল্+তি=চলতি। উঠ্+তি=উঠতি। পড়্+তি=পড়তি।

(৩) **অন—** বাঁধ+অন=বাঁধন। নাচ+অন=নাচন। ঝাড+অন=ঝাড়ন। কাঁদ+অন=কাঁদন।

(৪) **উনি/উনী:** রাঁধ+উনী=রাঁধুনী। বাঁধ+উনি=বাঁধুনি।

(৫) **আ:—** কাট+আ=কাটা। নাচ+আ=নাচা।

(৬) **আই:—** বাঁধ+আই=বাঁধাই। লড়্+আই=লড়াই।

(৭) **আন:—** জানা+আন=জানান। আনা+আন=আনান।

(৮) **ই:—** বল্+ই=বুলি। ফির্+ই=ফিরি।

(৮) **ইয়ে:—** খা+ইয়ে=খাইয়ে। বল্+ইয়ে=বলিয়ে।

(১০) **উ:—** ডুব্+উ=ডুবু। নিব্+উ=নিবু।

(১১) **উক:—** মিশ+উক=মিশুক। ভাব+উক=ভাবুক।

(১২) **উয়া:—** পড+উয়া=পড়ুয়া।

### সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

(১) **বৎ—** আত্ম+বৎ=আত্মবৎ। মৃত+বৎ=মৃতবৎ।

(২) **ময়—** জল+ময়=জলময়। মৃৎ+ময়=মৃন্ময়।

(৩) **শালিন—** ধন+শালিন=ধনশালী। বল+শালিন=বলশালী।
(৪) **তন—** পূর্ব+তন=পূর্বতন। চিরম্+তন=চিরন্তন।
(৫) **ইত—** দুঃখ+ইত=দুঃখিত। লজ্জা+ইত=লজ্জিত।
(৬) **র—** মুখ+র=মুখর। নগ+র=নগর।
(৭) **আলু—** নিদ্রা+আলু+=নিদ্রালু। চন্দ্রা+আলু=চন্দ্রালু।
(৮) **ইষ্ঠ—** প্রশস্য+ইষ্ঠ=শ্রেষ্ঠ। গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ।
(৯) **মতু, বতু—** শ্রী+মতু=শ্রীমান। জ্ঞান+বতু=জ্ঞানবান।
(১০) **ণীয়—ণ ইৎ—'ঈয়' স্থায়ী—** শরৎ+ণীয়=শারদীয়। আত্মন+ণীয়=আত্মীয়।
(১১) **ণীন—ঈন :—**গ্রাম+ণীন=গ্রামীন। প্রাচ+ণীন=প্রাচীন।
(১২) **ষ্ণেয়—** অগ্নি+ষ্ণেয়=আগ্নেয়। পথ+ষ্ণেয়=পাথেয়।
(১৩) **ষ্ণিক—** চীন+ষ্ণিক=চৈনিক। ভূগোল+ষ্ণিক=ভৌগোলিক।
(১৪) **ষ্ণ্য—** স্থির+ষ্ণ্য=স্থৈর্য্য। বণিজ+ষ্ণ্য=বাণিজ্য।
(১৫) **ষ্ণ—** শরৎ+ষ্ণ=শারদ। শিব+ষ্ণ=শৈব।
(১৬) **ষ্ণেয়—** বিমাতৃ+ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়। গঙ্গা+ষ্ণেয়=গাঙ্গেয়।
(১৭) **ষ্ণায়ণ—** রাম+ষ্ণায়ণ=রামায়ণ। নর+ষ্ণায়ণ=নারায়ণ।

## বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

(১) **আই**—ঢাকা+আই=ঢাকাই। মিঠা+আই=মিঠাই।
(২) **আইত/আত**—সেবা+আইত=সেবাইত। সঙ্গ+আত=সাঙ্গাৎ।
(৩) **আন**—জুতা+আন=জুতান। হাত+আন=হাতান
(৪) **আমি**—পাকা+আমি=পাকামি। বাঁদর+আমি=বাঁদরামি।
(৫) **আরি**—মাঝ+আরি=মাঝারি। পূজা+আরী=পূজারী।
(৬) **আরু**—বোমা+আরু=বোমারু।
(৭) **আল**—শাঁখ+আল=শাঁখাল। ধার+আল=ধারাল।
(৮) **আলি**—ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি। চতুর+আলি=চতুরালি
(৯) **ঈ**—বেনারস+ঈ=বেনারসী। জাপান—ঈ=জাপানী।
(১০) **ই**—বাহাদুর+ই=বাহাদুরি। শয়তান+ই=শয়তানি
(১১) **উ**—খোকা+উ=খুকু। দুষ্ট+উ=দুষ্টু।
(১২) **কার**—বছর+কার=বছরকার। সেদিন+কার=সেদিনকার।
(১৩) **লা**—পাত+লা=পাতলা। মেঘ+লা=মেঘলা
(১৪) **পনা**—গৃহিনা+পনা=গৃহিনীপনা। ন্যাকা+পনা=ন্যাকাপনা।

## ॥ ক্রিয়ার বাচ্য ॥

বাক্যমধ্যস্থ ক্রিয়ার রূপভেদে যখন কর্তা, কর্ম প্রভৃতির প্রাধান্য সূচিত হয় তখন এই প্রক্রিয়াকেই বাচ্য বলে ( voice )। আমরা একভাবে মনোভাব প্রকাশে সন্তুষ্ট হতে পারি না। তাই ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করা হয়। প্রকাশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বাক্যের অর্থ সমান থাকলেও কখনও কর্তা আবার কখনও কর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

ক্রিয়ার বাচ্যকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়—(১) কর্তৃবাচ্য (২) কর্মবাচ্য (৩) ভাববাচ্য এবং (৪) কর্মকর্তৃবাচ্য। প্রত্যেকটির উদাহরণ দেওয়া হল।

(১) **কর্তৃবাচ্য** -যে বাক্যে ক্রিয়ার রূপটি কর্তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্ধারিত হয়। সেটি কর্তৃবাচ্য সম্পন্ন। আমি বাজারে যাই। সে স্কুলে যায়। —এই দুটি বাক্যে 'যাই'ও 'যায়' ক্রিয়াপদের রূপ কর্তার বিভিন্নতা অনুসারে নির্ধারিত।

(২) **কর্মবাচ্য**—কাজটি আমাদ্বারা সম্পাদিত হ'ল—এই বাক্যে 'কাজটি' কর্তার মত মনে হয় এবং এটির পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াপদটি নির্দিষ্ট; অথচ 'কাজটি' মূলত কর্ম। অতএব কর্মবাচ্যে ক্রিয়াপদটি কর্ম অনুসারেই নির্ণীত হয়।

(৩) **ভাববাচ্য**—'তোমার পড়া শেষ হ'ল'—যেখানে ক্রিয়ার সম্পাদনের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে এবং সেই অনুসারে ক্রিয়ার বাহ্যিক রূপটি নির্ধারিত হয়—সেখানেই ভাববাচ্য। উপরের বাচ্যটিতে 'পড়া' প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ক্রিয়ায় রূপটিও তদনুরূপ।

(৪) **কর্মকর্তৃবাচ্য**—যে বাক্যে কর্ম কর্তার উদ্দেশ্যে সাধন করে সেখানে কর্ম কর্তৃবাচ্য হয়। —মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ্ ঢঙ্'এখানে কাঁসর, ঘণ্টা কর্ম হয়েও কর্তার মত ব্যবহৃত।

## ॥ বাংলা ছন্দের আলোচনা ॥

বাংলা ছন্দের আলোচনার জগতে কয়েকজন প্রখ্যাত ছান্দসিকের আবির্ভাব হলেও এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় ছন্দের আলোচনায় পরিমাণগত বাহুল্য দেখা দিলেও একথা ঠিক যে, বাংলা ছন্দের একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ তার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হতে পারে নি। বিভিন্ন ছন্দ-বিজ্ঞানীর সুপ্রচুর মতপার্থক্যই তার সবচেয়ে বড় কারণ বলে মনে হয়। ছন্দ বিচারেই মতদ্বৈধ ঘটে তাই নয়, ছন্দের আলোচনায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দও সকলের কাছে সমান তাৎপর্য বহন করে না। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ছন্দের আলোচনা করতে হয় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষকের পাঠন নিপুণতা অর্জনের জন্য ছন্দের মোটামুটি একটা কার্যকরী জ্ঞান সঞ্চয় করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ছন্দের এই আলোচনাটিকে বোধগম্য করার জন্য তাই পারিভাষিক শব্দগুলির পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত হ'ল—

(১) **স্বরধ্বনি**—যে ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্র থেকে নির্গত হওয়ার সময় কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ স্বতঃই উচ্চারিত হয়। হয়—তাকে স্বরধ্বনি বলে। 'অ' 'ও' 'উ' প্রভৃতি স্বরধ্বনি। যে কোন ভাষায় স্বরধ্বনির মূল্য অপরিসীম। কারণ, স্বরধ্বনির সহায়তা ব্যতীত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও ব্যবহার কখনও সম্ভব নয়। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত ও মিশ্রিত স্বরধ্বনি কখনও উচ্চারিত হয়, আবার কখনও হয় না—চলিত, পতিত শব্দদুটিতে অন্তে স্বরধ্বনির উচ্চারণ বজায় থাকলেও 'পতিত-পাবন' শব্দের 'পতিত' উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে ব্যঞ্জনান্ত বলেই গণ্য হওয়া উচিত। স্বরধ্বনি দু রকমের মৌলিক ও যৌগিক। 'অ' মৌলিক স্বরধ্বনি। কিন্তু 'ঐ' যৌগিক স্বরধ্বনি। দ্রুত উচ্চারণের সময় পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি মৌলিক স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

(২) **ব্যঞ্জনধ্বনি**

স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতীত যে ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব নয় তাই ব্যঞ্জনধ্বনি। 'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনির মত ব্যঞ্জনধ্বনিও দুধরনের—মৌলিক, যৌগিক। যৌগিক ব্যঞ্জনকে আমরা সাধারণতঃ যুক্তব্যঞ্জন বলে থাকি।

(ক) মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি প, ফ, ব, ভ।

(খ) যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শ্ম, ক্ষ, ম্ন, স্ত।

(৩) **অক্ষর**—ইংরাজীতে syllable বলতে যা বোঝায় এখানে অক্ষর বলতে তাই নির্দেশিত হচ্ছে। স্বরযন্ত্রের সামান্যতম প্রয়াসে যতটুকু ধ্বনি নির্গত হয় তাকেই অক্ষর বলে। একটি অক্ষরের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি থাকে। স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলেও একটি অক্ষর বলে বিবেচনা করতে হবে। 'কবিরাজ' শব্দটিতে ক+বি+রাজ এই তিনটি অক্ষর আছে। এখানে 'ক' এর সঙ্গে একটি স্বরধ্বনি, 'বি' এর সঙ্গে একটি স্বরধ্বনি এবং 'রাজ' এ একটি স্বরধ্বনি থাকায় এদের সবগুলি এক একটি অক্ষর।

অক্ষর দু রকমের স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। আবার স্বরান্ত অক্ষরকে দুভাগে ভাগ করা হয়—মৌলিক স্বরান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত।

(ক) 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার' আমি=আ—স্বরান্ত (মৌলিক)। মি—মৌলিক স্বরান্ত, মা+লন্+চের=চের—ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

(খ) 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' ঐ=ও+ই (যুগ্ম স্বরধ্বনি)। অতএব যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর।

(গ) যৌবন - যৌ+বন। যৌ=য+ঔ=য+ও+উ। যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর। বন—একটি স্বরধ্বনিবিশিষ্ট ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

(৪) **ছেদ ও যতি**—(Sense Pause ও Metrical Pause) যে কোন বই বা লেখা পড়ার সময় আমরা একটানা সমগ্র বিষয়টি পড়ে যাই না। কারণ

শ্বাসযন্ত্রের সীমিত যোগ্যতাহেতু আমাদের পাঠের মাঝে মাঝে বিরতির সাহায্য নিতে হয়। বিবিধ বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই বিরতিকেই ছেদ ও যতি বলা হয় শ্বাসগ্রহণের প্রয়োজন যেমন আছে, অর্থ পরিস্ফুটনের প্রয়োজনও নগণ্য নয়। তাছাড়া নির্দিষ্ট যতিচিহ্নের ব্যবহারও ব্যাকরণস্পৃষ্ট এবং অনুমোদিত।

প্রয়োজনীয় শ্বাসগ্রহণ এবং আংশিক অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য পাঠকালীন যে সাময়িক বিরতি তারই নাম ছেদ। উদাহরণ—

"এইরূপ / প্রাতঃকাল হইতে / সন্ধ্যা পর্যন্ত / দেবী দরিদ্রদিগকে / দান করিলেন।"

নির্দিষ্ট চিহ্নের সাহায্যে বাক্যমধ্যে যখন বিশেষ বিরতির ব্যবস্থা করা হয় তখন তাকেই যতি (Meterical Pause) বলে। ছন্দের আলোচনায় যতির গুরুত্বই সর্বাধিক।

(ক) "বীজের উপর কঠিন ঢাকনা; তাহার মধ্যে বৃক্ষ শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়—বীজের আকার নানা প্রকার,—কোনটি অতি ছোট, কোনটি বড়।"

(খ) "সাত কোটি সন্তানেরে, / হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, / মানুষ করনি।

(৫) **পর্ব ও পর্বাঙ্গ—**

গদ্য রচনায় একটি বাক্য এবং কবিতায় একটি চরণে পাঠকালীন স্বল্প বিরতির ফলে খণ্ডিত নির্দিষ্ট হ্রস্বতম অংশটির নাম পর্ব। পর্বের অন্তর্গত বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণে ধ্বনির যে কমবেশী হয়—তার ফলে পর্বটি বিভক্ত হয়—এর প্রত্যেকটি অংশের নাম পর্বাঙ্গ।

উদাহরণ—

"সেদিন সাঁজে / ছিল না কাজ / হাতে
জানালা পথে / বাহিরে ছিনু, চেয়ে;
প্রাঙ্গণেতে / মালীর ছেলে / সাথে
খেলিতেছিল / আমারই ছোট / মেয়ে।

এখানে 'সেদিন সাঁঝে' 'ছিল না কাজ' প্রভৃতির প্রত্যেকটিকে 'পর্ব' বলা যাবে এবং চরণ শেষের 'হাতে' 'চেয়ে' প্রভৃতি অংশের পূর্ণপর্বের সঙ্গে সঙ্গতি না থাকায়, এগুলিকে 'খণ্ডপর্ব' বলে। খণ্ডপর্বে কখনও পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা থাকে না।

(৬) মাত্রা—

একটি অক্ষর উচ্চারণে যতটুকু সময় লাগে তাকেই মাত্রা বলে। বাংলা ছন্দে মাত্রাগণনা ও নির্ণয় একটি জটিল ও বিতর্কিত বিষয়। কারণ, ছন্দের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে ভিন্ন রীতিতে মাত্রা গণনা করা হয়। এমনকি একই ছন্দে মাত্রা গণনায় পর্বভেদে বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। যেমন 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যাও'— ছড়ার এই চরণটির প্রথম 'ঘুম' শব্দটির উচ্চারণে-যত সময় লাগে দ্বিতীয় 'ঘুম' শব্দটির উচ্চারণ-সময় সে তুলনায় হ্রস্ব।

মাত্রা গণনার রীতি অনুসারে স্বরান্ত অক্ষরে এক মাত্রা এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরে দু মাত্রা হিসাব করতে হয়। এটিকে সাধারণ নিয়ম বলে গণ্য করা সঙ্গত। কারণ, বিশেষ ছন্দের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—অক্ষর ব্যঞ্জনান্ত হলেও স্বরবৃত্ত ছন্দে দুমাত্রার পরিবর্তে এক মাত্রার হিসাব ধরাই রীতি। উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে বলবৃত্তের মাত্রা গণনায় রীতির পার্থক্য আছে।

উদাহরণ—(ক) "ঊর্ধ্ব গগনে / বাজে মাদল
নিয়ে উতলা / ধরণী তল,

(খ) অরুণ প্রাতের / তরুণ দল
চলরে চলরে / চল।

ছন্দ—মাত্রাবৃত্ত। মাত্রা (প্রতি পর্ব)—৪
অর্থাৎ প্রতি পর্ব—চারমাত্রা বিশিষ্ট।

| | অক্ষর | | মাত্রা | অক্ষর | | মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ক) | ১ | উর্ | ১ | ১ | বা | ১ |
| | ১ | ধ্ব | ১ | ১ | জে | ১ |
| | ১ | গ | ১ | ১ | মা | ১ |
| | ১ | গনে | ১ | ১ | দল | ১ |
| | ৪ অক্ষর | | ৪ মাত্রা | ৪ অক্ষর | | ৪ মাত্রা |
| (খ) | ১ | অ | ১ | ১ | ত | ১ |
| | ১ | রুণ | ১ | ১ | রু | ১ |
| | ১ | প্রা | ১ | ১ | ণ | ১ |
| | ১ | তের | ১ | ১ | দল | ১ |
| | ৪ অক্ষর | | ৪ মাত্রা | ৪ অক্ষর | | ৪ মাত্রা |

উপরের 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত উদাহরণে একই কবিতায় একই স্তবকের চরণ ব্যবহৃত হলেও বলবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণ দ্রুততার খাতিরে প্রথমটিতে যে রীতিতে অক্ষর ও মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 'খ' শীর্ষক উদাহরণে সে রীতি মানা হয় নি। একই স্তবকের ছন্দ নির্ণয়ে কোথাও কোথাও যে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে এটি তারই

উদাহরণ। 'গগনে' শব্দটি গ-গ-নে—এই তিন অক্ষরের হওয়ায় তিনমাত্রা হিসাব করাই যথার্থ হ'ত। কিন্তু বলবৃত্তে যেহেতু এক পর্বে চার মাত্রায় বেশী হয় না, সেজন্য উচ্চারণকে অতি মাত্রায় দ্রুত করে 'গ' অক্ষরে ১ মাত্রা এবং 'গনে' কে দুমাত্রার পরিবর্তে এক মাত্রার বলে ধরা হয়েছে।

এবার 'খ' চিহ্নিত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম পর্বের 'অরুণ' শব্দটি ছন্দের খাতিরে যেখানে 'অ'-রুণ—এই দুটি অক্ষর এবং দুমাত্রার বলে ধরা হয়েছে। যেখানে ছন্দের মূলধর্মকে পুনরায় বজায় রাখতে গিয়ে 'তরুণ' শব্দটি বিশ্লিষ্ট করে 'ত—রু—ণ' তিন অক্ষর বিশিষ্ট ধরে অর্থাৎ এক মাত্রার হিসাব বেশী করে ধরা হয়েছে। 'অরুণ' শব্দের 'রুণ' ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর, কিন্তু 'তরুণ' শব্দের 'ণ' স্বরান্ত অক্ষর এবং উচ্চারণের সময় সামান্য দীর্ঘায়িত। অতএব, প্রমাণ পাওয়া গেল একই নামের ছন্দের মাত্রাগণনায়ও সামান্য হেরফের হওয়া সম্ভব।

(৭) লয়—

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ আলোচনার পূর্বে লয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। স কবিতাই আমরা সমান ভঙ্গীতে পাঠ বা আবৃত্তি করি না। গঠনভঙ্গী ও অর্থ বিশিষ্টতা আমাদের পাঠধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কোন কবিতা আমরা দ্রু গতিতে, আবার কোন কবিতা ধীরভাবে পাঠ করি। কবিতা পাঠের বিশে গতিভঙ্গীকেই 'লয়' বলে। বাংলা কবিতায় শ্রেণীবিভাগ অনুসারে দ্রুত, মধ্যম এব বিলম্বিত—এই তিনি প্রকার লয়ে বাংলা কবিতা পঠিত হযে যাবে। পাঠের এ বিশেষ ভঙ্গীটিকেই 'ঢঙ্' বলা যেতে পারে। ছন্দের মাত্রার হিসাবও এই পাঠভঙ্গী উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। রীতিটি এখানে দেখান হ'ল—

| ছন্দ | লয় |
|---|---|
| বলবৃত্ত | দ্রুত |
| মাত্রাবৃত্ত | মধ্যম |
| অক্ষরবৃত্ত | বিলম্বিত |

**বলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দ :**—বাংলা ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থে এই ছন্দটির আর একা নাম পাওয়া যায়—'ছড়ার ছন্দ'। কারণ এই ছন্দটিকে বাংলা লোক-কবিতার মধ্যে সুদূর অতীত যুগ থেকেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। দ্রুত উচ্চারণের মধ্যে সে সাঙ্গীতিক মাধুর্যের সৃষ্টি হয়—তার প্রভাব লোকমনের উপর কম নয়। ব্রতকথা, লোকগীতি কবিগান প্রভৃতি এই ছন্দরীতিতে রচিত।

এই ছন্দে প্রতি পর্বে নির্দিষ্ট অক্ষরে স্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে বলে এই ছন্দের আ এক নাম শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ দেখান হ'ল :—

(ক) "উষার দুয়ারে / হানি আঘাত
আমরা আনিব / রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব / তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যা / চল।"—নজরুল ইসলাম

প্রতি পর্ব – চার মাত্রা।

(খ) পাল্‌কী চলে / ৪ মাত্রা
পাল্‌কী চলে / ঐ
গগন তলে / ঐ
আগুন জ্বলে / ঐ

**বৈশিষ্ট্য সমূহ** ঃ –(১) ছন্দটির নামকরণে একাধিক অভিধা ব্যবহৃত। (২) মূলধর্ম শ্বাসাঘাত প্রাধান্য। (৩) প্রতি পর্ব চার মাত্রায় হয়ে থাকে। (৪) প্রতি অক্ষরে সাধারণতঃ এক মাত্রা হয়। (৫) দ্রুত লয়ে পাঠ করাই রীতি। (৬) উচ্চারণ-সংশ্লেষ রীতি হিসাবে অনুসৃত।

**মাত্রাবৃত্ত ছন্দ** ঃ –যে ছন্দে মধ্যম লয় অনুসৃত হয় এবং প্রতি পর্বের মাত্রাসংখ্যা অনধিক সাত। সেই ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

**বৈশিষ্ট্য সমূহ** ঃ –(১) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ মধ্যম লয় সমন্বিত অর্থাৎ পাঠভঙ্গী খুব দ্রুত বা মন্থর নয়। (২) প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৫, ৬ বা ৭ হয়। মনে রাখতে হবে এই মাত্রা সংখ্যা মূল পর্বের। (৩) খণ্ড পর্বে দুই বা তিন মাত্রা থাকতে পারে। (৪) সংযুক্ত ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং পূর্ববর্তী অক্ষর দুমাত্রার হয়। (৫) ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অর্থাৎ সর্বদাই দু মাত্রায় হয়।

উদাহরণ –

(ক) "কোন রণে কত / খুন দিল নর / লেখা আছে ইতি / হাসে।
কত নারী দিল / সিঁথির সিঁদুর / লেখা নাই তার / পাশে।" – নজরুল
চরণ – ১ – ৬+৬+৬+২
চরণ – ২ – ৬+৬+৬+২

(খ) ১২ ১১১ ১১১ ১২ ১২ ১১১ ১১
"তপের প্রভাবে / বাঙালী সাধক / জড়ের পেয়েছে / সাড়া,
আমাদের এই / নবীন সাধনা / শব-সাধনার / বাড়া। – সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রথম চরণ—৬+৬+৬+২
দ্বিতীয় চরণ—৬+৬+৬+২

(গ) ১১১২ ২১ ১১ ১২ ১২ ২১১
"যাদুকরের / পান্না জলে / তোমার হাতের / আংটিতে,
হিয়ার হাসি / কান্না জাগে / সবুজ সুরের / গানটিতে।

কুণ্ঠাহারা / তোমার হাসি— ।
ভয় ভাবনা / যায় যে ভাসি।
যায় ভেসে যায় / পাংশু মরণ / পাতাল মুখো / গাংটিতে।

| | |
|---|---|
| প্রথম চরণ— | ৫+৫+৬+৪ |
| দ্বিতীয় চরণ— | ৫+৫+৬+৪ |
| তৃতীয় চরণ— | ৫+৫ |
| চতুর্থ চরণ— | ৫+৫ |
| পঞ্চম চরণ— | ৬+৬+৫+৪ |

(ঘ) "দেখিবে অলকায়/সৌধশ্রেণী তার/অভ্রভেদী শির/তোমারি প্রায়
ললিত বনিতার/চটুল গতিভার/বিজলী খেলা যেন/জলদ গায়।"
—কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

| | |
|---|---|
| প্রথম চরণ | ৭+৭+৭+৫ |
| দ্বিতীয় চরণ | ৭+৭+৭+৫ |

**অক্ষরবৃত্ত ছন্দ** ঃ—যে ছন্দে বিলম্বিত লয় এবং মূল পর্ব কম পক্ষে আট মাত্রার —তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। এই ছন্দের অন্য নাম তানপ্রধান ছন্দ।

**বৈশিষ্ট্যসমূহ**—(১) এই ছন্দের পঠনরীতি ধীর লয়ের। (২) মূল পর্ব আট বা দশ মাত্রার হওয়ায় স্বভাবতঃ দীর্ঘ। (৩) প্রাচীন পয়ার-জাতীয় কবিতা অক্ষরবৃত্তে রচিত। (৪) মূল পর্ব আট মাত্রার বা দশ মাত্রার হলেও গৌণ পর্ব ছয় মাত্রার হতে পারে। (৫) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সমন্বিত কবিতায় পংক্তি-শেষে সাধারণত মিল লক্ষ্য করা যায়; এই মিলের অপর নাম অন্ত্যানুপ্রাস। (৬) পুরানো ধরণের 'ত্রিপদী' জাতীয় কবিতা এবং সনেট এই ছন্দে রচিত। (৭) লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে মাত্রা সংখ্যা বিভিন্ন। (৮) দীর্ঘ পর্ব তানের সৃষ্টি করে বলে এর অপর নাম তানপ্রধান ছন্দ। (৯) শব্দান্তের ব্যঞ্জনান্ত এবং যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক।

উদাহরণ—

১১১১ ২ ১১ ২ ১১ ১১

(১) "জানিনাক' আজ তুমি / কোন্ লোকে রহি' ৮+৬
শুনিছ আমার গান / হে কবি বিরহী। ৮+৬
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার / অসীম সাহারা, ৮+৬
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি / চন্দ্র, সূর্য্য, তারা। ৮+৬
পারায়ে চলেছ একা / অসীম বিরহে ?"—নজরুল ৮+৫

(২) "প্রিয়া তারে রাখিল না / রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ, ৮+১০
রুধিল না সমুদ্র পর্বত। / ১০
আজি তার রথ / ৬
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে / ১০
নক্ষত্রের গানে / ৬
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।" /—রবীন্দ্রনাথ ১০

(৩) "সদাই ধেয়ানে / চাহে মেঘপানে ৬+৬+
না চলে নয়নতারা। ৮
বিরতি আহারে / রাঙ্গাবাস পরে ৬+৬+
যেমতি যোগিনী পারা॥"—চণ্ডীদাস ৮

এটি লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ।

(৭) এবার একটি দীর্ঘ ত্রিপদীর উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। এর মাত্রা সংখ্যা—৮+৮+১০

"সনকার আর্তনাদে / চম্পক নগর কাঁদে / ৮+৮
ডুবে যায় সপ্ত মধুকর। / ১০
কৌপীন করিয়া সার / তোমার পুরুষকার / ৮+৮
পথে পথে ফিরে দিগম্বর।"—কালিদাস রায়। ১০

## ॥ বাংলা অলংকারের আলোচনা ॥

কবিগণের কাব্য সৃষ্টি এক রহস্যময় প্রক্রিয়া। সাধারণের নিকট তা সহজবোধ্য নয়। কবি-প্রেরণা, আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি এবং বাহ্যিক প্রকাশ-কৌশল ইত্যাদি সকল বিষয়ই সাধারণের সাধ্যাতীত। বাইরের জগত কিভাবে কবির অন্তরে প্রবেশ-লাভ করে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় অন্তরের জগত হয়ে ওঠে এবং কেমন করেই বা কাব্যদেহে তা প্রকাশলাভ করে তা আমরা সহজে বুঝতে পারি না বলেই কাব্য-নির্মিতিকে আমরা অলৌকিক বলে থাকি।

পরিচিত বিষয় বা ভাবকে কবি যখন অভিনব রূপে প্রকাশ করেন তখন তা পাঠ করে আমাদের মনে যে বিস্ময়বোধ জাগ্রত হয়—তাকেই আমরা কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি-রূপ আনন্দ বলে থাকি ; এই আনন্দ-চর্বনাকেই এক কথায় 'রস' বলতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে—এই রস নিষ্পত্তি হয় কিভাবে ? কাজের ভাষার মধ্যে যে সহজতা ও উদ্দেশ্য-তৎপরতা আছে, ভাবের ভাষার মধ্যে তা নেই। ভাবের ভাষার উৎপত্তি হৃদয়ের মধ্যে বলেই তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলায় একটা দায় কবি অনুভব করেন।

একেই ভাষার অঙ্গসজ্জা বলতে পারি এবং এই বিশেষভাবে সজ্জিত ভাষার মধ্যে মানবিক হৃদয়ভাবে উত্তমরূপে আত্মপ্রকাশ করলেই সেটি কাব্য হয়ে ওঠে। কোন সুন্দরী যেমন কখনও বিশেষ সজ্জা ব্যতিরেকেই তার স্বাভাবিকতার মধ্যেই সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করতে সক্ষম, অনুরূপভাবে, কবি বিশেষ ক্ষমতাবলে ভাষার অপরিসীম সারল্যকে অবলম্বন করে যখন কোন বিষয়কে উষ্ণ হৃদয়ভাব-নিষিক্ত করে প্রকাশ করেন—তখনও একটা সরল সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টি ঠিক কিভাবে হবে সে বিষয়ে প্রাক্-নির্দেশদান সম্ভব না হলেও সুপ্রাচীন কাল থেকে কবিগণ কতকগুলি ভঙ্গী অনুসরণ করে আসছেন। আলংকারিক-গণ তাকেই বিশ্লেষণ করে যেমন ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তেমনি কাব্য-সৌন্দর্য-রহস্যের উন্মোচনও করতে চেয়েছেন। আমরা জানি, বিশিষ্ট ছন্দের দোলায় দুলিয়ে এবং শব্দ-সন্নিবেশ কৌশলে মাধুর্যময় ধ্বনি সৃষ্টি করে এবং অর্থগত বিস্ময় প্রকাশ করে কবিগণ কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। এই শেষোক্ত কৌশলের আলোচনাই অলংকারের বিষয়বস্তু।

কাব্যমধ্যে কবিগণ শব্দকে যে সব বিভিন্ন রীতিতে ব্যবহার করেন—তাইই অলংকার। 'অলম্' কথাটির অর্থ ভূষণ এবং অলংকার অর্থে সংক্ষেপে কাব্য-সজ্জা রীতি বুঝতে হবে। তাই অলংকারের আলোচনাকে আমরা এক কথায় কাব্য-সৌন্দর্য বিজ্ঞান বলতে পারি। ইংরেজীতে একেই 'Aesthetic 'of Poetry' বলা হয়।

এখন অলংকারের প্রকৃত তাৎপর্য বিষয়ে দুএকটি কথা বলা দরকার। অলংকারকে কাব্যসৃষ্টি কৌশলের অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করলে কাব্যভাব ও ভাবনার সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগটিও উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ অলংকার কেবলমাত্র কাব্যদেহের অলংকরণের উপাদানমাত্র নয়—এর সঙ্গে যোগ রয়েছে শব্দের অর্থগত তাৎপর্যের—যার সাহায্যে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্ট হয় এবং এক লোকাতীত ব্যঞ্জনালাভ করে। সুন্দর নারীদেহের অঙ্গসজ্জা যেমন তার দেহ ও মনোধর্মের অনুসারী—উন্নতমানের অলংকার তেমনি কাব্যের স্বভাব-সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করে এবং পাঠক সমাজকে তার হৃদয়ের অন্তঃপুরে আহ্বান করে রসানন্দের বিমলতার অংশভাগী করে। অলংকার তাই কেবলমাত্র কাব্যের বহিরঙ্গের বিচার নয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলংকারে কোন প্রভেদ নিরূপণ সহজ নয়—বাঞ্ছনীয়ও নয়—কবির রসপ্রকাশের ভাষা অর্থাৎ 'ভাবের রূপের মাঝারে অঙ্গ' লাভই প্রকৃত অলংকার। ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণ অর্থাৎ আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি তাঁদের অলংকারশাস্ত্রে ·ই সত্যটিকেই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

**শব্দালংকার ঃ—**

শব্দের দুটি অংশ—ধ্বনি (sound) এবং অর্থ (sense)। ধ্বনিকে অবলম্বন করে যে অলংকার গড়ে ওঠে তাকে বলে শব্দালংকার এবং অর্থ ই যেখানে প্রাধান্যলাভ করে,

সেখানে হয় অর্থালংকার। শব্দের উচ্চারণজাত ধ্বনিমাধুর্যের মধ্যে যে সঙ্গীতধর্মিতা আছে তাই বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করে। যেমন অনুপ্রাস অলংকারে বিভিন্ন শব্দের বর্ণসাম্যের ফলে ধ্বনিসাম্য এবং ধ্বনিসাম্য দ্বারা অর্থ আভাসিত হয়। অনুপ্রাস যেমন ধ্বনিসৌন্দর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, উপমা সেই প্রকার অর্থসাম্যকেই প্রধান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ধ্বন্যুক্তিই প্রধান। সংক্ষেপে প্রত্যেকটির আলোচনা করা হচ্ছে।

**অনুপ্রাস (Alliteration)** - একই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ঘনিষ্টভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে সমজাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি করলে 'অনুপ্রাস' অলংকার হয়। যথা—

"গাগরি বারি ঢায়ি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।"

এখানে 'র' ধ্বনির পুনরুক্তির মধ্যে ধ্বনিসাম্যের উদ্ভব হওয়ায় অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে। অনুপ্রাসকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) সরল অনুপ্রাস (২) গুচ্ছানুপ্রাস (৩) ছেকানুপ্রাস (৪) শ্রুত্যনুপ্রাস এবং (৫) মালানুপ্রাস। (৬) লাটানুপ্রাস।

**(১) সরল অনুপ্রাস**—এই অনুপ্রাসে একটি মাত্র ধ্বনিই একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে সাম্যলাভ করে।

উদা— "দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী,
গৌরবের গৌরবিণী, মানের মাননী,
নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী'।—বঙ্কিমচন্দ্র

**(২) গুচ্ছানুপ্রাস** – ব্যঞ্জন বর্ণের গুচ্ছ বা সমষ্টি অনেকবার উচ্চারিত হয়ে ধ্বনি সাম্যের সৃষ্টিকরণে গুচ্ছানুপ্রাস হয়।

উদা— "না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কি গেল শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত।" – রবীন্দ্রনাথ

**(৩) ছেকানুপ্রাস**—ছেকানুপ্রাসে সম ব্যঞ্জনধ্বনি বাক্যমধ্যে দুবার উচ্চারিত হয়।

উদা— "যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে?" – কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

**(৪) শ্রুত্যনুপ্রাস**—একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনের ধ্বনিমধুর সমাবেশে যে ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে।

উদা— "মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইলা সম্মুখে।" – রবীন্দ্রনাথ

**(৫) মালানুপ্রাস**—এই অনুপ্রাসে একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি শ্রুতি মাধুর্যের সূচনা করে।

উদা— "শিশির কণায় মাণিক ঘনায় দূর্বাদলে দীপ জ্বলে।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

**(৬) লাটানুপ্রাস**—অর্থের কোনরূপ পার্থক্য নির্দেশ না করে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হলে তাকে বলা হয় 'লাটানুপ্রাস' অলংকার। যেমন :—

(১) রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে—
পূর্ব কোণ।—সুকান্ত ভট্টাচার্য

(২) কালো তা সে যতই কালো হোক।—রবীন্দ্রনাথ

॥ যমক ॥

সমধ্বনিযুক্ত একাধিক শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলে যমক অলংকার হয়।

(ক) "আনা দরে আনা যায় কত আনারস।"—ঈশ্বর চন্দ্র
আনা=এক আনা। আনা=নিয়ে আসা।

(খ) "অচল অচল অতি পাষাণ পাষাণ মতি
কি হবে দুর্গার গতি যেতে নারি
জেতে নারী আমি হে।"—ঈশ্বর গুপ্ত

অচল—হিমালয়। অচল—গতিহীন। পাষাণ—প্রস্তর। পাষাণ—কঠিন হৃদয়। যেতে—যাইতে। জেতে—শ্রেণীতে

॥ শ্লেষ ॥ সমধ্বনিবিশিষ্ট একই শব্দ একবার মাত্র প্রযুক্ত হয়ে একাধিক অর্থের দ্যোতনা করে তাকে শ্লেষ অলংকার বলে।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।—ঈশ্বর গুপ্ত

ঈশ্বর—ভগবান। গুপ্ত—গোপন। ঈশ্বর গুপ্ত—কবি। প্রভা—দীপ্তি। প্রভা—প্রতিভা। প্রভাকর—পত্রিকা।

॥ বক্রোক্তি ॥ শ্রোতা বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থকে গ্রহণ না করে যদি অন্য অর্থ গ্রহণ করে তবে বক্রোক্তি অলংকার হয়। বক্রোক্তি দুশ্রেণীর—(ক) শ্লেষ-বক্রোক্তি, (খ) কাকু বক্রোক্তি।

(ক) "রাজা - তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। একি
চীনা অক্ষরে লেখা নাকি ?
নটরাজ—বলতে পারেন, অ-চিনা অক্ষরে।"—রবীন্দ্রনাথ

চীনা—চীনদেশীয় ভাষায়। চিনা—পরিচিত।

(খ) "গান্ধারী—আমি কি মা নহি ? গর্ভভার জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নি কি তারে ?"

॥ **ধ্বন্যুক্তি** ॥ সমধ্বনির পুনরাবৃত্তির সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনিসৌন্দর্যের সঙ্গে যদি অর্থব্যঞ্জনা উপলব্ধ হয় তবে ধ্বন্যুক্তি অলংকার হয়।

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা!

## ॥ অর্থালংকার ॥

অর্থালংকার শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনার প্রাধান্যের উপরই নির্ভরশীল। কোন শব্দকে পরিবর্তিত করে তার প্রতিশব্দ ব্যবহার করলেও অর্থালংকার বজায় থাকে। কয়েকটি প্রধান স্থানীয় অলংকার এখানে আলোচিত হচ্ছে।

॥ **উপমা** ॥ উপমা একটি সাদৃশ্যমূলক অলংকার। ভিন্ন জাতীয় দুটি বিষয়ে বৈসাদৃশ্য থাকলেও প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ করা হলেই উপমা হয়। উপমা অলংকারে চারটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—(ক) উপমান (খ) উপমেয় (গ) সাধারণ ধর্ম এবং (গ) সাদৃশ্যবাচক শব্দ। যে বস্তুর সঙ্গে উপমা দেওয়া হয় তাকে উপমান এবং যে প্রধান বস্তুটি উপমার কেন্দ্রবস্তু তাকে বলে উপমেয়। উভয়ের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ ধর্ম বলে গণ্য করা হয়। ভাষার অন্তর্গত পরিচিত সাদৃশ্যবাচক শব্দও ব্যবহার করা হয়।

উদা—'আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ম দীপ্ত প্রভাতরশ্মি সম।'—রবীন্দ্রনাথ

উপমান—প্রভাত রশ্মি। উপমেয়—ছুরি। সাধারণ ধর্ম—তীক্ষ্ম দীপ্ত। সাদৃশ্য-বাচক শব্দ—'সম'।

উপমা অলংকার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত:—

(১) পূর্ণোপমা, (২) লুপ্তোপমা, (৩) মালোপমা এবং (৪) মহোপমা। (৫) স্মরণোপমা। উপরের উদাহরণটি পূর্ণোপমার। লুপ্তোপমার তুলনায় বিষয়টি অনেকখানি প্রচ্ছন্ন:

উদা—'চুল যার শাওনের মেঘ'—জীবনানন্দ

এখানে সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। মালোপমায় দুই বা ততোধিক উপমানের ব্যবহার হয়। মহোপমার আর এক নাম Homeric Simile বা Epic Simile। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, উপমেয়ের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে উপমানের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়।

॥ **রূপক** ॥ উপমেয় এবং উপমানে অভেদ কল্পিত হলে রূপক অলংকার হয়। রূপক অলংকাবকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সাঙ্গরূপক (২) নিরঙ্গ রূপক (৩) মালা রূপক (৪) পরম্পরিত রূপক।

(১) সাঙ্গ রূপক –

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু, অশ্রু বারিধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।" – মধুসূদন

(২) নিরঙ্গ রূপক –

'যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।' – মোহিতলাল

॥ **উৎপ্রেক্ষা** ॥ প্রবল সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট সংশয় দেখা দিলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। উৎপ্রেক্ষা তিন শ্রেণীর – বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা এবং মালোৎপ্রেক্ষা।

(ক) "রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ।" – মধুসূদন

(খ) "শতেক যুগের কবিদল মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।"—রবীন্দ্রনাথ

॥ **অপহ্নুতি** ॥ উপমেয়কে অপহ্নব বা নিষেধ করে উপমানের প্রতিষ্ঠা হলে অপহ্নুতি অলংকার হয়। উদাহরণ—

"তারাই আজ নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে আত্মহারা,
দেশের যত নদীর ধারা, জল না, ওরা অশ্রুধারা।" – নজরুল

॥ **নিশ্চয়** ॥ নিশ্চয় অলংকার অপহ্নুতির বিপরীতধর্মী। অতএব এখানে উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

"অসীম নীরদ নয়
তাই গিরি হিমালয়।"—বিহারীলাল

॥ **সন্দেহ** ॥ সন্দেহ অলংকারে উপমান ও উপমেয় উভয়েই সংশয় প্রকাশ করা হয়।

(ক) "সোনার হাতে সোনার চুড়া কে কার অলংকার?' – মোহিতলাল

**অতিশয়োক্তি :** উপমান ও উপমেয়ের পারস্পরিক পার্থক্য সত্ত্বেও অভেদ কল্পনা করা হলে এবং উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়।

"দাসীর এ তৃষ্ণা তোষ সুধা বরিষণে" – মধুসূদন

এখানে 'শোনায় ইচ্ছা' এবং 'সুমিষ্ট উক্তি' এই দুই উপমেয়কে গ্রাস করে 'তৃষ্ণা ও 'সুধা বরিষণ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

**সমাসোক্তি :** উপমেয়ে উপমানের ধর্ম আরোপ করে যে অলংকার হয় তার নাম সমাসোক্তি। 'সমাস' কথাটির অর্থ সংক্ষেপ। সংক্ষেপে উপমান ও উপমেয়ের বিষয় প্রকাশিত হয় বলে এর নাম সমাসোক্তি। এই অলংকারের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অচেতন বস্তুতে চেতনার ধর্ম আরোপ করা হয়। ইংরাজীতে এর নাম Personification।

"দুর্গম তুষার গিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।—রবীন্দ্রনাথ

**বিষম :** বিসদৃশ দুটি বিষয়ের বর্ণনার সাহায্যে যে কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্ট হয় তার নাম বিষম অলংকার।

(ক) 'পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল' · জ্ঞানদাস

(খ) 'উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ ঘটায়' · গিরিশচন্দ্র

**বিভাবনা :** কোন কাজ কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হলে বিভাবনা অলংকার হয়।

'বিনা মেঘে বজ্রপাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বাতে নিভে গেল মঙ্গল প্রদীপ।'—অমৃতলাল বসু

**নির্দশনা :** সম্ভব বা অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে উপমান—উপমেয় বোঝান হয়। যেমন—

অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমলকানন।

এখানে পদ্মবন ভ্রমে শ্যাওলার মধ্যে খেলা করার সঙ্গে অযোগ্যকে বরণ করার ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। বস্তুদুটির সম্বন্ধ যদিও অসম্ভব তবু সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।